দর্শন গ্রন্থমালা # ১

চাপ না নিয়ে

শমীক সরকার

সমাজকর্মীর রাজনৈতিক দর্শনের প্রয়োজনে
দেল্যুজ-ফুকো-সিমন্দঁ ধরে একটি অসমাপ্ত প্রয়াস

দর্শন গ্রন্থমালা # ১

চাপ না নিয়ে

সমাজকর্মীর রাজনৈতিক দর্শনের প্রয়োজনে
দেল্যুজ-ফুকো-সিমন্দঁ ধরে একটি অসমাপ্ত প্রয়াস

শমীক সরকার

ভাষ্য প্রকাশন

দর্শন গ্রন্থমালা # ১

Chap na Niye
A political philosophy for activists
An unfinished work with
Deleuze-Foucault-Simondon
Authored by **Shamik Sarkar**

চাপ না নিয়ে
সমাজকর্মীর রাজনৈতিক দর্শনের প্রয়োজনে
দেল্যুজ-ফুকো-সিমন্দঁ ধরে একটি অসমাপ্ত প্রয়াস

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৯

অ ক্ষ র বি ন্যা স
শমীক সরকার

প্র চ্ছ দ
রাজর্ষি দত্ত

প্র কা শ ক
রাজর্ষি দত্ত
ভাষ্য প্রকাশন
৮, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ রোড,
নবপল্লী, বারাসাত
কলকাতা ৭০০০১২৬

মু দ্র ক
ডি এন্ড পি গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
গঙ্গানগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা
কলকাতা ৭০০১৩২

দা ম
২০০ টাকা

BHASHYOBOI@GMAIL.COM
FACEBOOK.COM/BHASHYOBOI
INSTAGRAM.COM/BHASHYOBOI
+91 9830 023823

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা

সমাজমঙ্গল ভাবনা নতুন কিছু নয়। ইতিহাস সাক্ষী তার। তবে অনেক সময়ই সাধারণের ভাবনায় দশের বা যূথের হিতের জন্য কাজ, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো সুলভ। বহুর হিতার্থে মানুষ সমাজকাজে যুক্ত থাকে তবুও, সমাজভাবনার চর্চায় নিজেকে ব্যস্ত রাখে বেশ অনেকটা সময় জুড়েই। সভ্যতার এগিয়ে যাওয়ার মাপকাঠিতে সমাজের জন্য কাজ একটি নির্দেশক বিশেষও। এটা তো জানা কথা যে নিও–লিব্যারেল সময়ে সমাজকাজ দেশ–শাসনের, সমাজমঙ্গলের সরকারি ভাবনার সরাসরি চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে এনজিও ইত্যাদির মাধ্যমে বাজারি দর হাঁকাহাঁকিতেও থাকে। অর্থাৎ সমাজের জন্য কাজের বহুস্তরীয় দ্যোতনা রয়েছে।

এই সময়ে বিভিন্ন পরিচিতির সঙ্কট ধারন করতে চাওয়ার টানাপোড়েন প্রায় প্রতিটি সচেতন মানুষ টের পাচ্ছেন। লিঙ্গ, বর্ণ, জাতি, ধর্ম পরিচিতি গুলিকে একটি সাধারণ মাঙ্গলিক ধারনার মধ্যে টানা যাচ্ছে না আর। প্রায়ই রসদ নিয়ে পরস্পর যুযুধান পক্ষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ সন্ধিক্ষণে মাথার ভেতরের সমাজকাজের পুরনো ধারনাও বাতিল হয়ে যাচ্ছে। ধসে পড়ছে ঊনবিংশ শতকের নৈতিক পূর্বধারনার থিসিস। সামাজিক সত্যের সময়–নিরপেক্ষ যে ধারনার থেকে ভিত তৈরি হয় সমাজমঙ্গলের, তাই ভাঙছে। বহুহিতের আখাঙ্খা এখন খণ্ডিত এবং দীর্ণ। জাগতিক ভাবনায় ফলতঃ এই জটিলতা প্রায় অসমাধানযোগ্য। আমাদের হাত বাড়াতেই হচ্ছে দার্শনিক অজ্ঞেয়তার কাছে। সাধারণীকরণ বিমূর্ত হলেও, অনন্যতা দিয়ে দর্শনের ভিত্তি তৈরি হলেও সামাজিক সত্যের চলমান, পরিবর্তনশীল রূপ এই অনন্য ফারাকের (differences) ইট পাথর দিয়েই মাপা সম্ভব। নইলে অথৈ সমস্যার জালে হাল ছাড়তে হবে।

শমীকদা, শমীক সরকার আমাদের প্রিয় মানুষ। তার এযনা ফলদায়ী

কিনা সময়ে বিবেচ্য। আমরা মনে করছি, দর্শনের হস্তক্ষেপে তিনি সামাজিক জটিলতার জন্য সমাজকাজের যে সমাধানযোগ্যতা বিচার করতে চেয়েছেন তা এই অবোধ সময়ে বিরল। মিথ্যে বাগাড়ম্বরের হাটে আরেকটু কঠিন, আরেকটু সৎ কচকচি যোগ হলে ক্ষতি কি? "চাপ না নিয়ে" সময়কে কুর্নিশ জানিয়ে সময়ের অতলে হারাবে। শমীকদা তাই চান। তিনি প্রকৃতই বহু রাজনৈতিক সামাজিক অন্বেষণের শরিক। বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক–সামাজিক চর্যার পরীক্ষা নিরীক্ষায় রত থেকেছেন, থাকেন। এই বই সেই ব্যর্থতা ও সফলতার তাত্ত্বিক জার্নাল বিশেষ। আমরা আশা রাখছি তার জার্নির ফল ভাগ করব সবাই।

ভূমিকা

আধিভৌতিক ও ভৌতিক

১)

সমাজকর্মী কে? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না, যে নিজেকে মনে করে সমাজকর্মী, সে-ই সমাজকর্মী — এইরকম কিছু একটা বলে দেওয়াই যায়। কিন্তু এইভাবে উত্তর দেওয়াতে একটা সমস্যা আছে। এইভাবে উত্তর দেওয়ার ফলে সমাজকর্মী নামক একটি সাধারণ পরিচয়বোধক শব্দ তৈরি হলো কীভাবে, তা নিয়ে একটা সঙ্কট দেখা দেবে। ফলতঃ, আমাদের একটা স্বীকার্য এখানে রয়েছে, সমাজকর্মী একটা পরিচয়। কারা তারা? যারা সমাজের জন্য কিছু করে, তারাই সমাজকর্মী।

এবার এইটাকে একটু খেলতে দেওয়া যেতে পারে। যে নিজে সমাজের জন্য কিছু করছে বলে মনে করে, সেই সমাজকর্মী। তা সে নিজেকে 'সমাজকর্মী' বলুক আর না-ই বলুক।

বহু লোককে বলতে শুনি, সমাজের জন্য করি, মানুষের জন্য করি। কেউ বলে, কেউ বলে না। রাজনীতি যারা করে তারা। এনজিও-তে চাকরি যারা করে তারা। যারা বিভিন্ন এনজিও-তে স্বেচ্ছাশ্রম দেয়, তারা। যারা ক্লাব করে, তারা। যারা ব্রতচারী, সব-পেয়েছির-আসর করে তারা। যারা বন্যাত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারা। যারা সঙ্ঘ, মিশন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত, তারা। যারা বিনা বেতনে বাচ্চাদের পড়ায়, তারা। যারা লিটল ম্যাগাজিন করে, তারা। যারা সাংবাদিকতা করে, তারা। যারা ডকুমেন্টারি বানায়, তারা। যারা সিনেমা আন্দোলন করে, তারা। যারা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব

পাড়ার লোকের আপদে বিপদে পাশে দাঁড়ায়, তারা। যারা বিজ্ঞান আন্দোলন করে, তারা। যারা পরিবেশ আন্দোলন করে, তারা। যারা নানা ইস্যুতে আন্দোলন করে, তারা। যারা অন্যরকম কিছু পড়াশুনা করে, তারা। যারা প্রাইভেট টিউশন করে তারা। ইত্যাদি।

সংগঠিত, অসংগঠিত, প্রায়–ব্যক্তিগত এরকম নানা সমাজকর্মী আছে, যাদের বেশিরভাগই হয়ত সমাজের জন্য করা বা মানুষের জন্য কিছু করা–কে বা দেশের জন্য কিছু করাকে এতটাই স্বাভাবিক বলে মনে করে, যে এটা আলাদা করে একটা কাজ বা অ্যাকশন বলে মনেই করে না।

তাহলে আমরা এটা আলাদা করতে চাইছি কেন?

আমরাও মনে করি, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সমাজের জন্য মানুষের জন্য করে। কখনও করে, কখনও করে না। আমরা ওই করাটুকুকে নিয়ে কথা বলতে চাইছি।

সমাজের জন্য করা মানে সমাজের জন্য করা, তার জন্য কোনো তত্ত্ব বা ভাবনার দরকার পড়ে না — এইরকম একটা মত চালু আছে খুব সমাজকর্মীদের মহলে। খতিয়ে দেখা যাক ব্যাপারটা। প্রথমতঃ সংজ্ঞাগত দিক দিয়ে এগোনো যাক। সমাজকর্ম কী? সেটাই সমাজকর্ম, যা সমাজের জন্য করা মানুষের জন্য করা। অর্থাৎ, যা নিজের জন্য করা নয়। পরিভাষায় বললে, নিঃস্বার্থভাবে করা। স্বার্থ বলতে এখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা বলা হচ্ছে অবশ্যই, কোনোরূপ কোনো সমষ্টিগত স্বার্থের কথা বলা হচ্ছে না। কিন্তু সমাজের জন্য করা কি সবসময় সমাজের জন্য করা থাকে? তা কি যা তা নয়, তা, অর্থাৎ, নিজের জন্য করা হয়ে যায় না?

নিজের জন্য সমাজকর্মের, অর্থাৎ সোনার পাথরবাটির নানা রূপ আছে। সবচেয়ে বড়ো রূপটা হলো নিজের কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য, যেমন প্রাইজ, আয়বৃদ্ধি, সম্মানবৃদ্ধি, বিদেশভ্রমণ ইত্যাদির জন্য সমাজকর্মকে ব্যবহার করা। অর্থাৎ সমাজকর্ম সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র, ব্যক্তিগত অভীষ্ট সাধনের। অনেকের মধ্যেই চেতনে বা অবচেতনে এই সিদ্ধির উদ্দেশ্য থাকে। এই রূপটা ভয়ানক কিছু নয়। কেন? কারণ, সমাজকর্ম যদি এমন সামাজিক রতিতে পরিণত হয়, যা বিনিময়যোগ্য এবং লাভজনক, তা একইসঙ্গে সমাজকর্মের রতিরূপ খোলসটি থেকে সমাজকর্মকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে। সেই কাজটি বা অ্যাকশনটি আর সমাজকর্ম থাকবে না। বরং তা হয়ে উঠবে একটি পরিষেবা রূপ পণ্য। সমাজকর্ম ওটাকে নিজের মধ্যে থেকে বাদ দেবে।

নিজের জন্য সমাজকর্মের, অর্থাৎ সোনার পাথরবাটির আরেকটি রূপও আছে। সেটি হল, নিজের সন্তুষ্টির জন্য সমাজকর্ম। সেটি বড়ো ভয়ানক। কারণ, তা বোঝাই যায় না যে সমাজকর্ম নয়। মনে হয়, করলাম তো সমাজেরই জন্য। এই 'করলাম তো সমাজেরই জন্য' চেতনাটি এতটাই

ভারী হয়ে যায় যে সমাজের জন্য করা হলো কি না আদৌ, তা বোঝার বা এই সংশয় তৈরি হবার মনটাই তৈরি হয় না। এই রূপটি যে অবদি চলে যায়, তা হল, লাগাতার সমাজের জন্য করে যাওয়া। তখন সমাজের জন্য করে যাওয়াই বেঁচেবর্তে থাকার একটা অন্যতম উপকরণ হয়ে ওঠে।

আরেকটি রূপ হলো, না সমাজের জন্য করা না নিজের জন্য করা। কিন্তু সমাজের জন্যও যদি না করা হয়, নিজের জন্যও যদি না করা হয়, তাহলে করাটাই বা কি? এবার খেয়াল করে দেখা যাক, আমরা কী সমাজের জন্য করি না, বা নিজের জন্য করি না। খেয়াল করলে দেখা যাবে, আমরা পারিবারিক যে দৈনন্দিন কাজ করি, সংসারের কাজ ইত্যাদি, ছেলেমেয়েকে যে স্কুলে দিয়ে আসি নিয়ে আসি হোমওয়ার্ক করাই — এগুলোকে আমরা কর্তব্য বলি। বাবা বা মায়ের ওষুধটা কিনে দেওয়া। মূলতঃ পারিবারিক এবং সাংসারিক দায়দায়িত্বকে আমরা কাজ বলে মনে করি না। অনেকসময় এইসব কাজে ফেঁসে গিয়ে আমরা হাঁসফাঁস করতে করতে বলি, না নিজের জন্য কিছু করা হল, না দেশের জন্য কিছু করা হল। স্পষ্টতঃই দেশের জন্য কিছু করাটা সমাজকর্মের মেটাফর। অর্থাৎ, এখানে একটা ফেঁসে যাওয়ার ব্যাপার আছে। হয়ত বিয়ে করে ফেলা, বাবা মা–র দায়িত্ব, বাচ্চা নিয়ে ফেলা — ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ যে কাজটা ঠিক কাজের কাজ নয়, আগে থেকে ভেবে নেওয়া সচেতন সিদ্ধান্তও নয়, একধরনের বাধ্যতায় পড়ে যাওয়া, অন্য কোনো কারণে, যে কারণের ওপর নিজের হাত পুরোটা নেই। সাংসারিক দায়িত্বের কাজ একটা মেটাফর। ঠিক এইরকমভাবে করা সমাজকর্ম — সেটাও এক ধরনের সমাজকর্ম। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আপনি রাস্তায় যাচ্ছেন, কেউ একটা আপনাকে ঠাঁটিয়ে চড় মারল। আপনি হকচকিয়ে গেলেন। সে আবার আপনাকে চড় মারল। আপনি প্রতিক্রিয়াতেই পাল্টা একটা চড় কষালেন। লেগে গেল মারপিট। লোক জমে গেল। পুলিশ এল। দু'জনকেই ধরল। আপনি বললেন, ও আগে মেরেছে, আপনি প্রতিরোধ করেছেন মাত্র। কেউ শুনল না। আপনি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। রাগে অপমানে তখন আপনি খোঁজ নিলেন কেন সে এমন করে আপনাকে আগে মারল। দেখলেন, লোকটা এরকম করেই থাকে, কেউ কিছু বলে না। আপনি ওর আপনারই মতো আরো কিছু ভিকটিমের সাথে মুখোমুখি হলেন। লোকটাকে শায়েস্তা করতে জোট বাঁধলেন। এটা একটা উদাহরন। এইভাবেই ফেঁসে গিয়ে সমাজকর্ম, বারবার কেটে পড়া, ফের ফেঁসে যাওয়া — এই সমাজকর্মীই আমাদের সমাজকর্মী পরিচয় ভাবনার সবচেয়ে কাছের — যে প্রায় না চাওয়া সত্ত্বেও তার পরিচয় হয়ে যায় সমাজকর্মী।

ঠিক একইভাবে সমাজকর্মীকে বাধ্য হতে হয় ভাবতে। পড়তে। তত্ত্ব

পড়তে। কারণ একথা সত্যি — সমাজের জন্য কিছু করতে গেলে তত্ত্ব বা ভাবনার দরকার পড়ে না। কোনো কিছুরই দরকার পড়ে না। সবথেকে বড় কথা, সমাজের জন্য কিছু করারই দরকার পড়ে না। দরকার তো নেইই, বরং বেশি করলে খবর নেওয়া দরকার। কবীর সুমনের গান, 'কেউ যদি বেশি খায় খাওয়ার হিসেব নাও কেন না অনেক লোক ভালো করে খায় না', এটাকে দিব্যি প্যারোডি করে নেওয়া যায় — 'কেউ যদি বেশি করে করার হিসেব নাও কেন না অনেক লোক কোনো কিছু করে না'। তত্ত্ব পড়া বা ভাবার ক্ষেত্রেও একই জিনিস ঘটে।

২)
সমাজকর্মের স্তর ভৌতিক স্তর। তার সুবিধার জন্য লেখাপড়া করাও ভৌতিক স্তরের বিষয়। সমাজকর্মের যে আঁকবাঁকগুলি থাকে, তাতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে, ঠিক ভুল বুঝতে না পারলে তত্ত্ব পড়তে হয়। সেগুলোও ভৌতিক স্তরের বিষয়। যা খোদ সমাজকর্ম সম্পর্কীয় নয়, বরং সমাজকর্মের বিষয় বিষয়ক। গাছ পাখি দেশ রাষ্ট্র ক্ষমতা বিদেশনীতি কম্পিউটার শ্রমিক পরিবেশ সিপিএম বিজেপি — আরো হরেক রকম। সেগুলিও পড়তে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু খোদ সমাজকর্ম সম্পর্কীয় বিভ্রান্তিতে? সেক্ষেত্রে কিন্তু আর তা সমাজকর্মের ভৌতিক স্তরের কিছু থাকে না। নিজের স্তরের কোনো কিছু থেকে তার উত্তর পাওয়া যায় না। তখনই দরকার পড়ে রাজনৈতিক দর্শনের। দর্শন, কারণ তা আধিভৌতিক স্তরের। রাজনৈতিক — কারণ তা সময় ও পরিসর সাপেক্ষ। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক শব্দটির আভিধানিক অর্থ যা শাসন বিষয়ক, এক্ষেত্রে মোটেই তা নয়। রাজনৈতিক-এ যে স্বাধীন চলক কেবল ওই দুটি, সময় এবং পরিসর, তা প্রমাণ করে দেওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য, আধিভৌতিক কোনো ভৌতিক স্তর নয়, ওই জন্যই তার নাম আধিভৌতিক স্তর। যদি এটা কোনো ভৌতিক স্তর হত, তাহলে ফিলজফিতে উচ্চশিক্ষিত লোকেরা কনসালটেন্সি চালিয়ে সমাজকর্মীর সমাজকর্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিভ্রান্তি দূর করে দিত। রাজনৈতিক দর্শন তাই কোনো টোটকাও নয় গ্যারান্টিও নেই। তার নিজের কোনো ক্ষমতাও নেই সঙ্কটমোচনের। কারণ সঙ্কটমোচন ভৌতিক স্তরের বিষয়। সমাজকর্ম সম্পর্কীয় বিভ্রান্তিতে সমাজকর্মীকে নিজেদের দিকে তাকাতে সাহায্য করে মাত্র এই রাজনৈতিক দর্শন।

৩)
এই লেখাটিতে প্রতিটি পরিচ্ছদে তিন ধরনের জিনিস আছে। প্রথম, অনুবাদ। সেগুলো বেশিরভাগই আমার ব্লগে https://ontorlin.wordpress.com/

প্রকাশিত হয়েছে নিয়মিত। ২০১৬ সাল থেকে। দ্বিতীয়, অনুবাদের মধ্যে মধ্যে ধরতাই। সেগুলো এই বই আকারে প্রকাশের সময় করা। তৃতীয়, টিপ্পনি, তর্ক, প্রবন্ধ — পরিচ্ছদের বিষয়গুলিকে প্রাঞ্জল করার জন্য। সেগুলো নানা সময় ফেসবুকে করা বা অন্য কোনো ওয়েবসাইটে বা পত্রিকায়। অনুবাদ, ধরতাই এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যাপারস্যাপারগুলির উদাহরণ — এই তিনে মিলেই এই রাজনৈতিক দর্শন। পরিচ্ছদগুলি করা হয়েছে বিষয় অনুসারে। বিষয় আরো বাড়তে পারে। এবং পরিচ্ছদে যা যা আছে, তা আমূল বা সামান্য বদলে যেতে পারে। উদাহরণ বাড়তে কমতে পারে। তাই এই বইটি বা লেখাটি বা রিডিং ম্যাটেরিয়াল বা সহায়িকাটি অসমাপ্ত এবং পরিবর্তনশীল। অনুবাদগুলি সব আমার করা, ধরতাইগুলি আমার লেখা। টিপ্পনি বেশিরভাগই আমার। তর্কতে অন্যের লেখা আছে। ফেসবুক তর্ক — তাই নামের আদ্যক্ষর দিয়েছি।

মূলতঃ নির্ভর করা হয়েছে দেল্যুজ, ফুকো এবং সিমন্দঁ নামে তিনজন ফরাসী দার্শনিকের ওপর। গত শতাব্দীর শেষ অর্ধে তাদের সক্রিয়তা। মূল ভিত্তি দেল্যুজের ‘দিফেরঁস এ রেপিতিশিঁও’ বা ‘ফারাক ও পুনরাবৃত্তি’ বইটি। অন্য নানা দার্শনিকের লেখা ও প্রসঙ্গ এসেছে এই বইয়ের লেখার সূত্র ধরে। পাশ্চাত্য দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে এই বইটি। একটা কারণ হল, পশ্চিমে দর্শন গত কয়েক শতক ধরে যেভাবে বিকশিত হয়েছে, অন্য কোথাও তা সেভাবে হয়নি বলে আমি জেনেছিলাম, তাই নিজে একজন সমাজকর্মী হিসেবে যখন সঙ্কটে পড়েছি, তখন তারই স্মরণাপন্ন হয়েছি। খুঁজতে খুঁজতে মিলেছে এইগুলি। পাশ্চাত্যের ভাষাগুলির মধ্যে ইংরেজি বাদে ফরাসী জানা থাকার ফলে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এদের স্মরণাপন্ন হতে বাধেনি। চেষ্টা করেছি আধুনিকতম দার্শনিকদের পড়তে এবং তাদের মধ্যে দিয়ে পেছনদিকে যেতে। সে বার্গসন বা অ্যারিস্টটল বা নিৎশে বা হেইডেগার বা হেগেল, যে–ই হোক। আগে মার্ক্সের বেশ কিছু পড়াশুনা ছিল। ওটাই যা পূর্বপাঠ। অনেকের কাছে শুনেছি, ভারতীয় দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন — ইত্যাদিতে এখানে যা যা বলা হয়েছে তার কিছু কিছু নাকি পাওয়া যায়। যেতেই পারে। আমার জানা নেই। পড়া নেই। অর্থাৎ, এই লেখা বা বই বা রিডিং ম্যাটেরিয়াল সমসাময়িক বাংলায় সমাজকর্মীর প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক দর্শনের স্তরে পূর্ণাঙ্গ কোনো প্রয়াস নয়। সেরম কোনো ইচ্ছেও নেই। কোনো নতুন কিছু করার উদগ্র বাসনা থেকেও এই–টি নয়, বলা ভালো বাধ্য হয়েই এই কাজটি করা।

প্রসঙ্গতঃ আমি অনিয়মিতভাবে একটা রাজনৈতিক দর্শনের স্টাডি ক্লাসও চালাই। গোটা চার–পাঁচেক ক্লাস হয়েছে। অনেকদিন বন্ধ আছে। ফের শুরু হবে। এই বইটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য সেই স্টাডি ক্লাসের একটা রিডিং

ম্যাটেরিয়াল হওয়া। অনুবাদ কোথাও কোথাও খটোমটো লাগতে পারে, তাকে আটপৌরে করার আমার আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও। সেক্ষেত্রে পাঠকদের কাছে আমার সাজেশন — পড়ে গেলেই চলবে। একবার, দু–বার ...। সবকিছু না বুঝলেও, অচেতনে কিছু ঢুকে যাবে। ভাষার একটা নিজস্ব ক্ষমতা আছে।

৪)
রাজনৈতিক দর্শন–এর এই বই কোনো দেশ কাল ছাপানো ব্যাপার নয়। এর আয়ু কতদিন তা সম্পূর্ণভাবে পরিস্থিতি নির্ভর। আশা করা যায়, এখন কিছু লোক এটা পড়বে। এটাও আশা করা যায়, একটা সময় আসবে যখন আর এটা পড়ার দরকার পড়বে না।

সূচনা ও পূর্বধারনা

শুরুর কথা

‘ফারাক ও পুনরাবৃত্তি’ বইটির ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় (১৯৯৪) জিল দেল্যুজ লিখেছিলেন, তৃতীয় অধ্যায় বা ‘চিন্তার প্রতিকৃতি …’ অধ্যায়টি তার এখন মনে হয় বইটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুগঠিত অধ্যায়। সেই অধ্যায়ের শুরুতেই রয়েছে দর্শনের প্রাক–দর্শন প্রতিকৃতির কথা। দর্শনকে তার প্রাক–দর্শন প্রতিকৃতি, চিন্তাকে চিন্তার সাধারন বোধ তথা সু–বোধ লালিত প্রতিকৃতি থেকে মুক্ত হতে হবে – এমনই ছিল দেল্যুজের ভাবনা।

বিষয়গত আর বিষয়ীগত পূর্বধারনা বাধ সাধে

দেল্যুজ শুরু করেন কীভাবে শুরু করা যায় এই প্রশ্নটার মাধ্যমে। দর্শনের শুরুটা কী দিয়ে করা হবে, অর্থাৎ শুরুর ধরে নেওয়া বা পূর্বধারনাগুলি – বিষয়গত (অবজেকটিভ) বা বিষয়ীগত (সাবজেকটিভ) – দুই–ই হতে পারে। বিষয়গত পূর্বধারনাগুলি হয় স্ফুট, সুব্যক্ত। কিন্তু বিষয়ীগত পূর্বধারনাগুলি হয় উহ্য। বিষয়ীগত পূর্বধারনাগুলি ধারনায় থাকে না, থাকে সর্বগ্রাহ্য মতামতে : যেমন ধারনা যাই হোক না কেন, সবাই জানে কাকে বলে স্ব, কাকে বলে চিন্তা করা, কাকে বলে অস্তিত্ব। তাই ‘আমি মনে করি’ দিয়ে শুরু করা যায়। (দেকার্তে বিষয়গত পূর্বধারনাগুলি অস্বীকার করলেও বিষয়ীগত পূর্বধারনা এড়াতে পারেন নি। এই জন্য দেকার্তের সমালোচনা করলেও হেগেলও এই বিষয়ীগত পূর্বধারনা এড়াতে পারেননি। হেইডেগারও প্রাক–

অন্টোলজিক্যাল অস্তিত্বের বোঝাবুঝিকে পেড়ে এনেছিলেন) আমরা তাই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতেই পারি, দর্শনে সত্যিকারের সূচনা বলে কিছু হয় না। কিন্তু শেষে গিয়ে সেই শুরুটাকে পুনরাবিষ্কার করা, দর্শনের একটা বৃত্তাকার ছবি – তার যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন – সহজ একটা বার্তা পাওয়া যায়, দর্শন সত্যিকারের সূচনায়, অথবা খাঁটি পুনরাবৃত্তিতে, অক্ষম।

বিষয়ীগত পূর্বধারনার সবচেয়ে 'নিরীহ', 'নির্বোধ' রূপ : 'এটা তো সব্বাই জানে ...'

> *তাহলে এই উহ্য বা বিষয়ীগত পূর্বধারনাটি কী? এর রূপটা হলো : 'এটা তো সব্বাই জানে ...'। এক প্রাক-দর্শন পূর্বধারনা – 'এটা তো সব্বাই জানে ... কেউ এটা অস্বীকার করতে পারবে না।' তাই দার্শনিক যখন বলেন, 'আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি', তিনি তখন ধরে নেন, সবাই জানে থাকা মানে কি আর চিন্তা করা মানে কি। ... সব্বাই জানে, কেউ অস্বীকার করতে পারবে না – এ হলো প্রতিনিধিত্বের রূপ, প্রতিনিধির বাচন। যখন দর্শন এই পূর্বধারনাটিকে নিয়ে শুরু করে, তখন সে দাবি করতে পারে তার সরলতা, সে তো কিছুই আগে থেকে ধরে নেয়নি, অবশ্যই মূল ব্যাপারটা ছাড়া, যা হলো এই বাচনের রূপটি। তারপর সে নীতিবাগীশদের বিরুদ্ধে দাঁড় করায় 'নির্বোধ'কে, এপিস্টেমনের (বিশারদ (গ্রি.)) বিরুদ্ধে ইউডোক্সাসকে (সুমতি (গ্রি.)), উপচে পড়া বোধ্যতার বিরুদ্ধে সু-ইচ্ছাকে, সমসাময়িক মূলধারা দিয়ে বিকৃত হয়ে যাওয়া মানুষের বিরুদ্ধে কেবল স্বাভাবিক চিন্তা করার সক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে। দার্শনিক নির্বোধের পক্ষ নেয়, যেন সে পূর্বধারনাবিহীন একজন মানুষ। বাস্তবে, ইউডোক্সাসের (সুমতি (গ্রি.)) কিন্তু এপিস্টেমনের (বিশারদ (গ্রি.)) চেয়ে কম কিছু পূর্বধারনা নেই, তারটা কেবল অন্যরকম, উহ্য বা বিষয়ী রূপের, 'প্রাইভেট', 'পাবলিক' নয়; চিন্তার স্বাভাবিক সক্ষমতা রূপে, যার জোরেই দর্শন দাবি করে শুরু করার, এবং কোনো পূর্বধারনা ছাড়া শুরু করার।*
>
> *প্রায় সম্পূর্ণ অনুবাদ, দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১২৯-১৩০*

বিষয়ীগত পূর্বধারনা : 'চিন্তা হলো স্বাভাবিক শারীরিক সক্ষমতা এবং চিন্তা উন্নতশির, চিন্তক সু-ইচ্ছার বশবর্তী'

অনেকেই এইভাবে বলতে ভালোবাসে যে, 'এটা' তো প্রত্যেকেই জানে, এটা তো সবাই চেনে, অথবা কেউই এটা অস্বীকার করতে পারে না। (এই বিজয়োক্তি এতটাই সুদূরপ্রসারী যে কোনো অন্যস্বর প্রত্যুত্তর করতে পারে না এই বলে যে তার হয়ে এভাবে কথাটা বলে দেওয়া যায় না, এবং সে অস্বীকার করছে, অথবা তার নামে যারা কথা বলছে সে তাদের চেনে না।) দার্শনিক সত্যিই আরো অনেকটা নির্মোহভাবে এগোয় : সে যা সার্বজনীন গ্রাহ্যতা বলে প্রস্তাবনা করে, তা হলো, কাকে বলে ভাবা, সত্ত্বা এবং স্ব। অন্যভাবে বললে, কোনো বিশেষ এটা বা ওটা নয়, কিন্তু সাধারণভাবে প্রতিনিধিত্ব বা গ্রাহ্যতার রূপটি। এই রূপটির অবশ্য একটি অন্তর্বস্তু আছে, তবে তা খুব নির্মল অন্তর্বস্তু অথবা উপাদান। সেটি হলো কেবল একটি পূর্বধারণা, যে, চিন্তা হলো শারীরিক সক্ষমতার এক স্বাভাবিক অনুশীলন; যে, চিন্তা করার স্বাভাবিক সক্ষমতা বলে একটা ব্যাপার আছে, যা সত্যাভিমুখী বা সত্যাকর্ষণে ভূষিত, চিন্তকের তরফে সু-ইচ্ছা ও চিন্তার তরফে উন্নতশির প্রকৃতি, এই দুই দিকের প্রভাবে। কারণ প্রত্যেকে স্বাভাবিকভাবেই ভাবে যে প্রত্যেকেরই মনে মনে জানার কথা চিন্তা করা মানে কি। তাই প্রতিনিধিত্বের সবচেয়ে সাধারণ রূপটি পাওয়া যায় সাধারণ বোধের উপাদানটিতে যা বোঝায় একটি উন্নতশির এবং একটি সু-ইচ্ছা (ইউডোক্সাস (সুমতি (গ্রি.)) ও গোঁড়ামি)। দর্শনের উহ্য পূর্বধারণাটি পাওয়া যেতে পারে একটি সাধারণ বোধের ধারনায়, যা হলো কগিতাশিও নাতুরা ইউনিভার্সালিস (সার্বজনীন স্বাভাবিক ভাবনা (ল্যা.))। এর ভিত্তিতে দর্শন শুরু করতে সক্ষম।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৩১

উহ্য পূর্বধারনাটি সাধারণ বোধে চিন্তার যে প্রতিকৃতি রয়েছে, তা থেকে আসে

'প্রত্যেকেই প্রকৃতিগতভাবেই জানতে চায়' থেকে শুরু করে 'দুনিয়ার সব জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে সমানভাবে বিতরিত হলো সু-বোধ' – পূর্বধারনাটির অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য দার্শনিকদের এইসব ঘোষণাগুলি একের পর এক উল্লেখ করে যাওয়ার কোনো মানে নেই, কারণ পূর্বধারনাটির গুরুত্ব যতটা না ব্যক্ত ঘোষণাগুলির অনুপ্রেরণা হিসেবে, তার চেয়ে অনেক বেশি দার্শনিকের এটাকে ঠিকঠাক লুকিয়ে নিয়ে চলায়। দর্শনের স্বীকার্যগুলি কিন্তু দার্শনিকদের প্রস্তাবনাগুলি নয় যেগুলো তারা চায় যে লোকে মানুক; বরং বিপরীতে, প্রস্তাবনামূলক দিকগুলো যেগুলি উহ্য থাকে এবং যেগুলিকে প্রাক-দর্শন রূপে বোঝা হয়। এভাবে

দেখলে, ধারনাগতভাবে দার্শনিক চিন্তার উহ্য পূর্বধারনা হিসেবে রয়েছে একটি প্রাক-দর্শন ও স্বাভাবিক চিন্তার প্রতিকৃতি, যা নেওয়া হয়েছে সাধারণ বোধের অকৃত্রিম উপাদান থেকে। এই প্রতিকৃতি অনুসারে, চিন্তার সত্যের প্রতি একটা আকর্ষণ রয়েছে; রূপগতভাবে সত্য তার অধিকারে, বস্তুগতভাবে সে সত্যকে চায়। এই প্রতিকৃতি অনুসারেই প্রত্যেকে জানে এবং প্রত্যেকের জানার কথা, চিন্তা করা মানে কী। এরপর দর্শন বিষয় বা বিষয়ী কী দিয়ে শুরু করল, সে নিজের অস্তিত্ব দিয়ে শুরু করল নাকি সত্ত্বাগুলোকে নিয়ে শুরু করল, তার আর খুব গুরুত্ব নেই, যতক্ষণ চিন্তা এই প্রতিকৃতির সাপেক্ষ হয়ে থাকে যা সবকিছুকে পূর্ববিচার করে নেয় : বিষয় ও বিষয়ীর বিতরণ, এবং আপন অস্তিত্ব ও সত্ত্বাগুলির বিতরণ।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৩১

চিন্তার এই বা ওই প্রতিকৃতি নয়, সাধারণ প্রতিকৃতি : নৈতিক?

আমরা এই প্রতিকৃতিটিকে বলতে পারি মতান্ধ, গোঁড়া অথবা নৈতিক। এর নিশ্চয়ই বিচিত্র রূপ আছে : 'যুক্তিবাদী' এবং 'অভিজ্ঞতাবাদী' এর গঠনকে একইভাবে ধরে নেয় না। আরো দেখব আমরা, দার্শনিকদের প্রায়শই দ্বিতীয় চিন্তা থাকে, এবং এই উহ্য প্রতিকৃতিটিকে শুধু মেনে নেয় না ধারনাগত চিন্তার ওপর সুব্যক্ত প্রতিফলন জনিত সংযোজন ব্যতিরেকে, যেগুলি আবার এই উহ্য প্রতিকৃতিটির বিরুদ্ধেই কাজ করে, তাকে উল্টে দিতে চায়। উহ্যতার ক্ষেত্রটি, এটি অবশ্য দ্রুত অধিকার করে ফেলে, যদিচ দার্শনিক বিশেষভাবে বলে দেয়, যে, সত্য অবশ্য 'খুব সহজে অর্জন করার জিনিস নয় এবং সবাই তার নাগাল পায় না'। এই কারণেই আমরা চিন্তার এই প্রতিকৃতি বা ওই প্রতিকৃতি নিয়ে কথা বলছি না, যা কোন দর্শনের কথা বলা হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে বদলায়; বরং একটাই প্রতিকৃতির কথা বলছি, যা দর্শনের সামগ্রিক বিষয়ীগত পূর্বধারনা দিয়ে তৈরি। যখন নীৎশে দর্শনের সবচেয়ে সাধারণ পূর্বধারনাকে প্রশ্ন করেন, তিনি বলেন এগুলো মূলতঃ নৈতিক। কারণ নৈতিকতাই একা আমাদের বোঝাতে পারে যে চিন্তার একটি সু-চরিত্র আছে এবং চিন্তকের আছে সু-ইচ্ছে, এবং চিন্তা ও সত্যের মধ্যে যে আকর্ষণ রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়, তাকে বাস্তবায়ন করতে পারে কেবল সু। আসলে নৈতিকতা ভিন্ন আর কে আছে, এবং এই সু, যা সত্যকে দেয় চিন্তা, আর চিন্তাকে দেয় সত্য?

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৩১-১৩২

পূর্বধারনাহীন শুরুয়াতের জন্য : নৈতিক চিন্তার প্রতিকৃতির প্রাক–দর্শনকে পরিত্যাগ

ফলে, দর্শনের শর্তটি, যা কিনা হতে হবে কোনো রকম পূর্বধারনাবিহীন, তা পরিষ্কার হয়ে আসে : নৈতিক চিন্তার প্রতিকৃতিকে ঠেকনো হিসেবে না নিয়ে, বরং তার ও তার 'স্বীকার্যগুলি'র মৌলিক সমালোচনার করে তাকে ছেড়ে আসা। এটি এর ফারাককে, অথবা সত্যিকারের সূচনাকে সূচিত করবে ওই প্রাক–দর্শন প্রতিকৃতির সঙ্গে সহমত হয়ে নয়, বরং তার সঙ্গে কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, যাকে এ ভর্ৎসনা করবে না–দর্শন বলে। এর ফলে সে প্রতিকৃতিবিহীন চিন্তার মধ্যে আবিষ্কার করবে তার নির্ভেজাল পুনরাবৃত্তি, যদি তা সর্বোচ্চ ধ্বংসসাধন ও সর্বোচ্চ নীতিভ্রংশর মধ্যে দিয়ে হয় তাও সই, এবং কূটাভাস ব্যতিরেকে আর কোনো মিত্র না পাওয়ার দর্শনগত একগুয়েমি, যাকে প্রতিনিধিত্ব রূপ এবং সাধারণ বোধের উপাদান উভয়কেই পরিত্যাগ করতে হবে। যেন চিন্তা শুরু করতে পারে চিন্তা করতে, এবং ধারাবাহিকভাবে শুরু করে যেতে পারে, একমাত্র যখন এই প্রতিকৃতিটি এবং তার স্বীকার্যগুলি থেকে স্বাধীন হতে পারে। চিন্তার এই বিকৃত প্রতিকৃতিগুলিকে প্রক্ষেপ করা স্বীকার্যগুলির সাথে বোঝাপড়া না করে সত্যের মতবাদটি সূত্রবদ্ধ করার দাবি বৃথা।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৩২

কিন্তু সবাই যা জানে তা অস্বীকার করা কি আভিজাত্য নয়?

... এখানে সেখানে বিচ্ছিন্ন এবং আবেগজড়িত আর্তচিৎকার ওঠে। কীকরে তারা বিচ্ছিন্ন না হয়ে থাকতে পারে, যখন তারা 'সবাই যেটা জানে ...' সেটাকেই অস্বীকার করছে? এবং আবেগজড়িত, কারণ তারা এমন কিছু অস্বীকার করছে যা কেউই অস্বীকার করতে পারে না বলে বলা হয়। এই ধরনের প্রতিবাদ অভিজাত সংস্কারের নামে হয় না : এটা খুব অল্প কিছু লোকের চিন্তা হিসেবে বলার প্রশ্ন নয়, চিন্তা করা কাকে বলে সেটা জানার প্রশ্নও নয়। বিপরীতে, এটা যদি একজনেরও হয়, তবে সেই একজনেরই ব্যাপার, যে প্রয়োজনীয় বিনয়ের সঙ্গেই সব্বাই যা জানে তা জেনে উঠতে পারেনি, এবং যা সব্বার পরিচিত হওয়ার কথা তা অস্বীকার করছে। এমন একজন যে চায় না কাউকে

তার প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নিতে, কারোর প্রতিনিধিত্ব করতেও সে চায় না।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৩০

কে সত্যিই শুরু করতে পারে : বরং যে কু-ইচ্ছেয় টইটম্বুর, বরং যে চিন্তায় অক্ষম, গা-ঢাকা দেওয়া 'নির্বোধ'

সে এমন একজন ব্যক্তি নয়, যার সু-ইচ্ছা এবং চিন্তার স্বাভাবিক সক্ষমতা রয়েছে, বরং একজন ব্যক্তি যে কু-ইচ্ছেয় পরিপূর্ণ এবং যে ভেবে উঠতে পারে না, স্বাভাবিকভাবে বা ধারনাগতভাবে। একমাত্র এই ব্যক্তিই পূর্বধারণারহিত। একমাত্র এই ব্যক্তিই কার্যকরীভাবে শুরু করতে পারে, এবং কার্যকরীভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারে। এই ব্যক্তির কাছে বিষয়ীগত পূর্বধারনা বিষয়গত পূর্বধারনাগুলির চেয়ে কম কুসংস্কার নয় : ইউডোক্সাস এবং এপিস্টেমন দুটিই এক এবং একইরকম দিগভ্রান্তকারী ছবি যেগুলোকে অবিশ্বাস করা দরকার। নির্বোধ সাজার ঝুঁকি আছে, কিন্তু তা সাজতে হলে সাজতে হবে রাশিয়ান কায়দায় : একজন গা-ঢাকা দেওয়া মানুষের মতো, যে নিজেকে চিন্তার স্বাভাবিক সক্ষমতার মতো বিষয়ীগত পূর্বধারনা দিয়ে চিহ্নিত করে না, সমসময়ের সংস্কৃতির বিষয়গত পূর্বধারনার পরিচিত না হওয়া তো আছেই। এবং (দর্শনের শেষে গিয়ে শুরুটাকে পুনরাবিষ্কার করার) বৃত্ত বানানোর কম্পাসটিও যার হাতে নেই। এই রকমই একজন হলো অসময়ের, না সে সমসাময়িক, না সে চিরকালীন। (রাশিয়ান দার্শনিক) শেস্তভ, তার প্রশ্নগুলি, তার কু-ইচ্ছে, চিন্তার ক্ষেত্রে চিন্তা করার অক্ষমতাকে তার ঢুকিয়ে দেওয়া, এবং এইসব অতিপ্রয়োজনীয় প্রশ্নসমূহের মধ্যে দিয়ে বিকশিত তার দ্বৈত মাত্রা যা একইসাথে সর্বাপেক্ষা মৌলিক সূচনা এবং সর্বাপেক্ষা জেদী পুনরাবৃত্তি।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৩০।

এই পরিচ্ছদের সবশেষে একটি টিপ্পনি দেওয়া হচ্ছে। এটি ফেসবুকে প্রকাশিত হয়েছিল। আমেরিকা ও ইউরোপের মিটু 'আমিও' এবং হিমটু বা 'সে-ও' নারীবাদী হস্তক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রায়া সরকার নামে একটি মেয়ে একটি তালিকা ইন্টারনেটে প্রকাশ করে, যার নাম ছিল — 'হল অব শেম' বা 'লজ্জার অঙ্গন', এবং সেই তালিকাতে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানের শতাধিক পুরুষ অধ্যাপকের নাম দেওয়া হয় এবং তাদের

করা যৌনহেনস্থার বিবরণ দেওয়া হয়। এই অধ্যাপকরা কেউ কেউ নারীবাদী বা তাদের সমর্থক হিসেবে পরিচিত। এই তালিকা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে নারীবাদী অ্যাকাডেমিক এবং আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিভাজন হয়ে যায়, তালিকা প্রকাশের পক্ষে এবং বিপক্ষে — এই হিসেবে। যারা বিপক্ষে, তারা বলেন, এইভাবে তালিকা প্রকাশ করে দাগিয়ে দেওয়া যায় বিনা বিচারে, কিন্তু কোনো লাভ হয় না। এতে হয়ত কেউ দোষ করেনি, কিন্তু তার নামও চলে আসতে পারে, যেহেতু তালিকাটি অভিযোগের ভিত্তিতে করা। বরং অ্যাকাডেমিক কাঠামোগুলির মধ্যে যে অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া আছে, সেই প্রক্রিয়া মেনে এগোনোই ভালো। দরকারে সেই প্রক্রিয়া আরো স্বচ্ছ, আরো নিগৃহিত-বান্ধব করার দাবি তোলা যেতে পারে। বিপরীতে তালিকা প্রকাশের পক্ষে যারা তারা বলে, নিয়মমাফিক অভিযোগ বা 'ডিউ প্রসেস'-এ গিয়ে কোনো লাভ নেই সেটা দেখা গেছে, হেনস্থাকারী ঠিক প্রভাব খাটিয়ে বা কলকাঠি নেড়ে নির্দোষ প্রমাণ করে ফেলে নিজেকে। এতে শুধু যে হেনস্থা হল তাকে আরো কয়েক দফা মানসিক নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এবং ন্যায়বিচার পাওয়া যায় না। বিপরীতে এইসব ক্ষমতাশালী অধ্যাপকরা যেহেতু খ্যাতির ওপরে অনেকটা দাঁড়িয়ে থাকে, তাই তাদের কালিমালিপ্ত করার মাধ্যমে একটা তাৎক্ষনিক ন্যায়বিচারের অনুভূতি তৈরি হয় ভিকটিমের এবং একইসাথে ভবিষ্যতে ওই ধরনের অধ্যাপকের সঙ্গে মেলামেশা করার ব্যাপারে ভবিষ্যতের ভিকটিমদের সাবধানও করে দেওয়া যায়। তাছাড়া এই তালিকার ভিত্তিতে নিয়মমাফিক বিচার শুরু হওয়ারও সুযোগ আছে। এই প্রসঙ্গে তীব্র বাদানুবাদ হয় ফেসবুকে। সেই পরিস্থিতিতেই এই টিপ্পনি-টি কাটা হয়েছিল।

টিপ্পনি : পোড়খাওয়া ও একনিষ্ঠ

শস, ২৯।১০।২০১৭

'লিস্ট' প্রশ্নে মেয়েদের আন্দোলন যারা করে তাদের নিজেদের মধ্যে প্রকাশ্যে বিবাদ হচ্ছে। আরো স্পষ্ট করে বললে, মেয়েদের আন্দোলনের মধ্যে যে নারীবাদী ধারা, তাদের নিজেদের মধ্যে প্রকাশ্যে বিবাদ হচ্ছে। প্রকাশ্যে মানে ফেসবুকে প্রকাশ্যে। বিবাদ প্রায় এই জায়গায় পৌঁছেছে যে পোড় খাওয়া দীর্ঘদিনের নারীবাদী কর্মীরাও যখন অনেক ভেবেচিন্তে শব্দচয়ন করে অত্যন্ত সঠিক লেখা লিখছেন, তখন পারস্পরিক বিশ্বাসের দীর্ঘমেয়াদী সমাপ্তি বোঝাতে গিয়ে 'অ্যানিহিলেশন অফ মিউচুয়াল ট্রাস্ট' লিখছেন। জানিনা, এই অ্যানিহিলেশন শব্দের ব্যবহার কেবল 'সাবর্ণ' খোঁটা খাওয়ার প্রত্যুত্তরে

বাবাসাহেবের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত কিনা, নাকি এর বামপন্থী উৎসও রয়েছে, কারণ এই নারীবাদী কর্মীরা বামপন্থীও বটে।

বিবাদের সূত্রপাত পোড় খাওয়া নারীবাদী কর্মীদের 'লিস্ট'-কে 'উইথড্র' করার আবেদন জানিয়ে একটি বিবৃতি। বিবৃতি-তে আরো কিছু কথা বলা ছিল, কিন্তু যে ক্যাম্পেন-টা 'লিস্ট' প্রকাশ করা-টাই, তাকে যদি বলা হয় 'লিস্ট' উইথড্র করো, তাহলে বলে দেওয়া হলো, ক্যাম্পেন-টাই তুলে নাও। ফলে 'লিস্ট' ক্যাম্পেনের মানুষদের রেগে আগুন হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। মানছি, 'লিস্ট'-এ বেশিরভাগ নাম উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে থাকা ঘোষিতভাবে নারীবাদী (বা নারীবাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন) জন্মগতভাবে পুরুষদেরই, এবং হতে পারে সেটা ইচ্ছে করে করা হয়েছে। ইচ্ছে করে নারীবাদী সার্কেলের বাইরে থাকা জন্মগতভাবে পুরুষ 'যৌনহেনস্থাকারী'দের বাদ দেওয়া হয়েছে। শুধু নামের একটা 'লিস্ট' দেওয়া এবং হেনস্থার বিবরণ না দেওয়া, প্রকাশ্যে, তাতে 'অপরাধী' অপরাধ-কে আড়াল করে। যেটা একটা মৌলিক ভ্রান্তি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও, আমি ক্যাম্পেন-টাকেই তুলে নিতে আবেদন করব? দূরত্ব তৈরি করা, নির্মম সমালোচনা করা এক জিনিস, ক্যাম্পেন-টাকেই তুলে নিতে বলা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

যাই হোক, এসব নারীবাদী আন্দোলনের ভেতরের বিবাদ। তারা নিজেদের মধ্যে মারপিট না করে মিটিয়ে নিতে পারলেই ভালো। মানুষকে মানুষ করার জন্য নারীবাদী আন্দোলনের দরকার ফুরিয়ে যায়নি।

আমার এ প্রসঙ্গে অন্য একটা জিনিস নিয়ে বলার আছে। এই পোড় খাওয়া ব্যাপারটা নিয়ে। মানে কোনো আন্দোলনের পোড় খাওয়া কর্মী নিয়ে। দীর্ঘদিনের কর্মী নিয়ে। দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ (ডেডিকেটেড) কর্মী নিয়ে। 'লিস্ট' করিয়ে 'ইয়ং' নারীবাদী মেয়েরা পোড় খাওয়া দীর্ঘদিনের নারীবাদী কর্মীদের বলেছে 'মাসি নারীবাদী'। একে 'ডিমিনিং এজেইজম' বা হীন বয়সবাদ বলে সমালোচনা করেছে নারীবাদী কর্মীরা। শুধু কী তাই? লোকে কি শুধুই বয়স দেখে এই কথা বলে? নিশ্চয়ই তার রূপ-টা বয়স, সে জন্যই বয়সের কথা ওঠে। কিন্তু আসল টার্গেট কী? আমি ১৭ বছর বয়স থেকে যাদবপুরে ছাত্র আন্দোলন করতাম, একনিষ্ঠভাবে। ২২ বছর বয়সে যাদবপুরে ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে থেকে আমাকে 'দাদু' বলে ডেকেছিল কেউ কেউ। ২৩ এর মধ্যে আমি যাদবপুর তথা সাধারণভাবে ছাত্র আন্দোলন থেকে সরে যাই, আর ওই চৌকাঠ মাড়াইনি। আন্দোলনের মধ্যে থেকে 'দাদু' বা 'মাসি' ডাকের বাহিরটা সরিয়ে যদি ভেতরদিকে তাকানো যায়, তাহলে দেখা যাবে, আসল টার্গেট, হ্যাঁ, যেগুলো নিয়ে গর্ব করা হয়, সেগুলো, 'দীর্ঘদিনের', 'পোড় খাওয়া', 'একনিষ্ঠ'।

দীর্ঘদিন কিছু করা কি ভালো? পোড় খাওয়া মানে কী? চামড়া মোটা হয়ে যাওয়া, অনুভূতিগুলো অসাড় হয়ে যাওয়া, নয় কি? একনিষ্ঠ বা ডেডিকেটেড কি শিহরিত হয় অজানা ভবিষ্যতের জন্য? যে ভবিষ্যত জানা তা কি আদৌ ভবিষ্যত? নাকি তা অতীতের এক্সটেনশন? যার ভবিষ্যত নেই তার কি আদৌ বর্তমান আছে? বর্তমান কি আদৌ অতীতের অংশ, নাকি অতীতের অন্ত? শুরু না থাকলে অন্ত হবে কী করে? কীভাবে শুরু করা যায়? কীভাবে বার বার শুরু করা যায়? কীভাবে শুরুর পুনরাবৃত্তি করা যায়?

ভাবনা ও চিন্তা

সময়ের কথা

ভাবনা এবং চিন্তা কথাদুটি আমরা মাঝেমধ্যেই একসাথে বলি। ভাবনাচিন্তা। অর্থাৎ ভাবনা এবং চিন্তা এই দুই, খুব কাছাকাছি কিছু হলেও, এক নয়। চিন্তা সচেতন মনের ব্যাপার। ভাবনা অচেতন মনের ব্যাপার। চিন্তা কথাটা নিয়ে বহু আগে থেকে পশ্চিমী দার্শনিকরা কথাবার্তা বলেছেন। দ্যেকার্তে তো নিজে যতটা বিখ্যাত তার চেয়ে বেশি বিখ্যাত তার কথাটা, 'আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি'(১৬৩৭ সাল)। দ্যেকার্তের কথাটার বিচার বিশ্লেষণে আপাতত যাওয়া হচ্ছে না, শুধু বলা দরকার, দ্যেকার্তের তর্কটা ছিল এরকম, 'আমরা তো আর আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হতে পারি না যখন আমরা সন্দেহ করছি ...'। চিন্তা করি, কথাটা ল্যাটিনে ছিল 'কগিটো', দ্যেকার্তে ছিলেন ফরাসী, তো ফরাসীতে সেটা হল je pense, আর ইংরেজিতে 'আই থিংক'। দ্যেকার্তে বুঝিয়েছিলেন, যে চিন্তা করছে, সে আছে-ই। অর্থাৎ চিন্তার চিন্তক আছে। দ্যেকার্তের এই 'আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি' বক্তব্যের বিরোধিতা করেছে পরে বহু দার্শনিক। বিরোধিতা করতে গিয়ে 'চিন্তা কী?' এই প্রশ্ন উঠে গেছে বারবার। দ্যেকার্তে বলেছিলেন, তার দর্শনের (এবং সম্ভবতঃ পশ্চিমী দর্শনের) একটি ভিত্তিবাণী এইটা। হেইডেগার শুরু করেছিলেন এইভাবে — সবচেয়ে চিন্তা-উদ্রেককারী হল তা, যা আমরা এখনও চিন্তা করছি না। যাক গে, মোট কথা হল, চিন্তা একটি সচেতন ক্রিয়া। চিন্তা সম্পর্কে পরে আমরা আবার আলোচনা করব।

ভাবনা কিন্তু মনের অচেতন ক্রিয়া। ভাবনা কথাটা পশ্চিমী দর্শনে

চিন্তার সমার্থক বলেই হয়ত ধরা হত। দেল্যুজ ব্যবহার করেন ফরাসীতে (একই ইংরেজিতেও) contemplation বলে কথাটা। সেইটার বাংলা আমি করেছি ভাবনা। এমনিতে ঐটার মানে সাধনা করলেই ভালো দাঁড়াত। দেল্যুজ বিশেষজ্ঞ ড্যানিয়েল স্মিথ বলেছিলেন, কনটেমপ্লেশন শব্দটা একটা প্রাচীন ধারনা, তাকে দেল্যুজ দিয়েছেন একটি সমসাময়িক দ্যোতনা। কিন্তু আরেক দেল্যুজ বিশেষজ্ঞ জেমস উইলিয়ামস, যিনি দেল্যুজের সময় সংশ্লেষ নিয়েই নির্দিষ্টভাবে লিখেছেন, তিনি লিখেছেন, 'কনটেমপ্লেশন তাই কোনো সচেতন বিবেচনার রূপ নয় বা তার লক্ষ্যে কিছু নয়, বরং অচেতনে এসে যাওয়ার একটি রূপ।'

সাধনা–র মধ্যে কি 'অচেতন গ্রহণ' বা 'অচেতনে আসা' থাকছে? না। থাকছে না। ধ্যান–এও থাকছে না। সাধনা এবং ধ্যান এই দুটোই action বা কার্য. তাই বাংলা করতে হয়, ভাবনা। contemplation হলো ভাবনা।

ধরা যাক, তুমি বার বার শুনেছো আগে, কখ, কখ, কখ, কখ। একবার ক বলা হচ্ছে, পরমুহুর্তেই খ বলা হচ্ছে। যদিও ক এবং খ এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। এবার তুমি হঠাৎ শুনলে ক। তাহলে তুমি প্রত্যাশা করবে, পরমুহুর্তেই খ বলা হবে। অর্থাৎ অতীতের কখ তোমাকে ভবিষ্যতের ক এর পরে খ আসবে এই ভাবনা দিচ্ছে এবং এই ভাবনা তুমি ভাবছ বর্তমানে। তোমার মন কি সচেতনভাবে এটা ভাবছে? না। তোমার মন এটা ভাবছে না। তোমার মনে এই ভাবনাটা এসে যাচ্ছে। যেখানে অতীতের দুটি উচ্চারণ, ক এবং খ, দুটি আর আলাদা নেই। সংকুচিত হয়ে যেন একটাই উচ্চারণ হয়ে গেছে — কখ। এই যে 'সময় সংশ্লেষ'টি হলো তোমার মনের মধ্যে, যা কিনা অতীত থেকে ভবিষ্যতে গেল, কিন্তু আসলে রইল তোমার মনের মধ্যে, বর্তমানে — এটাই নিষ্ক্রিয় সময়–সংশ্লেষ বা নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ। সমস্ত স্মৃতি এবং প্রতিফলনের আগে এটা ঘটে, ভাবনায়।

এখানে স্পষ্টতঃই ভাবনাকে বলা হচ্ছে 'নিষ্ক্রিয় সময় সংশ্লেষ'। তা এই নিষ্ক্রিয় সময় সংশ্লেষ বা ভাবনায় কি বিষয়ী নেই? এখানে খেয়াল রাখা দরকার, দ্যেকার্তের মতে কিন্তু চিন্তার বিষয়ী আছে। বিষয়ীহীন চিন্তা সম্ভব না। চিন্তার চিন্তক আছে। হ্যাঁ, ভাবনার কি বিষয়ী নেই? এই কথায় আসার পথেই আরো মৌলিক একটি প্রশ্নের একটি পক্ষ নিয়েছেন, উত্তর দিয়ে দিয়েছেন দেল্যুজ। খোদ সময়ই বিষয়ীহীন নয়।

'সময় হলো বিষয়ীগত। কিন্তু একটি নিষ্ক্রিয় বিষয়ীর বিষয়ীত্বর সাপেক্ষে।'

অর্থাৎ, ভাবনা হল এক নিষ্ক্রিয় বিষয়ীর বিষয়ীত্বর সাপেক্ষে।

ভাবনায় ঢোকার আগে সময় নিয়ে একটু বলা যাক। সময় হলো বিষয়ীগত।

অবজেকটিভ বা বস্তুগত, অর্থাৎ বিষয়ীনিরপেক্ষ সময় বলে কিছু নেই। সময় বলতে কিন্তু সময়ের অনুভব। আপাতত, সময় মানে সময়ের অনুভব — এই অবদি আমরা আলোচনাটায় ঢুকছি। পরে কখনো আমরা এর চেয়েও আরেকটু দূরে আলোচনাটা নিয়ে যাব। অনুভব ছাড়াও সময় বলে কিছু আছে নাকি? গত শতাব্দীর বিশের দশকে প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক আঁরি বার্গসন এবং উদীয়মান জার্মান বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মধ্যে এই নিয়ে তর্ক হয়েছিল। বার্গসন মূলতঃ এই মতের প্রবক্তা ছিলেন, সময় মানে সময়ের অনুভব। আর আইনস্টাইন বলেছিলেন, না, ওই 'দার্শনিকের সময়' আসলে মনোজাগতিক সময়। এছাড়াও একটা বস্তুগত সময় আছে। সেটা নিয়েই বিজ্ঞান চর্চা করে। তর্কটা হয়ত কিছুটা এগোত। কিন্তু বার্গসন আইনস্টাইনের অঙ্ক বুঝতে কিছু ভুল করে ফেলেছিলেন, এবং সেটা নিয়ে ঢি ঢি পড়ে যায়। সেই তর্কে বার্গসন প্রকাশ্যে আইনস্টাইনের কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন বলে বলা হয়। দেল্যুজ বার্গসনপন্থী। ইদানিং ফের আইনস্টাইন এবং বার্গসনের তর্ক নিয়ে নতুন চর্চা শুরু হয়েছে। পরে এই নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আপাতত আমরা বিতর্কটাকে এড়িয়ে যাই, এটা ধরে নিয়ে যে সময় মানে সময়ের অনুভব। এর চেয়ে বৃহত্তর কিছু আর দরকার পড়ছে না এখন।

নিষ্ক্রিয় বিষয়ীর বিষয়ীত্ব ব্যাপারটা কী? এটা বুঝতে গেলে সক্রিয় সংশ্লেষ এবং নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের মধ্যে একটা ভেদরেখা টানা জরুরি। পুনরাবৃত্তির উপাদানগুলো যখন পরপর আসে, যেমন আগের উদাহরণে আমরা দেখলাম, ক এর পর খ, উপাদানগুলো দিয়ে যখন কখ কখ কখ এই পুনরাবৃত্তির 'কেস'গুলো তৈরি হল, সেগুলো একবার যখন সংকুচিত হয়ে যায় বা ভূমিষ্ঠ হয়ে যায় কল্পনায়, সেগুলো কিন্তু স্মৃতি বা বোধের মধ্যেই তার অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে না।

> *কল্পনায় গুণগত ছাপের ভিত্তিতে, স্মৃতি প্রতিটি 'কেস'কে পৃথক পৃথকভাবে পুনর্নির্মাণ করে, সেগুলো নিজের 'সময়গত পরিসরে' সংরক্ষিত করার মাধ্যমে। অতীত তখন আর ধরে–রাখার আশু অতীত নয়, বরং সে প্রতিরূপের আত্মবাচক অতীত, অথবা প্রতিফলিত এবং পুনরুৎপাদিত বিশেষতা। একই ভাবে ভবিষ্যৎ–ও আর তখন প্রত্যাশার আশু ভবিষ্যৎ নয়, বরং সে হয়ে গেছে ভবিষ্যতগণনার/ আন্দাজের আত্মগত ভবিষ্যৎ, বোঝাপড়ার প্রতিফলিত সাধারণীকরণ।*
>
> *দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (পুনরাবৃত্তি নিজের জন্যই), ইংপৃ ৭১, ফপৃ ৯৮*

এই প্যারাগ্রাফে দেল্যুজ বলে দিচ্ছেন, কীভাবে পুনরাবৃত্তির কেসগুলো,

যেগুলো ভূমিষ্ঠ হয়ে গেল কল্পনায়, সেগুলো সংরক্ষিত হল স্মৃতিতে, বা, যেগুলোকে পুনরাবৃত্ত হবে বলে আন্দাজ করা হচ্ছে। যা ধরে রাখা হল স্মৃতিতে, তা কিন্তু আত্মবাচক, অর্থাৎ থেকে গেল নয়, কল্পনায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কেসটিকে, বা আরো ভালো করে বললে কেসটির প্রতিরূপটিকে নিজে নিজে রেখে দেওয়া হল। তাকে প্রতিফলন ঘটানো হল বা পুনরুৎপাদিত করা হল স্মৃতিতে। এবং ভবিষ্যৎ–এ সেটি আসবে, সেটাও তখন আর কেবল প্রত্যাশা হয়ে থাকল না। হয়ে গেল ভবিষ্যতগণনা বা আন্দাজের ভবিষ্যৎ। বোধে প্রতিফলন ঘটেছে যা, তার সাধারণীকরণ। এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সক্রিয়তার ভূমিকা। যা প্রাথমিক নিষ্ক্রিয়তার ওপর দাঁড়িয়ে ঘটছে। প্রথমটি, অর্থাৎ কল্পনায় পুনরাবৃত্তির কেস–টির (কখ) ভূমিষ্ঠ হওয়াটা — সেটা নিষ্ক্রিয় সময় সংশ্লেষ। আর পরেরটি, সেটিকে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা এবং ভবিষ্যতে তার আগাম আন্দাজ — সেটা সক্রিয় সময় সংশ্লেষ।

নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের প্রাথমিকটি হল গঠনের উপাদান রূপী নিষ্ক্রিয়তার স্তর।

> *... গঠনের উপাদান রূপী নিষ্ক্রিয়তার স্তরে সংবেদনী সংশ্লেষ ফিরে আসে জৈব সংশ্লেষ–এ, যেন অনুভূতির অনুভব, এক প্রাথমিক অনুভব — আমরা হলাম। জল থেকে হলাম আমরা, মাটি থেকে হলাম আমরা, আলো থেকে, বায়ু থেকে হলাম আমরা, এগুলো সব সংকুচিত হয়ে এই আমরা। কেবল সেগুলোর পরিচয়ের আগে বা সেগুলোর প্রতিরূপের আগে নয়, সেগুলোর অনুভবেরও আগে। সমস্ত জীব, তাদের গ্রহনীয় ও সংবেদী উপাদানে তো বটেই, এমনকি তার নাড়িভুঁড়িতেও, সংকোচন, ধারণ, এবং প্রত্যাশার সমষ্টি। এই প্রাথমিক সঞ্জীবনী অনুভবগুলির স্তরে, বর্তমানকে দেখা যায় তার সময়ের মধ্যে ধরে ফেলতে একটি অতীত এবং একটি ভবিষ্যৎকে। ভবিষ্যৎ আসে প্রত্যাশার জৈব রূপ, অপেক্ষার মধ্যে দিয়ে। অতীত আসে ধারনের জৈব রূপ, কোষীয় বংশগতির মধ্যে দিয়ে। সবচেয়ে বড়ো কথা, এই জৈব সংশ্লেষ, এবং তার ওপর কাঠামো তৈরি করা সংবেদী সংশ্লেষের সঙ্গে তার যুগলবন্দী, তা মনো–জৈব স্মৃতি এবং বুদ্ধির সক্রিয় সংশ্লেষের মধ্যে পুনঃসংস্থাপিত হয় (সহজাত প্রবণতা এবং প্রশিক্ষণ)।*
>
> *দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (পুনরাবৃত্তি নিজের জন্যই), ইংপৃ ৭৩, ফপৃ ১০০*

আমাদের গঠনের অনুভবের (অনুভূতির অনুভব) মধ্যেই রয়েছে প্রাথমিক নিষ্ক্রিয় সময় সংশ্লেষ। যাকে বলা যেতে পারে জৈব সংশ্লেষ। তারপর সেই অনুভবের সংবেদন, যা দেল্যুজের ভাষায় কাঠামো, তার সংশ্লেষ। দেল্যুজ এখানে নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের দুটি স্তরের কথা বলছেন। একটি হল জৈবিক

সংশ্লেষ। অনুভূতির অনুভব। যা স্রেফ গঠন। আমরা হলাম — এটুকুই। জল থেকে, মাটি থেকে, আলো থেকে, বায়ু থেকে। তারপর — সেই জৈবিক সংশ্লেষের সংবেদন কাঠামো — সংকোচন, ধারন এবং প্রত্যাশা। সেটিও নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ। এবার সেই দুই নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের জোড় — তা স্থাপিত হয় স্মৃতি এবং বুদ্ধির সক্রিয় সংশ্লেষের মধ্যে।

নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ সম্পর্কে কথা বলতে গেলে প্রথমেই চলে আসে অভ্যেসের কথা। অভ্যেসের সমস্যা সক্রিয়তা এবং নিষ্ক্রিয়তার বা ভাবনাকে বড়ো ভালোভাবে আলাদা করতে পারে। কিন্তু প্রথমেই যে প্রশ্নটা আসবে, আমরা কাকে 'অভ্যেসবশতঃ' অভ্যেস বলছি? অভ্যেস ভাবতেই আমরা যে সক্রিয়তার কথা ভেবে ফেলি, অভ্যেসবশতঃ, তার কারণ কি এই নয় যে আমাদের মনে সক্রিয়তার একটি প্রতিমা গড়া আছে? আমরা কেবল যা নড়ছে তাকেই দেখতে পাই? যা নড়ছে না, তাকে দেখতে পাই না? অভ্যেস কি সক্রিয়তা দিয়ে তৈরি, নাকি তা আসলে ভাবনা দিয়ে তৈরি? 'অভ্যেস তার সারমর্মে হলো সংকোচন।' এবং সংকোচন ক্রিয়াপদটি আরেকটি ক্রিয়াপদের সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবহার হয়, প্রসারণ। এই সংকোচন-প্রসারণ মিলে তৈরি হয় অভ্যেস। একটি কেস-এর প্রথমটি সংকোচন, পরেরটি প্রসারণ বা শিথিলায়ন। এই সংকোচনের পুনরাবৃত্তি হল নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ, যা আমাদের বেঁচে থাকার অভ্যেসটিকে গঠন করে, অর্থাৎ, আমাদের সাধ, 'যা চলছে' তা চলবে, যেমন ওই একটা উপাদানের পর যেটা আসে সেটা আসবেই, আমাদের 'ব্যাপারগুলো' চিরস্থায়ী হবে নিশ্চিতভাবে।

> *আমাদের অবশ্যই এক আত্মা আরোপন করা দরকার হৃদয়ে, পেশীতে, স্নায়ুতে, কোষে, কিন্তু তা এক ভাবুক আত্মা যার গোটা ভূমিকাটাই হলো অভ্যেসের সংকোচন। এই খানে কোনো বর্বর বা নিগূঢ় প্রকল্প কিছু নেই : বিপরীতে, অভ্যেস সেখানে বিকশিত হয় তার পূর্ণ সাধারণত্বে, যা কেবল সেনসরি-মোটরীয় অভ্যেস বোঝায় না যা আমাদের আছে (মনোস্তত্ত্বগতভাবে), বরং তা সর্বাগ্রে বোঝায় প্রাথমিক অভ্যেস, যা আমরা হই, হাজার হাজার নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ যা আমাদের জৈবিকভাবে গঠন করে। একইসাথে, এই সংকোচনে আমরা হই অভ্যেস, কিন্তু আমরা সংকোচন করি ভাবনার মাধ্যমে। আমরা হই ভাবনার থেকে, আমরা হই কল্পনার থেকে, আমরা হই সাধারণত্ব থেকে, আমরা হই চাহিদার থেকে, আমরা হই সন্তুষ্টির থেকে। যেহেতু চাহিদা ব্যাপারটা সংকুচিত ভাবনা ছাড়া আর কিছু নয় যা দিয়ে, যা আমরা সংকোচন করছি, তার ওপর আমাদের অধিকার এবং প্রত্যাশা প্রত্যয়িত করি, এবং আমাদের স্ব-সন্তুষ্টি যখন আমরা ভাবি। আমরা নিজেরা নিজেদের ভাবতে পারি*

না, কিন্তু আমরা রই কেবল ভাবনায়, অর্থাৎ সংকোচনের মাধ্যমেই আমরা চলি।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (পুনরাবৃত্তি নিজের জন্যই), ইংপৃ ৭৪, ফপৃ ১০১

এই নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের বা ভাবনার একটা মজাও আছে।

নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের একটি সৌন্দর্য আছে। এবং আমরা সকলেই নার্সিসাস, কারণ, আমরা নিজেদের বাদ দিয়ে অন্য বিষয়ে ভেবে যা মজা পাই, তার চেয়ে বেশি মজা পাই ভাবছি এই অনুভবে (স্ব–সন্তুষ্টি)।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (পুনরাবৃত্তি নিজের জন্যই), ইংপৃ ৭৪, ফপৃ ১০২

এ প্রসঙ্গে আরো কিছুদূর এগোনো যায়। স্যামুয়েল বাটলারকে টেনে এনে দেল্যুজ লিখে যান,

অভ্যেস ছাড়া আর কোনো ধারাবাহিকতা নেই। যে লক্ষ লক্ষ অভ্যেস দিয়ে আমরা তৈরি, তার চেয়ে আলাদা কিছু ধারাবাহিকতা নেই, যা আমাদের মধ্যে তৈরি করে বহু কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং চিন্তাশীল আমি, বহু চাহিদা এবং সন্তুষ্টি। 'কারণ এমনকি খেতের শস্য–ও ফলে কুসংস্কারের ভিত্তিতে যা হলো তার নিজের অস্তিত্ব, এবং মাটি ও আর্দ্রতা–কে গম বানায় কেবল নিজের তা করতে পারার ক্ষমতার দেমাকের মধ্যে দিয়ে, যে বিশ্বাস ব্যতিরেকে তা ক্ষমতাহীন।' একমাত্র জগৎবাদীই খুশীমনে এই সূত্রায়নের ঝুঁকি নিতে পারে। মাটি এবং আর্দ্রতার একটা সংকোচন ঘটেছে এখানে যার নাম আমরা দিয়েছি গম, এবং এই সংকোচন হলো একটা ভাবনা, এবং সেই ভাবনার স্বয়ং–সন্তুষ্টি। খেতের লিলি, তার কেবলমাত্র অস্তিত্বের দ্বারাই, আকাশের, দেবদেবীর গরিমা কীর্তন করে, অর্থাৎ, সেই সব জিনিসের যাদের কথা সে বোধ করে সংকোচনের মাধ্যমে। কোন জীবটি গঠিত নয় পুনরাবৃত্তির উপাদান এবং কেসগুলি দিয়ে? বোধিত এবং সংকুচিত জল, নাইট্রোজেন, কার্বন, ক্লোরাইড, সালফেট, যে সমস্ত কিছুর মধ্যেই ধরা থাকে সমস্ত অভ্যেসগুলি যা দিয়ে সে নিজে গঠিত?

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (পুনরাবৃত্তি নিজের জন্যই), ইংপৃ ৭৫, ফপৃ ১০২

ভাবনা বা নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ, অভ্যেস — এসবের সঙ্গে সক্রিয় সংশ্লেষের একটা সম্পর্ক আমরা দেখতে পেলাম। সক্রিয় সংশ্লেষ নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কার্যকলাপ এবং সক্রিয়তা?

কাজটা করে যে আমি, তার তলায় বহু ছোটো ছোটো আমি ভেবে চলেছে, এবং তারা কাজটিকে ও কর্তার সক্রিয় হওয়া সম্ভব করছে।

আমরা ‘আমি’ বলি কেবল ওই হাজার হাজার প্রত্যক্ষদর্শীর দ্বারা যারা আমাদের মধ্যে ভেবে চলেছে; যে আমি বলে সে সবসময় একটি তৃতীয়।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (পুনরাবৃত্তি নিজের জন্যই), ইংপৃ ৭৫, ফপৃ ১০৩

কাজ বা কার্যকলাপ নিজেকে গঠন করে একটি সাধারণত্বর মাত্রার মধ্যে এবং সেই কাজের সঙ্গে মানানসই একটা চলকের ক্ষেত্রের মধ্যে। কিন্তু সেই সাধারণত্বর মধ্যে থাকে সংকোচন। সেই সংকোচন কার্যকলাপটির নিজের মধ্যে কাজ করে না। সেই সংকোচন কাজ করে একটি ‘আমি’র মধ্যে, যে ভাবে, এবং যে এই সংকোচন এবং কার্যকলাপের মধ্যে মধ্যস্থ–র ভূমিকা পালন করে। এই ভাবুক আত্মা আসলে সংযুক্ত কাজটির বিষয়ীর অন্তঃসলিলা।

এই ভাবনা বা নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ, বা প্রথম সময় সংশ্লেষ — এ আসলে সময়ের মধ্যে বর্তমানকে গঠন করে।

সময়ের সংশ্লেষ সময়ের মধ্যে বর্তমানকে গঠন করে। এইজন্য নয় যে বর্তমান হলো সময়ের একটা মাত্রা। কেবল বর্তমানই আছে। সময় সংশ্লেষ সময়কে গঠন করে জীবন্ত বর্তমান হিসেবে। এবং অতীত ও ভবিষ্যৎকে এই বর্তমানেরই দুটি মাত্রা হিসেবে। মোদ্দায়, এই সংশ্লেষ আন্তঃসাময়িক। যা নির্দেশ করে যে বর্তমান অতীত হয়ে যাচ্ছে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (পুনরাবৃত্তি নিজের জন্যই), ইংপৃ ৭৬, ফপৃ ১০৫

কিন্তু বর্তমান বা জীবন্ত বর্তমানকে কি টেনে লম্বা করা যায় না? না যায় না। কারণ ভাবনার মধ্যে রয়েছে সংকোচন যা আসলে পুনরাবৃত্তির এক মাত্রাকে নির্দেশ করে।

কোনো সন্দেহ নেই, আমরা ধারনা করতে পারি এক অনিঃশেষ বর্তমানের, একটা বর্তমান যা সময়ের সাথে সমবিস্তৃত; মুহুর্তের পর মুহূর্ত জুড়ে অসীম অবধি ভাবনাকে বয়ে নিয়ে গেলেই হলো। কিন্তু এই ধরনের বর্তমান ভৌতভাবে সম্ভব না : ভাবনার মধ্যে সংকোচন সর্বদা গুণান্বিত করে পুনরাবৃত্তির এক মাত্রা, উপাদান বা কেসগুলোর সাপেক্ষে। তা আবশ্যিকভাবে তৈরি করে কিছু সময়ের জন্য একটা বর্তমান, একটা বর্তমান যা ফুরিয়ে যায় এবং অতীত হয়ে যায়, যা বিভিন্ন পরিসর অনুযায়ী, ব্যক্তি অনুযায়ী, প্রাণী অনুযায়ী, এবং প্রাণী গোষ্ঠী অনুযায়ী।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (পুনরাবৃত্তি নিজের জন্যই), ইংপৃ ৭৬–৭৭, ফপৃ ১০৫

ভাবনার মধ্যে রয়েছে সংকোচন। সেই সংকোচন পুনরাবৃত্তির এক মাত্রা। ফলতঃ তা বর্তমানের ফুরিয়ে যাওয়ার, অতীত হয়ে যাওয়ার নিদর্শন।

বর্তমান ফুরিয়ে যায় ভাবুক বিষয়ীর কারণে। সেই কারণেই চিরস্থায়ী বর্তমান সম্ভব না। এবার নানা প্রাণী, নানা পরিস্থিতি, নানা ব্যক্তি অনুযায়ী এই বর্তমান কত বড় হবে তা নির্ধারিত হতে পারে। কী দিয়ে নির্ধারিত হবে? অর্থাৎ কতক্ষণ অবদি বর্তমান রইল? যতক্ষণ ভাবনা সংকোচন করতে পারল। সেখানে ভাবনা এবং সংকোচন উভয়েই ভেঙে গেল। এই মুহূর্ত হল অবসাদ। এই মুহূর্ত হল প্রসারণের।

> *একটি প্রাণীর বর্তমানের একটি সময়কাল, বা বর্তমানের নানা সময়কাল, তা ঠিক হয় তার ভাবুক আত্মাগুলির সংকোচনের স্বাভাবিক প্রসার অনুযায়ী। অর্থাৎ ভাবনার বাস্তব উদ্ভাস অবসাদ। আমরা ঠিকই বলি, যে কিছুই করে না, সে হলো অবসন্ন। অবসাদ সেই মুহূর্তটাকে দেখায় যার পরে আর আত্মা সংকোচন করতে পারে না যা সে ভাবছে তাকে, যেখানে ভাবনা এবং সংকোচন ভেঙে যায়। সংকোচন ছাড়াও আমরা অবসাদ দিয়েও তৈরি।*
>
> *দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (পুনরাবৃত্তি নিজের জন্যই), ইংপৃ ৭৭, ফপৃ ১০৫*

অর্থাৎ বর্তমান যেখানে শেষ সেখানে অবসাদ শুরু। বর্তমান যদি হয় ভাবনায় সংকোচন, তাহলে তার প্রসারণ হল অবসাদ। এক্ষেত্রে সক্রিয় সংশ্লেষ এবং সক্রিয়তার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ এর দৃষ্টিভঙ্গীর একটা চমৎকার তফাত আমরা দেখতে পাব, যদি আমরা 'প্রয়োজন' এবং 'অভাব', এই দুটি শব্দের ফারাককে বিচার করি। অথবা আরো ভালো করে বললে, প্রয়োজনকে আমরা অভাব হিসেবে দেখব না সন্তুষ্টি হিসেবে দেখব, এই দুই দেখার মধ্যে। নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ প্রয়োজনকে অবস্থায়িত করে বা ঘটায়। তার দৃষ্টিতে প্রয়োজন হল এক চরম সন্তুষ্টি। এক অবসাদ। সক্রিয়তা এবং সক্রিয় সংশ্লেষের দৃষ্টিতে প্রয়োজন হল অভাব।

> *ওই প্রয়োজনই যথাযথভাবে চিহ্নিত করে পরিবর্তনশীল বর্তমানের সীমাগুলি। বর্তমান প্রসারিত থাকে প্রয়োজনের দুটি উত্থানের মধ্যেটায়, এবং তা একটি ভাবনার সময়কালের সঙ্গে সমাপতিত। 'প্রয়োজনের পুনরাবৃত্তি', এবং তার ওপর যা যা নির্ভরশীল সব, প্রকাশ করে সময় সংশ্লেষের যথাযথ সময়, ওই সংশ্লেষের আন্তঃসাময়িক চরিত্র।*
>
> *... আমাদের ভাবনা সংজ্ঞায়িত করে আমাদের সমস্ত ছন্দ, আমাদের সমস্ত সঞ্চয়, আমাদের প্রতিক্রিয়ার সময়, হাজার হাজার পরস্পর–গ্রন্থিত, বর্তমান ও অবসাদ যা দিয়ে আমরা তৈরি। নিয়মটা হলো, একজন তার নিজস্ব বর্তমানের, বা বলা ভালো, বর্তমানগুলোর চেয়ে বেশি দ্রুত যেতে পারে না।*

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (পুনরাবৃত্তি নিজের জন্যই), ইংপৃ ৭৭, ফপৃ ১০৫–১০৬

এইখানে দেল্যুজ নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের দু'টি উদাহরণ দিয়েছেন। প্রথমটি হল স্টইকিজম বা বৈরাগ্যবাদ। খুব সংক্ষেপে, বৈরাগ্যবাদ বাইরের দুনিয়া প্রসূত কামনা বাসনার দুঃখ দুর্দশার বদলে তা যেমনভাবে নিজেকে মেলে ধরছে এখন এই মুহূর্তে, তাকে সেভাবেই মেনে নেওয়ার মধ্যেই সুখের সন্ধান আছে বলে মনে করে। আরেকটি হল ক্ষতচিহ্ন।

চিহ্ন নিয়েও সক্রিয় সংশ্লেষ এবং নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের পার্থক্য করা হয়েছে।

বর্তমানের চিহ্নগুলো প্রাকৃতিক, যে চিহ্নগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের ওপর, তা বর্তমানের মধ্যে এনে ফেলে যেখানে সে চিহ্নিতকরণ করে। বিপরীতে নকল চিহ্নগুলো হলো যা অতীতের মধ্যে বা ভবিষ্যতের মধ্যে নিয়ে যায় যেগুলি বর্তমানের স্বতন্ত্র মাত্রাসমূহ, যেগুলির ওপর বর্তমান হয়ত নির্ভর করবে। এই চিহ্নগুলো বোঝায় সক্রিয় সংশ্লেষ, অর্থাৎ স্বতস্ফূর্ত কল্পনা থেকে প্রতিফলিত প্রতিস্থাপনের সক্রিয় সক্ষমতায় যাওয়ার সরণী, স্মৃতির সরণী এবং বুদ্ধির সরণী।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (পুনরাবৃত্তি নিজের জন্যই), ইংপৃ ৭৭, ফপৃ ১০৬

এই নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের চিহ্নগুলোর বর্তমানের মধ্যে ফিরিয়ে আনা, এবং সক্রিয় সংশ্লেষের নকল চিহ্নগুলোর অতীতের মধ্যে বা ভবিষ্যতের মধ্যে ফিরিয়ে আনা (যেহেতু বর্তমান হয়ত নির্ভর করবে তার ওপর) চিহ্নর দিক দিয়ে দুই সংশ্লেষের ফারাক তৈরি করা। প্রতিস্থাপনের সক্রিয় সক্ষমতা, স্মৃতি, বুদ্ধির মতো সক্রিয় সংশ্লেষের অনুষঙ্গগুলির চেয়ে নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ, অর্থাৎ ভাবনা, কল্পনাকে আলাদা করা।

সক্রিয় সংশ্লেষ কীভাবে অতীতের মধ্যে ফিরিয়ে আনে, তার একটা উদাহরণ হল আম্বেদকরের ভীমা কোঁরেগাও এর মিথ তৈরিটা। ব্রিটিশ বিরোধী মারাঠা পেশোয়াদের লড়াই–কে তিনি বলেছিলেন, ওটা ছিল আসলে পেশোয়া বনাম দলিতদের লড়াই। ব্রিটিশরা সেখানে পেশোয়াদের পক্ষ নিয়েছিল। এইভাবে তিনি ভীমা কোরেগাঁওকে, যেটায় পেশোয়ারা হেরে গেছিল ইংরেজদের কাছে, সেটাকে পেশোয়াদের পরাজয় দলিতদের হাতে, এইভাবে সব্যস্ত করেছিলেন। এই মিথ–এর নির্মাণ, এটি নকল চিহ্ন। সক্রিয় সংশ্লেষ। যা আমাদের অতীতে নিয়ে গিয়ে ফেলল। কারণ ওই অতীত বর্তমানে কোনো একটা কাজে লাগবে। শুধু আম্বেদকর নয়, একইভাবে ইতিহাসের ঘটনাকে তুলে ধরার মধ্যেই এই অতীতে ফিরিয়ে আনার ব্যাপার আছে। ইতিহাসকে উদ্ধৃত করা সবসময়ই সক্রিয় সংশ্লেষ।

জীবন্ত বর্তমান, দাঁড়িয়ে থাকে অভ্যেসের ওপর।

খোদ প্রয়োজনকেই তাই খুব বেঠিকভাবে বোঝা হয় একটি নেতিবাচক কাঠামোর সাপেক্ষে, যে নেতিবাচক কাঠামো তাকে সক্রিয়তাটির সঙ্গে সম্পর্কিত করে। সক্রিয়তাটির করার মধ্যে বা ঘটার মধ্যে সক্রিয়তাটিকে আহ্বান করা পর্যাপ্ত নয়, যদি না আমরা সেই নিবিষ্ট ভূমিটা নির্ধারণ করি যার ওপর সক্রিয়তাটি দাঁড়িয়ে। আবার সেখানে, ওই ভূমির ওপর, আমরা বাধ্য হই ওই নেতিবাচকের মধ্যে উচ্চতর কোনো কিছুর ছায়া দেখতে (প্রয়োজনকে অভাব হিসেবে)। প্রয়োজন প্রকাশ করে একটি প্রশ্নের উন্মুক্ততাকে, একটি উত্তরের অভাব বা না-থাকাকে প্রকাশ করার আগে। ভাবা, মানে হলো প্রশ্ন করা। প্রশ্ন কি আসলে উত্তর 'ছেঁকে' আনা নয়? এই প্রশ্নটাই মেলে ধরে একইসাথে জেদ বা একগুঁয়েমি, এবং ক্ষীণতা, অবসাদ যা মিলে যায় প্রয়োজনে। 'কোন ফারাক সেখানে?' — এই প্রশ্নটাই ভাবুক আত্মা ছুঁড়ে দেয় পুনরাবৃত্তির দিকে, এবং একইসাথে পুনরাবৃত্তি থেকে উত্তর ছেঁকে আনে। ভাবনাগুলি হলো প্রশ্নরাজি, এবং সংকোচনগুলি যেগুলি ওই ভাবনাগুলির মধ্যে কাজ করে, এবং যেগুলি ওই ভাবনাগুলিকে পূরণ করে, সেগুলি বিবিধ সীমায়িত উত্থাপন, যেগুলি জন্মায় সেভাবে, যেভাবে বর্তমানগুলি জন্ম নেয় নিরবিচ্ছিন্ন বর্তমান থেকে, সময়ের নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের মাধ্যমে। নেতিবাচক-এর ধারনা আসে প্রয়োজনকে সক্রিয় সংশ্লেষের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে বুঝতে যাওয়ার তাড়াহুড়ো থেকে, যে সক্রিয় সংশ্লেষ বাস্তবতঃ কেবল এই ভিত্তিভূমির ওপরই নিজেকে মেলে ধরে। আরও আছে : যদি আমরা সক্রিয় সংশ্লেষকে পুনঃস্থাপিত করি ওই ভূমিটা-র ওপর যার ওপর সে পূর্বস্থাপিত, আমরা দেখি সক্রিয়তা সূচিত করছে বরং সমস্যাজনক ক্ষেত্রগুলির গঠনকে, প্রশ্নগুলির সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে। এই আচরনের পুরো ক্ষেত্রটা, নকল এবং প্রাকৃতিক চিহ্নগুলি জড়ামরি করে, প্রবৃত্তি এবং প্রশিক্ষণের হস্তক্ষেপে, স্মৃতি এবং বুদ্ধির হস্তক্ষেপে, দেখায় ভাবনার প্রশ্নমালা কীভাবে নিজেদের বিকশিত করে সক্রিয় সমস্যাজনক ক্ষেত্র রূপে। সময়ের প্রাথমিক সংশ্লেষে, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ এক প্রাথমিক প্রশ্ন-সমস্যা জটিলতা যা দেখা দেয় জীবন্ত বর্তমানের মধ্যে (জীবনের আবশ্যকতা)। এই জীবন্ত বর্তমান এবং তার সাথে, সমস্ত জৈবিক ও মনোজাগতিক জীবন দাঁড়িয়ে থাকে অভ্যাসের ওপর।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (পুনরাবৃত্তি নিজের জন্যই), ইংপৃ ৭৮, ফপৃ ১০৬-১০৭

নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের দুনিয়া : হাজার হাজার আমির ব্যবস্থা, শূককীট বিষয়ী

এই হাজার হাজার অভ্যেস দিয়ে আমরা তৈরি — এই সংকোচনমালা, এই ভাবনারাজি, এই আশঙ্কাগুলি, এই পূর্বানুমানগুলি, এই সন্তুষ্টিগুলি, এই অবসাদগুলি, এই চলন্ত বর্তমানগুলি — এগুলিই তৈরি করে নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের ভিত্তিভূমিটা। নিষ্ক্রিয় আমিকে খুব সরলভাবে ধারনক্ষমতা দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, অর্থাৎ, সংবেদনগুলির অভিজ্ঞতার ক্ষমতা দিয়ে যায় না, বরং সংকুচিত ভাবনা দিয়ে যায়, যা গঠন করে জীবটিকেই, সংবেদনগুলি গঠন করার পূর্বে। এবং সেই আমি আবার মোটেই সরলতার চরিত্র নয় : এই আমি-কে সাপেক্ষকরণ করা, বহুকরণ করা যথেষ্ট নয়, একইসাথে এর সমস্তটাকেই প্রতিবার ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া একটা আকার বজায় রেখে। আমিগুলি শূককীট বিষয়ী (larval subjects); *নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের দুনিয়া তৈরি করে আমি-র ব্যবস্থাটাকে, নির্ধারিত হতে চলা শর্তাবলীর মধ্যে, কিন্তু এটা দ্রবীভূত আমি-র ব্যবস্থা। এক আমি আছে সেখানে সেখানে, যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক চোরা ভাবনা, যেখানেই কাজ করে এক সংকোচনের যন্ত্র যা পুনরাবৃত্তির মধ্যে থেকে এক ফারাককে ছেনে বের করতে সক্ষম। এই আমি অদলবদলের নয়, এই আমি নিজেই অদলবদল, এই শব্দটা যা ঠিকঠাক অভিহিত করে ছেনে আনা ফারাককে। শেষতঃ আমরা কেবল তা-ই যা আমাদের আছে, কেবল ওই থাকা দিয়েই এখানে রওয়া-টা তৈরি, এভাবে নিষ্ক্রিয় আমি রয়। সমস্ত সংকোচনটাই একটা পূর্বঅনুমান, একটা আশঙ্কা, অর্থাৎ, যা তৈরি করে একটা প্রত্যাশা অথবা একটা অধিকার যার ওপর দাঁড়িয়ে সে সংকোচন করে, এবং তা বিলীন হয়ে যায় তার লক্ষ্যটি পালিয়ে গেলেই। স্যামুয়েল বেকেট তার সমস্ত উপন্যাসে এই বৈশিষ্ট্যগুলির ঝাঁপিগুলির বর্ণনা দিয়েছিলেন, যার মধ্যে থেকে শূককীট বিষয়ী-রা মেলে ধরছে নিজেদের, অবসাদ এবং আবেগের সাথে : মলয়ের নুড়িপাথরগুলি, মার্ফির বিস্কুটগুলি, মালনের সম্পত্তিগুলি — সেগুলো সর্বদা নির্দেশ করে একটি ক্ষুদ্র ফারাককে ছেনে আনা, দুর্বল সাধারণীকরণ, উপাদানগুলোর পুনরাবৃত্তি থেকে অথবা কেসগুলোর সংগঠনের থেকে। সংশয় নেই যে 'নতুন উপন্যাস'-এ অনেকগুলি উদ্দেশ্যর মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি, তা হলো পুনর্যোজন, সক্রিয় সংশ্লেষের নিচে, নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের ক্ষেত্রটিকে যা আমাদের গঠন করে; সেগুলো হলো অদলবদল, অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকলাপ, এবং ক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্যগুলি। এবং গঠনকারী সমস্ত অবসাদগুলির মধ্যে, সমস্ত মাঝারিমানের স্ব-সন্তুষ্টিগুলির মধ্যে, উপহাসযোগ্য পূর্বঅনুমানগুলোর মধ্যে, তার দুর্দশা ও দারিদ্র্যের মধ্যে, দ্রবীভূত আমি-টা ফের গেয়ে ওঠে ভগবানের মহিমা, অর্থাৎ যা সে ভাবে, সংকোচন করে এবং*

ভোগদখল করে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (পুনরাবৃত্তি নিজের জন্যই), ইংপৃ ৭৭–৭৮, ফপৃ ১০৭

ভাবনা বা অভ্যেস যেমন সময়ের নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ, তেমনি সময়ের সক্রিয় সংশ্লেষ হল স্মৃতি। নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ সবসময় বর্তমানকে তৈরি করে, কিন্তু বর্তমান তো সবসময় পেরিয়ে যাচ্ছে, এমনকি বর্তমানকে যখন তৈরি করা হচ্ছে তখনও। তাই জন্য প্রয়োজন সময়ের আরেকটি সংশ্লেষ। নিষ্ক্রিয় সময় সংশ্লেষ যদি ভিত্তি হয়, তাহলে সক্রিয় সময় সংশ্লেষ হল ভূমিটা। সক্রিয় সংশ্লেষে সময়ের মধ্যে বর্তমান বর্তমান এবং একটি অতীত বর্তমানের প্রতিরূপের মিলন হয়।

প্রাথমিক দৃষ্টিতে যেন মনে হয়, অতীত দুইটি বর্তমানের মধ্যে পড়ে গেছে। একটা বর্তমান হল সেটা যেখানে সে (অতীত) নিজে ছিল, এবং আরেকটা বর্তমান হল, যার সাপেক্ষে সে অতীত। অতীত মানে কিন্তু আগের বর্তমান নয়, বরং আগের বর্তমান মানে হল অতীতের সেই অংশটুকু, যেখানে আমরা দৃষ্টিনিবদ্ধ করছি। অর্থাৎ, অন্যভাবে বললে, ভাষায় প্রকাশ করলে আগের বর্তমান হল, যা 'হয়েছিল' (has been), আর অতীত হল যা সাধারণ, যা 'ছিল' (was) । সাধারণ অতীতের মধ্যে আগের বর্তমানগুলিকে দেখা হয় বিশেষভাবে এবং বিশেষ রূপে।

সময়ের নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ এবং সক্রিয় সংশ্লেষের পার্থক্যর মধ্যে আছে, ধারন এবং পুনরুৎপাদন। অভ্যেসের মধ্যে কিছু সময়কালের মুহুর্তগুলো সংকুচিত হয়ে বর্তমান বর্তমানের মধ্যে ধারিত হয়। আর বর্তমান বর্তমান প্রত্যাশার মতো উন্মুক্ত হয় ভবিষ্যতের দিকে। কিন্তু সক্রিয় সংশ্লেষের মধ্যে কী হয়? সক্রিয় সংশ্লেষ পুনরুৎপাদনের। সেখানে আগের বর্তমান এবং বর্তমান বর্তমানের প্রতিরূপ তৈরি হয়। আগের বর্তমান উপস্থাপিত হয় বর্তমান বর্তমানের প্রতিরূপের মধ্যে। বর্তমান বর্তমানের প্রতিরূপের সাথে মিল বা সাদৃশ্যই হল আগের বর্তমান অর্থাৎ যার প্রতিরূপ তৈরি হবে, তার সীমা। বর্তমান বর্তমান তার মধ্যে একটা অতিরিক্ত মাত্রা তৈরি করে নেয় যার মধ্যে অতীত বর্তমানের উপস্থাপন এবং বর্তমান বর্তমানের উপস্থাপন থাকে। তখন বর্তমান বর্তমানকে আর স্মৃতির সাপেক্ষে ভবিষ্যৎ বলে মনে হয় না, তা হয়ে যায় আগের বর্তমানের প্রতিরূপের সঙ্গে সংযুক্ত বর্তমান বর্তমানের প্রতিফলন। অর্থাৎ সময়ের সক্রিয় সংশ্লেষ বা স্মৃতি হল পুনরুৎপাদন এবং প্রতিফলন।

ফলতঃ স্মৃতির সক্রিয় সংশ্লেষকে ভাবা যেতে পারে উপস্থাপনার নীতি হিসেবে এই দুই দিক দিয়ে : আগের বর্তমানের পুনরুৎপাদন এবং বর্তমান বর্তমানের প্রতিফলন। স্মৃতির এই সক্রিয় সংশ্লেষ অভ্যেসের নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের

ওপর স্থাপিত, যেহেতু নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ যেকোনো বর্তমানের সাধারণ সম্ভবনাকে গঠন করে।

অর্থাৎ অভ্যেস যদি হয় সময়ের সংকোচন, একটি বর্তমানের সাপেক্ষে, তাহলে স্মৃতির সক্রিয় সংশ্লেষ হল বর্তমানগুলিকেই জুড়ে দেওয়া। কিন্তু কার সাপেক্ষে জুড়ে দেওয়া? একটি শুদ্ধ অতীত সাপেক্ষে। একটি শুদ্ধ অতীত সাপেক্ষে আগের বর্তমানের পুনরুৎপাদন এবং বর্তমান বর্তমানের প্রতিফলন সম্ভব।

এই দিক দিয়ে স্মৃতির সক্রিয় সংশ্লেষ দাঁড়িয়ে আছে (জাগতিক) নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের ভিত্তিভূমির ওপর, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে সেটিকে ভূমায়িত করতে গেলে তা করা যেতে পারে কেবল (স্মৃতির) অন্য একটি (তুরীয়) নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষের ওপর যা স্মৃতির কাছেই আশ্চর্যজনক। অভ্যেসের নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ তৈরি করে সময়ের জীবন্ত বর্তমান, — ভবিষ্যত এবং অতীত যার দুটি অসমান উপাদান। স্মৃতির নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ গঠন করে সময়ের শুদ্ধ অতীত। আগের বর্তমান এবং বর্তমান বর্তমান (অর্থাৎ পুনরুৎপাদনের বর্তমান এবং প্রতিফলনের ভবিষ্যৎ) যার দুটি অসমান উপাদান।

এই তুরীয় স্মৃতির সংশ্লেষ নিয়ে বিস্তারিত কিছুর জন্য বার্গসনের 'পদার্থ ও স্মৃতি' বইটির তিন নম্বর চ্যাপ্টারকে রেফার করেন দেল্যুজ। দেল্যুজের নিজের ভাষায় বার্গসনের তুরীয় অতীত বা শুদ্ধ অতীত, যা কি না তিনটি কূটাভাষ দিয়ে তৈরি, তা হল এইরকম —

কোনো বর্তমানই কখনো চলে যায় না যদি না তা যখন বর্তমান 'ঠিক সেই মুহুর্তেই' তা অতীত হয়; কোনো অতীতই তৈরি হয় না কখনও যদি না তা প্রথম তৈরি হয় 'ঠিক সেই মুহুর্তে' যখন তা বর্তমান। এই হল প্রথম কূটাভাষ : অতীতের সঙ্গে যে বর্তমানে তা অতীত ছিল তার সমসাময়িকতা। একটা দ্বিতীয় কূটাভাষও বেরিয়ে আসে : সহাবস্থানের কূটাভাষা। যদি প্রতিটি অতীত তা যখন বর্তমান ছিল তার সঙ্গে সমসাময়িক হয়, তাহলে সবগুলি অতীত নতুন বর্তমানের সঙ্গে সহাবস্থান করে, যে নতুন বর্তমানের সাপেক্ষে তা এখন অতীত। অতীত প্রথম বর্তমানের 'পরে' যতটা, তার চেয়ে আর একটুও বেশি এই দ্বিতীয় বর্তমানের 'মধ্যে' নয় — এইখান থেকেই বার্গসোনিয়ান আইডিয়াটা, যে, প্রতিটি বর্তমান বর্তমান হল সমগ্র অতীত, তার সর্বাপেক্ষা সংকুচিত অবস্থায়। অতীত একটা বর্তমানকে চলে যেতে বলে না আরেকটিকে আবাহন না করে, কিন্তু সে নিজে চলেও যায় না

শুরুও করে না। এই কারণে অতীত সময়ের একটি মাত্রা নয়, সে সমস্ত সময়ের সংশ্লেষ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যে সময়ের দুটি মাত্রা মাত্র। আমরা বলতে পারি না যে অতীত ছিল। তা আর অস্তিত্বশীল নয়, তার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু তা অনড়, তা নিহিত, তা আছে। তা আগের বর্তমানের সঙ্গে অনড়, তা এই নতুন বা বর্তমান বর্তমানের সঙ্গে নিহিত। তা হল সময় নিজেই যা সময়ের সরণীর শেষ ভূমি-টা। এই দিক দিয়ে তা তৈরি করে সমস্ত সময়ের একটি শুদ্ধ, সাধারণ, স্বতলব্ধ উপাদান। ফলতঃ আমরা যখন বলি, তা সেই বর্তমানের সমসাময়িক যখন তা ছিল, আমরা আবশ্যিকভাবে একটা অতীতের কথা বলি, যা কখনোই বর্তমান ছিল না, যেহেতু তা 'পরে' তৈরি হয়নি। তা–র বর্তমান হিসেবে নিজের সাথে সমসাময়িক হবার কায়দাটা, তা হল যেন বা এ তো ছিল–ই, যে বর্তমান চলে যাচ্ছে তার পূর্বধারনা হিসেবে এবং যা সেই বর্তমানকে সরিয়ে দিচ্ছে। তা–র নয়া বর্তমানের সাথে সহাবস্থানের কায়দাটা, যেন বা তা নিজেই, নিজেকে নিজের মধ্যেই সংরক্ষণ এবং নতুন বর্তমানের দ্বারা পূর্বধারিত, যে নতুন বর্তমান শুরু হয় কেবল এই অতীতের সংকোচনের মাধ্যমে। প্রাক–অবস্থানের এই কূটাভাষ তাই অন্য দুই কুটাভাষকে সম্পূর্ণ করে : প্রতিটি অতীত তার বর্তমানের সঙ্গে সমসাময়িক, সমগ্র অতীত সহাবস্থান করে বর্তমানটির সঙ্গে যার সাপেক্ষে সে অতীত, কিন্তু অতীতের শুদ্ধ উপাদান সাধারণভাবে চলতি বর্তমানের প্রাক–অবস্থান।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (পুনরাবৃত্তি নিজের জন্যই), ইংপৃ ৮২, ফপৃ ১১১

অতীত, যা কখনোই বর্তমান ছিল না — সেটাই বিশুদ্ধ অতীত বা তুরীয় অতীত।

দেখা গেল, তিনটি সময় সংশ্লেষের কথা বলেছেন দেল্যুজ। দুটি নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ। একটি অভ্যেসের। সেটি প্রাথমিক সংশ্লেষ এবং সেটি গড়ে তোলে বর্তমানকে। যার সাপেক্ষে অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুটি মাত্রা। বর্তমানের। এই সময় সংশ্লেষ হল জাগতিক নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ। আরেকটি সময় সংশ্লেষ হল স্মৃতির নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ। সেটি তুরীয় স্মৃতির সংশ্লেষ। তাই এটি তুরীয় সময় সংশ্লেষ। এটি তৈরি করে বিশুদ্ধ অতীত। আর তৃতীয় সংশ্লেষটি হল সক্রিয় সংশ্লেষ। স্মৃতির সক্রিয় সংশ্লেষ। যা গঠন করে ভবিষ্যৎ, যা বর্তমান বর্তমানের একটি মাত্রা। মনে রাখা দরকার, এই তিনটি সময়, তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, এইভাবেই উপস্থাপিত করেছিলেন দেল্যুজ।

কিন্তু এইভাবে সময়কে দেখা কি মনোজাগতিক নয়? এই সময় কি মনোজাগতিক নয়? সময় কি আসলেই মনোজাগতিক, নাকি তার কোনো

বাস্তব উপস্থিতি আছে? এইখানে আমরা বার্গসন এবং আইনস্টাইনের তর্কের প্রাসঙ্গিকতা, যার কথা আগেই বলা হয়েছে। এই প্রশ্ন নিয়ে পরে কখনো চর্চা করা যাবে।

ভাবনার ব্যাপারটা থেকে আমরা কিন্তু চলে এসেছি চিন্তা-তেও।

এখানে সচেতনতার এবং অচেতনার ভূমিকা কী? কেমন যেন মনে হচ্ছে না, এখানে নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষ মানে অচেতনার স্তরের ব্যাপারকে বোঝানো হচ্ছে? এবং সক্রিয় সংশ্লেষ বলতে সচেতন স্তরের ব্যাপারকে বোঝানো হচ্ছে?

এইখানে আমরা আরেক বার্গসন বিশেষজ্ঞ, দেল্যুজের সমসাময়িক এবং দেল্যুজের ওপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তারকারী দার্শনিক সিমন্দঁ-র 'ব্যক্তিকরণ' বইটির 'জীবন্ত অস্তিত্বের ব্যক্তিকরণ' পরিচ্ছদের 'মনোজাগতিক অস্তিত্বজননের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক অধ্যায় থেকে কিছু জিনিস তুলে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করব।

স্বাভাবিকভাবেই, দেল্যুজের সংশ্লেষ ধরে লেখা নয়। অন্যভাবে লেখা, কিন্তু একই জিনিস নিয়ে।

এইভাবে ব্যক্তিকৃত অস্তিত্বের বাস্তবতাকে দেখলে, এটা বলা সম্ভব যে সচেতনতার সাপেক্ষে দেহ অভিনয় করে একটি দ্বৈত ভূমিকায়। কল্পী সচেতনতার সাপেক্ষে দেহ হল পরিপার্শ্ব, এবং ব্যক্তিকৃত বাস্তবতা নয়। সে হল প্রপঞ্চ বা মায়া বাস্তব (virtual real) *। অর্থাৎ বাস্তবতার একটি সূত্র যা সামর্থ্য যোগায় প্রতীকি হওয়া-কে, বর্তমানের সাপেক্ষে : এই বাস্তবতা নিজেকে দ্বিগুণায়িত করে বর্তমানে এবং আগামীতে, যেমন ব্যক্তিতে এবং পরিপার্শ্বে। বিপরীতে, দেহ দ্বিতীয়বার আসে যাকে সৃষ্টি করে স্মৃতি, ব্যক্তিকৃত অস্তিত্ব রূপে, ব্যক্তিকরণের পরিপার্শ্বের এক সচেতনতার সাপেক্ষে : স্মৃতির সচেতনতা হল সর্বদা যাকে সে স্মরণ করে তার নিচে থাকে, এবং কল্পী সচেতনতা হল যাকে সে কল্পনা করে তার নিচে থাকা। তা হল অতীত, অর্থাৎ দেহ, যা উঠে দাঁড়ায় এবং বেছে নেয় বর্তমানকে স্মৃতির সচেতনতার মধ্যে থেকে, যখন বর্তমান বেছে নেয় আগামী-কে, কল্পী সচেতনতার মধ্যে। স্মৃতির মধ্যে দেহ বিলীন হয়ে যায়, কল্পনার মধ্যে সচেতনতা বিলীন হয়ে যায়।*

সচেতনতা দেহের সঙ্গে আটকে রাখে নিজেকে স্মৃতি দিয়ে এবং কল্পনা দিয়ে যতটা কার্যকলাপ দিয়ে হয় ও যাকে সাধারণভাবে ভাবা হয় মনোশারীরিক।

....

আত্মা হল অস্তিত্বের বর্তমান। দেহ হল তার ভবিষ্যত এবং অতীত।

...

সচেতনতা হল দৈহিক দুই হওয়া–র মধ্যে মধ্যস্থতা, বর্তমানের দিকে আসা গতি, এবং বর্তমান ছেড়ে যাওয়া গতি। আমরা বলতে পারি যে এই যাওয়ার গতি, যা ধাপে ধাপে এগোয়, হল আড়প্রসারী। বাস্তব আড়প্রসারণের সত্যিকারের স্কিম হল সময়, একটি অবস্থা থেকে আরেকটি অবস্থায় যা স্বাভাবিক তার ধারাবাহিকতাতেই এবং তার জন্য কোনো বাইরের পারম্পর্য লাগে না : এইভাবে ভাবলে সময়ই অস্তিত্বের গতি, বাস্তব রূপান্তর, বাস্তবতা যা নিজেই বদলাতে পারে এবং নিজেও বদলায়, একইসাথে যা সে ছাড়ে এবং যা সে ধরে, বাস্তব যেমন দুটি অবস্থার পরিপার্শ্বের মধ্যে সম্পর্ক। গতিপথের অস্তিত্ব, চলন্ত বাস্তবতা, বাস্তবতা যেন চলে যাচ্ছে, সেটাই হল আড়সারী বাস্তবতা।

....

বর্তমান হল আগামীর ক্ষেত্রের মধ্যে আড়প্রসারণ এবং অতীতের অন্ত–র্জালিকার বিন্দুসমূহ। বর্তমান জুড়ে এবং বর্তমানের দ্বারা আগামীর ক্ষেত্র নিজেকে বোনে।

অর্থাৎ সচেতনতাকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে এখানে। কল্পনা এবং স্মৃতি। সচেতনতাকে বলা হয়েছে বর্তমানের তথা সময়ের অন্তঃসলিলা, যা ভবিষ্যৎকে গঠন করে অতীতের ওপর দাঁড়িয়ে। দেল্যুজ যেখানে সময়কে একটা নিজস্বতা দিয়ে দিয়েছেন এবং সময়ের গঠনের কথার মধ্যে বিষয়ীকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন, যেন সময় নিজেই একটা বিষয়ীত্ব পেয়ে যাচ্ছে মানুষের মনোজগতের মধ্যে দিয়ে (নিষ্ক্রিয় বিষয়ী), এবং সেখানে সক্রিয় সংশ্লেষ হল সেটা যার মধ্যে মানুষের বিষয়ীত্ব ফিরে আসছে, সে অতীত ছেনে এবং বর্তমানকে তার সাথে জুড়ে একটা ভবিষ্যৎ রচনা করছে। সিমন্দঁ সেখানে অতীত ছেনে নেওয়াকে গুরুত্ব দেননি, আবার সময়ের নিজস্বতাও তৈরি করেননি। তিনি বর্তমানের মধ্যে অন্তর্লীন দেখেছেন সচেতনতাকে। তার কাছে স্মৃতি এবং কল্পনা দুটোই জাগতিক। সচেতনতার দুই অংশ। তাই সচেতনতাও জাগতিক। কিন্তু অন্তর্লীন। অতীত ছেনে নেওয়ার জন্য এবং বর্তমানকে জুড়ে নেওয়ার জন্য দেল্যুজের সক্রিয় সংশ্লেষ তথা সচেতনতা উপস্থাপনার সহায়। উপস্থাপনা ছাড়া ভবিষ্যৎকে গঠন করতে পারেনি দেল্যুজের সময়। সচেতনতা সেখানে উপস্থাপনের অঙ্গ। কিন্তু সিমন্দঁ–র সময় ভবিষ্যৎকে গঠন করবেই। অন্তর্লীন সচেতনতাকে ভর করে সে আড়প্রসারী। অতীতের বিন্দুগুলি থেকে ভবিষ্যতের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে প্রসারণ। সিমন্দঁকে বলা হয়, 'ভবিষ্যতের দর্শন'

লিখেছেন (জিওভান্নি কারোজিন্নি)। অর্থাৎ, কীভাবে হওয়া হবে, সেটা। সেক্ষেত্রে সিমন্দঁর ব্যক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সিমন্দঁ–র ব্যক্তি হল সেই পরিবাহী, যা অতীতের বিন্দু থেকে ভবিষ্যতের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে যায়, তার নিজস্বতাকে ভর করে। সেই নিজস্বতার মধ্যেই আছে সচেতনতা।

আমার মনে হয় এই দুই সচেতনতার মধ্যে দেল্যুজেরটি সচেতন সচেতনতা। অর্থাৎ দ্বিত সচেতনতা। তা অনেকটা সাংস্কৃতিক। যেন সিনেমা বা নাটক বা গল্প বা কবিতা বা উপন্যাস বা প্রবন্ধ। দেল্যুজের সচেতনতা সবসময় বাইরে থেকে দেওয়ার জিনিস। আইডিয়ার অবতারনা এই কারণেই। (এখানে জেমস উইলিয়ামস–এর ট্র্যান্সেন্ডেন্টাল ডগম্যাটিজম, তৃতীয় সময় সংশ্লেষ অধ্যায় দ্রষ্টব্য, অন্যভাবে লেখা আছে)। বিপরীতে সিমন্দঁ–র সচেতনতা সাময়িক। তার কর্তা নেই। তা সচেতন সচেতনতা নয়। এই পৃথিবীতে প্রতিটি ব্যক্তি আলাদা। তার স্মৃতি সত্ত্বা ভবিষ্যৎ বাকি সব্বার থেকে আলাদা। ব্যক্তির বিশেষত্ব বা ফারাকের কারণেই তা সচেতনতা। আলাদা করে সচেতন নয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য একটা ব্যাপার হলো, সিমন্দঁ খুব পঁসে বা চিন্তা কথাটা ব্যবহার করতেন। এমনকি ফিলজফি এবং মেটাফিজিক্স কথাটা যতটা ব্যবহার করেছেন, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি ব্যবহার করেছেন।

টিপ্পনি : সচেতনতার বিপদ

শস, ১০।১২।২০১৫

১

বাচ্চারা অতকিছু ভাবে না। তাদের করা খুব একটা ভাবা দিয়ে নয়। ভাবলেও বেশি ভাবে না। মূলত যা দেখে শোনে, তাই করে। যেমন বড়োদের বই পড়তে দেখে নিজেও বই পড়বে, কিন্তু উলটো করে পড়বে, কারণ সে সবসময় তাই দেখে। কিন্তু বড়ো হওয়ার সাথে সাথেই আমরা যদি স্কুল বা বাড়িতে না–ও শিখি, তবু ঠেকে শিখে যাই, ভাবিয়া করিও কাজ। যে ভেবে কাজ করে, সে সচেতন লোক।

সচেতনতার আবার অনেক রকমফের আছে। নিজের সমাজের সচেতনতা — যেমন শ্রেণী/ সম্প্রদায়/ ধর্ম/ জাত/ দেশ/ ভাষা/ লিঙ্গ/ বয়স/ পেশা ইত্যাদি। কেউ বলবে, নিজের সমাজের সচেতনতা আবার কি, ও তো

এমনি এমনিই তৈরি হয়ে যায়। সেখানে আবার বেশি ভাবার কী আছে? অত সোজা নয়। চেয়ে দেখো, বেশিরভাগ হিন্দু (বা মুসলিম ইত্যাদি) মাতব্বরদের একটাই হতাশা — সেই ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের ধর্মের কথা ভাবে না, নিজেদের ধর্মের লোকেদের কথা ভাবে না (এবং অন্য ধর্মের লোকেরা ভাবে!)। অর্থাৎ ধর্ম–সচেতনতা নেই। অতএব, স্বধর্মের লোকেদের স্বধর্ম–সচেতন করে তুলতে হবে। শ্রমিক নেতারাও একই অভিযোগ জানায় শ্রমিকদের ব্যাপারে। শ্রেণী–সচেতন করে তুলতে হবে। বাঙালীদের বাঙালি–চেতনা নেই (তাই একটা সংগঠনেরই নাম 'ভাষা ও চেতনা সমিতি'!), মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বিরুদ্ধে ইত্যাদি ইত্যাদি নানা অভিযোগ সব সময় শোনা যায় — আর সেই অভিযোগ প্রতিটি সমাজের সমাজ–সচেতন ব্যক্তিদের মুখেই শুধু শোনা যায় না, যারা কিনা সমাজ–অসচেতন তারাও আড্ডা মারতে মারতে বলে ফেলে কখনো সখনো এই সব কথা।

আবার স্ব–সমাজ সচেতনতাই শুধু নয়। স্ব–সমাজ সচেতনতাকে ছাপিয়ে এক ধরনের সচেতনতার কথাও শোনা যায়। অর্থাৎ যে নিজের সমাজের চেতনার কথা মাথায় রেখেছে তো বটেই, কিন্তু তা বাদ দিয়ে 'অন্য' সমাজগুলোর চিন্তাও মাথার মধ্যে রেখেছে। যেমন ধরা যাক সমাজ–সচেতন মেয়ে, মানে নারী–চেতনা যুক্ত নারী, তাকে পুরুষদের কথাও ভাবতে হবে; স্বদেশ–সচেতন দেশবাসী, তাকে বিদেশীদের কথাও ভাবতে হবে। খানিকটা কঠিন করে বললে, আত্মোপলব্ধির মধ্যে দিয়ে অপরকেও উপলব্ধি করা।

এখানেই শেষ নয়। সচেতনতার আরো রকমফের রয়েছে। এর পর আসছে পরিবর্তন/রূপান্তরকামী সচেতনতা। যেমন বামপন্থীদের কোনো কোনো মহলে একটা কথা আছে, 'শ্রমিকশ্রেণী হয় বিপ্লবী, নয় কিছুই নয়' (এটা আবার কখনো কখনো এরকম হয়ে দাঁড়ায় — শ্রমিক হয় বিপ্লবী নয় কিছুই নয়)। বাঙালীকে বাঙালি–সচেতন হলেই হবে না, বাঙালীত্বের প্রতিষ্ঠা/পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এক ধরনের সচেতনতা থাকতে হবে।

এছাড়াও আছে — মন্ত্রী সচেতনতা, আমলা সচেতনতা, ধর্মগুরু সচেতনতা ইত্যাদি। অর্থাৎ আপনি কেউকেটা হয়ে গেলে বিশেষ এক ধরনের সচেতনতার প্রয়োজন হয়, তা নাহলেই আপনার ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আজকাল আবার আর একটা কথা আসছে — মিডিয়া সচেতনতা। তোমার মুখে মাইক লাগিয়ে জিজ্ঞেস করল মিডিয়ার লোক — আপনি কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা–মাটির সরকার সাইকেল দেওয়ার যে পরিবেশ বান্ধব, জনহিতকর প্রকল্প হাতে নিয়েছে তা কি সমর্থন করেন? তুমি না বললে তোমাকে সরকারবিরোধী/ জনতাবিরোধী/ মমতাবিরোধী/ সাইকেলবিরোধী/ পরিবেশবিরোধী শোনাবে। তুমি হ্যাঁ বললে তুমি তৃণমূলের লোক। তাই খুব

ভেবে–চিন্তে কথা বলতে হবে। দশটা ভেবে, পাঁচটা বলব বলে ভেবে শেষে দেড়খানা বলতে হবে। শব্দই ব্রহ্ম। এটাও সচেতনতা।

এছাড়াও আছে — সচেতনতা সম্পর্কে সচেতনতা, মানে মেটা–সচেতনতা। তাতে অবশ্য এমনি কোনো সচেতনতা না থাকলেও চলে। সচেতনতা আছে কি না সেই সম্পর্কে সচেতনতা থাকলেই হয়। এটা শিক্ষকতার সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের ক্ষেত্রে খুব প্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ সচেতনতার যেমন প্রকারভেদ বা ভ্যারাইটি আছে, তেমনি তার স্তরভেদ বা হায়ারার্কি–ও আছে।

তাই তুমি যাই কিছু করতে যাও — সচেতনতার থেকে মুক্তি নেই। কিছু না করলে যারা করছে তারা তোমাকে অসচেতন বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে। ওটুকু গায়ে না মাখলে কিছুই না। কিন্তু কিছু না করেও যে থাকা যায় না। তাতেও বিপদ আছে। এক নম্বর বিপদ, তুমি তো আর বাচ্চা নও যে লোকে তোমাকে উলটো করে ধরে বই পড়লেও আদিখ্যেতা করবে। বরং তোমাকে চারটে গাল দেবে, বলবে ভান করছ। আর দুই নম্বর বিপদ, তুমি হয়ত কারোর দেখাদেখি সত্যিই উলটো করে বই ধরে পড়তে শুরু করেছ, কী জ্বালা!

২

এসব শুনে মনে আসবেই একটা কথা — কীভাবে সচেতন হওয়া যায়? সচেতন হওয়ার অনেক পদ্ধতি আছে, কী ধরনের সচেতনতা, তার ওপর নির্ভর করবে। কিন্তু সেগুলোর কি কোনও কমন ব্যাপার নেই? তাও আছে। যেমন সচেতন হওয়ার একটা বড়ো হাতিয়ার হলো স্মৃতি। স্মৃতি মানে, অতীতের যা কিছু তুমি অতীত হিসেবে মনে রেখেছো। ভুলে গেলে চলবে না। যেমন, দেশভাগের সময় পাক–রাজাকার বাহিনী কত লক্ষ লোককে মেরেছিল বাংলাদেশে, তোমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কী করেছিল, ভুলে গেলে চলবে না। তাহলে তুমি বাঙালি–সচেতনতা থেকে চ্যুত হবে। ইত্যাদি। স্মৃতি ইতিহাসের খুব কাছাকাছি। ইতিহাস কি স্মৃতির সংগঠিত রূপ? একটা বিশেষ ধরনের স্মৃতি? যা সচেতনতার কিছু প্রকারকেই পুষ্ট করে? ইতিহাসের চেয়েও মৌলিক তাই স্মৃতি।

সচেতনতার আরেকটি হাতিয়ার হলো শিখে নেওয়া। তোমাকে শিখে নিতে হবে। ক্লাসে মিস বীজগণিত শেখাবে, তোমাকে শিখে নিতে হবে। এখন, বিশেষ করে আমেরিকায়, সব কিছু শিখে নেওয়ার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত হয়েছে। কীভাবে প্রেম করতে হবে, কীভাবে শান্তভাবে কথা বলতে হবে — সব কিছুর কোর্স আছে। ওয়ার্কশপ আছে। ওখানে বাচ্চা হওয়ার আগে বাপ–

মায়ের বাধ্যতামূলক শিশুপালনের ট্রেনিং হয়। ইদানিং আমাদের এখানেও প্রথাগত শিক্ষার বাইরেও বেশকিছু ওয়ার্কশপ চালু হয়েছে।

সচেতনতার আরেকটি হাতিয়ার জ্ঞান। এটা বেশ জটিল। তবে কী, কেন, কীভাবে, কোথায় — এইসব প্রশ্ন করতে করতে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, ওই যাকে বলে 'বোধোদয়' হয়। জ্ঞানের বহর যত বাড়ে, তত তা বিভিন্ন ধরনের সচেতনতার পাকা ভিত তৈরি করে। এমনকি যদি দিবাশেষে বলতেও হয়, জ্ঞানের সমুদ্রের ধারে আমি তো সারাজীবন উপলখণ্ডই কুড়িয়ে গেলাম, সমুদ্রে আর নামা হলো না — সেটাও তো এক সচেতনতা।

আরো অনেক আছে। যে তিনটের কথা বললাম (বা যেগুলোর কথা বলা হলো না) — সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে একধরনের সক্রিয়তার গন্ধ। ভুলে যাওয়া চলবে না, শিখে নিতে হবে, জ্ঞানলাভ করতে হবে। অর্থাৎ একটু নড়তে চড়তে হবে। তা নাহলে গেলে।

৩

কিন্তু ওই নড়াচড়ার বাইরে কি কিছু নেই? নিশ্চয়ই আছে। নিতে হবে করতে হবের বাইরে আছে অনেক কিছু। যেমন, আমাদের মনে পড়ে যাওয়া, মনের মধ্যে ভিড় করে আসা, কোনো একটা কথা, একটা ঘটনা — যা একেবারেই স্মৃতি নয় (ইতিহাস তো নয়ই)। যা অতীত নয়। বর্তমান। ঘটমান বর্তমান নয়। বর্তমানের থেকে আলাদা অতীতও নয়। অতীত বর্তমান। বর্তমানের মধ্যেই যে অতীতের অবস্থান।

যেমন, না শিখেই যা আয়ত্ব হয়ে গেছে। বাচ্চাদের হামাগুড়ি দিতে শেখা, দাঁড়াতে শেখার মতো। একেবারেই বীজগণিত নয়। বরং জাপানে গিয়ে ঠেকায় পড়ে জাপানি শিখে যাওয়ার মতো।

যেমন, অভ্যেস। ট্রেন লাইন পেরোতে গিয়ে প্রথমে ডানদিকে তাকানো তারপর বাঁদিকে — ট্রেন না দেখা গেলে পেরিয়ে যাওয়া — অভ্যেস। ট্রেন লাইনের ধারের বস্তিগুলির ছেলে মেয়ে বাচ্চা কাচ্চা বুড়ো বুড়ির বাস –– অভ্যেস। নদীর ধারে বাস ভাবনা বারো মাস। তবু নদীর ধারে বাস। অভ্যাস।

মনে পড়ে যাওয়া, শিখে যাওয়া, অভ্যাস — এই সবের মধ্যেই কোনো নড়াচড়ার ব্যাপার নেই, কিন্তু ওগুলোও করাকে নির্ধারণ করে।

৪

কিন্তু এখানে গোলমালটা অন্য জায়গায়। কমবেশি সচেতন মানুষের কাজেও এইসব ফ্যাক্টর খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই কমবেশি সচেতন মানুষ

স্বাভাবিক কারণেই বোঝেও না সে যে কাজটা করছে, তাতে তার সচেতনটার ভূমিকা কতটা আর ওই ফ্যাক্টরগুলোর ভূমিকা কতটা। বরং সে সচেতনতাকেই বড়ো করে দেখে। সে ভাবে সচেতনতার দৌলতেই সে এসব করছে।

রাভৌর মেয়ের জন্মদিনের স্যুভেনিরে, ঈষৎ পরিবর্তিত।

টিপ্পনি : মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা

শস, ২১/২/২০১৯

সন্তানকে বাংলা মাধ্যমে পড়ান।

মাতৃভাষার মাধ্যমে বুনিয়াদি শিক্ষা না হলে কী হয়?

সে যত না ভালোবাসা বলে, তার চেয়ে বেশি বলে লাভ।

ভালোবাসা শব্দটার মধ্যেই এমন জিনিস আছে, যে ভালোবাসা কী, তা না বুঝলেও চলে। এমনিই মাথায় ঢুকে যায়। অচেতনেই। ভালোবাসা উচ্চারণেই 'ভালো', 'বাসনা' এবং 'বাসা' শব্দগুলো ভিড় করে আসে।

বাঙালির ছেলে বা মেয়ে যদি বেশি লাভ বলে, তাহলে কী হয়? মাথার মধ্যে ভিড় করে আসে ব্যবসা। অচেতনে। লাভ মানে বাংলায় যা।

চেতনা যদি তা করতে বাধ সাধেও, তাতেও নিস্তার কই? ভালোবাসা উচ্চারণের আটপৌরে জাগতিক অনুষঙ্গ লাভ–এ নেই। লাভ মানে সে হয়ত বোঝে রকেট চড়ে চাঁদে গিয়ে চুমু খেয়ে চলে আসা।

যদি বাংলা মাধ্যমে না পড়িয়ে থাকেন, তাহলেও উপায় আছে। বাংলা মাধ্যমের প্রাইভেট টিউটর দিন। বাংলা মাধ্যমের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর ব্যবস্থা করে দিন। বাড়িতে বাংলায় বুঝিয়ে দিন সে যেগুলো ইংরেজিতে শিখছে সেগুলো — ম্যাথ এর বাংলা গণিত, সে গোনার সঙ্গে মিল পাবে। সোসাল স্টাডিজের বাংলা সমাজ বিদ্যা। সে সমাজ শব্দটা শিখলে 'সম', 'সমান' শব্দগুলো অজানিতে ভিড় করবে মাথায় তার। মাতৃভাষা বাংলা, তাই জন্ম শব্দটা শুনেছে। 'জ' তার অচেতনে ডেকে আনবে জন্ম–কে। সোসাল–এ এসব কোনো অনুষঙ্গ নেই। বায়োলজির মানে বলে দিন, জীববিদ্যা। ট্রিগোনোমেট্রির বাংলা বলে দিন, ত্রিকোণমিতি। ঘরের কোণ থেকে কানের দুল–টা কুড়িয়ে আনতে তাকে আগে বলেছেন নিশ্চয়ই।

বাংলা মাধ্যমে, মানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বুনিয়াদ তৈরি হলে ভাষা তার নিজের জোরেই একটা অচেতনা তৈরি করে দেয় — জ্ঞান বিজ্ঞান তত্ত্ব আবিষ্কার গান বাজনা তন্ত্র মন্ত্র খেলা ধূলা অনুভূতি প্রযুক্তি ইত্যাদি প্রভৃতি সে যত যা–ই হোক না কেন, তা আটপৌরে, জাগতিক, দৈনন্দিন জীবন থেকে আলাদা কিছু নয়। ফলতঃ পরবর্তীকালে অন্যান্য ভাষায় সে নানা চেতনা সংগ্রহ করলেও ওই বুনিয়াদি অচেতনা তাকে সেই আটপৌরে জাগতিক দৈনন্দিনে ফিরিয়ে আনে। বারবার।

অপরপক্ষে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় শিক্ষার বুনিয়াদ তৈরি হলে এটার বদলে অন্য একটা বিপজ্জনক অচেতনা তৈরি হয়, তা হল, জ্ঞান বিজ্ঞান ... ... ইত্যাদি প্রভৃতি এগুলো জাগতিক আটপৌরে দৈনন্দিন স্তরের বিষয় নয়। অন্য কোনো স্তরের বিষয়। তুরীয় স্তরের জিনিস। উত্তরণ সাপেক্ষ। অচেতনে মন একটা স্বর্গ নির্মাণ করে ফেলে এসবের আধার হিসেবে। তখন আলাদা করে চেতনা ইঞ্জেক্ট করতে হয় তা কাটানোর জন্য। না হলেই বিপদ। ভালোবাসা না বুঝে লাভ বুঝে চন্দ্রাহত দশা আর কাটে না, সারাজীবন তুরীয় স্তরে লাট খেয়ে চলে। মাটি পায় না।

জ্ঞানের সসীমতা

মানুষের কথা

রিপ্রেজেন্টেশনের জগৎ হলো আরোপনের জগৎ, প্রতিরূপের জগৎ, দৃশ্যমানের জগৎ, বর্ণনার জগৎ, উপস্থাপনার জগৎ।

ফরাসিতে রেপ্রেসনতাশিঁও বা ইংরেজিতে রিপ্রেজেন্টেশন কথাটার বাংলা মানে কী? রেপ্রেসনতাতিফ/রিপ্রেজেনটেটিভ কথাটার অর্থই বা কী? প্রথমটার বাংলা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই করা হয় প্রতিনিধিত্ব। আর দ্বিতীয়টির বাংলা প্রতিনিধি। বোঝাই যাচ্ছে, প্রথমটির ক্ষেত্রে বাংলাটি ফরাসি বা ইংরেজির থেকে আলাদা। কারণ বাংলায় প্রতিনিধি নামক ব্যক্তি রূপ, বা বিষয়ী রূপটির থেকে প্রতিনিধিত্ব কথাটা এসেছে। আগে প্রতিনিধি বা ব্যক্তি ও বিষয়ী রূপ। (প্রতিনিধি–>প্রতিনিধিত্ব) পরে প্রতিনিধিত্ব, যার অর্থ 'প্রতিনিধি যা করে'। প্রতিনিধিত্ব হলো প্রতিনিধি সাপেক্ষ কথা। কিন্তু ইংরেজি বা ফরাসি সেরকম নয়। সেখানে রিপ্রেজেন্টেশন যে করে, সে রিপ্রেজেনটেটিভ। আগে রিপ্রেজেনটেশন, পরে রিপ্রেজেনটেটিভ (রিপ্রেজেনটেশন–>রিপ্রেজেনটেটিভ)। ভাবের তফাত হয়ে যায়, তাই রিপ্রেজেনটেশন কথাটির বাংলায় প্রতিনিধিত্ব লিখতে কেমন লাগছে। কিন্তু কীই বা বলি? অভিধানে যা যা আছে, সেগুলির মধ্যে প্রতিরূপ এবং উপস্থাপনা খুব কাছের বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তাও ঠিক ভাবটা আসছে না। কোনো লৌকিক বাংলা শব্দ আছে কি? আপাতত প্রতিরূপ/উপস্থাপনা দিয়েই মূলত কাজ চালানো হলো। আর মাঝে মাঝে অন্য কোনো প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হলো।

দেল্যুজ তার 'ফারাক ও পুনরাবৃত্তি' বইটির মুখবন্ধে লিখেছিলেন,

সত্ত্বাকে যদি মুখ্য বানানো হয়, তা সে যেভাবেই করা হোক না কেন, তবে তা সংজ্ঞায়িত করে উপস্থাপনার দুনিয়া। কিন্তু আধুনিক চিন্তার তো জন্মই হয়েছে উপস্থাপনার ব্যর্থতার থেকে, সত্ত্বাগুলির হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে থেকে, এবং অভিন্ন–র প্রতিরূপের তলায় কাজ করে চলা শক্তিগুলির আবিষ্কারের মধ্যে থেকে। ... সমস্ত সত্ত্বাই কেবলমাত্র কৃত্রিমভাবে বানানো, যা তৈরি হয়েছে অনেক গভীরের ফারাক ও পুনরাবৃত্তির খেলার দৃশ্যমান 'বহিরঙ্গ' হিসেবে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি, মুখবন্ধ

উপস্থাপনার ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে আধুনিক চিন্তার জন্ম — এই কথার মধ্যে দিয়েই মিশেল ফুকোর আর্কিওলজি–কে স্বীকৃতি দিয়েছেন দেল্যুজ। ফুকোর 'শব্দগুলি এবং জিনিসগুলি' ('লে মোত এ লে শোজ', ইং. 'অর্ডার অফ থিংস', ১৯৬৬) বইটিতে পাশ্চাত্যের জ্ঞানতত্ত্বে ক্লাসিকাল যুগের শেষ এবং আধুনিক যুগের সূচনায় (ঊনবিংশ শতক) উপস্থাপনার অন্ত ও রক্তমাংসের মানুষের আবির্ভাব মুখ্য উপজীব্য। উল্লেখ্য, দেল্যুজ এই বইটির যে সমালোচনা লিখেছিলেন, তাতে বইটির শেষের আগের পরিচ্ছদ ('মানুষ এবং তার দ্বৈত')–টির কথা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করেছিলেন।

এখানে ফুকোর বইটির উল্লিখিত পরিচ্ছদের একটি অধ্যায় 'সসীমতার বিশ্লেষণ' (আনালিতিক দ্য ফিনিচুদ, ইং. অ্যানালিটিক অফ ফিনিচুড) –কেই মূলতঃ কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে এই আধুনিক যুগে সূচনায় প্রতিরূপ/উপস্থাপনার অন্ত–র বিষয়টি তুলে ধরা হলো, মূলতঃ অনুবাদ ও পুনর্পাঠের মাধ্যমে।

পাশ্চাত্য জ্ঞানের আধুনিক যুগ : প্রতিরূপের দিন শেষ, রক্তমাংসের মানুষের হাজির হয়ে যাওয়া

বাসনার বস্তুটির মূল্য আর শুধু নির্ধারিত হবে না সেই অন্য সব বস্তুর দ্বারা যাদের মধ্যে দিয়ে বাসনা নিজেকে উপস্থাপিত করতে পারে। বরং এমন এক জিনিস দিয়ে তা নির্ধারিত হবে, যাকে কোনোভাবেই ওই আরোপনের মধ্যে ফেলা যাবে না : শ্রম। একটা প্রাকৃতিক অস্তিত্বের গোত্রায়ন করতে পারার জন্য তার ও অন্যান্য অস্তিত্বগুলোর যে প্রতিরূপ আমাদের নিজেদের জন্য বানিয়ে নিই, তার ওপর আর নির্ভর করতে হবে না। বরং এই অস্তিত্বের মধ্যেরই এক প্রকার সম্পর্কের ভিত্তিতে করা যাবে, যার নাম জৈব কাঠামো। একটি ভাষাকে সংজ্ঞাত করতে গেলে আর সে যেভাবে বর্ণনাকে উপস্থাপনা করে সেইটা ধরে করা যাবে না।

বরং শব্দগুলি যেভাবে নিজেদের ব্যকরণগত অবস্থান সাপেক্ষে নিজেকে একভাবে বদলে নেয়, যাকে বলে তার ইনফ্লেকশনাল সিস্টেম, তা দিয়ে করা হবে।

ফুকো, শব্দগুলি ও জিনিসগুলি, ইংপৃষ্ঠা ২৫৭

অর্থাৎ, ফুকোর মতে, ক্লাসিকাল যুগের পর যখন আধুনিক যুগ আসছে, তখন (অষ্টাদশ শতকের শেষ, ঊনবিংশ শতক) জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনটি হলো, কোনো জিনিসের মূল্য নির্ধারণ আর সেই জিনিসকে অন্য কোনো জিনিসের, যা আমাদের বাসনা মেটায়, তার তুল্য রূপে হাজির করা হলো না। ওই জিনিসটার আমাদের বাসনার কাছে গুরুত্ব কতটা, অর্থাৎ জিনিসটার অন্যের কাছে গুরুত্ব দিয়ে তার দাম ঠিক হলো না। জিনিসটার উৎপাদনের মধ্যে নিজস্ব ব্যাপার দিয়ে, যা অন্যের আরোপিত নয়, সেই রকম একটা জিনিস দিয়ে তার মূল্যায়ন শুরু হলো।

একইভাবে, প্রাকৃতিক অস্তিত্ব, উদ্ভিদ–প্রাণী–জড় জগৎ কে আমরা যেভাবে দেখি, সেভাবেই বিভাজন বা গোত্রায়ণ করা হতো। বাইরে থেকে যা দেখি, তাই দিয়ে। বা তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ভাবে। আধুনিক যুগে তা আর সেই বহিরঙ্গের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলো না। প্রাণের নিমিত্ত ঠিক কী কী রয়েছে সেখানে, সেগুলির প্রাধান্যের ওপর দাঁড়ানো হলো। যেমন জননতন্ত্র হলো মূল। ইত্যাদি। প্রাণকেন্দ্রীক যে গোত্রায়ণ, তা প্রাকৃতিক অস্তিত্বের নিজস্ব, দৃশ্যমান প্রতিরূপ নির্ভর নয়।

ক্লাসিকাল চিন্তায়, যে চরিত্রের জন্য প্রতিরূপটি, এবং যে নিজেকে উপস্থাপিত করে তার মধ্যে, সেখানে নিজেকে একটি প্রতিকৃতি বা প্রতিফলন হিসেবে ঠাহর করে, যে 'ছবি বা টেবিলের মতো করে' প্রতিরূপের সকল মিশে যাওয়া সূতোগুলোকে জোড়া লাগায় একসাথে – সে নিজেকে কখনো খুঁজে পায় না ওই টেবিলে।

ফুকো, শব্দগুলি ও জিনিসগুলি, মানুষ ও তার দ্বৈত, ইংপৃষ্ঠা ৩৩৬

তাই বলে কি পশ্চিমী ক্লাসিকাল জ্ঞানতত্ত্বে মানুষ নিয়ে কোনো আলোচনা ছিল না? কখনোই তা নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে মানুষকে একটি গণ বা প্রজাতি বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সাধারণ ব্যাকরণ এবং অর্থনীতিতে স্মৃতি ও কল্পনা এবং প্রয়োজন ও বাসনা নিয়ে চর্চা হয়েছিল। ক্লাসিকাল জ্ঞানতত্ত্বে মানবিক চরিত্রের ওপর যতটা মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, ততটা আর কোথাও দেওয়া হয়নি। অথচ, মানুষ নিয়ে কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক সচেতনতা ছিল না।

অনুধাবন করা জরুরি যে, ক্লাসিকাল জ্ঞানতত্ত্বে 'প্রকৃতি' এবং 'মানবিক প্রকৃতি' – এই দুয়ের কার্যকলাপ একে অন্যের বিপরীত, একেবারে

অক্ষরে অক্ষরে। প্রকৃতি, অস্তিত্বের ক্রমিক ধারাবাহিকতার মধ্যে ফারাকের উদয় ঘটায়, বাস্তব এবং বিশৃঙ্খল সন্নিধি বা পাশাপাশি রাখার মধ্যে দিয়ে। মানবিক প্রকৃতি, প্রতিরূপের অক্রমিক শৃঙ্খলায় অভেদের উদয় ঘটায়, প্রতিকৃতিগুলির প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে। একটার মানে দাঁড়ায় ইতিহাসের টুকরো টুকরো হওয়া, যাতে প্রকৃত পটভূমিটিকে দাঁড় করানো যায়; অন্যটির মানে দাঁড়ায় অপ্রকৃত জিনিসগুলির তুলনার মাধ্যমে একটি কালপঞ্জীর বুনোটকে ধ্বংস করা। এই বিরোধিতা সত্ত্বেও, যদিও, বা বরং এই বিরোধিতার মধ্যে দিয়েই, প্রকৃতি এবং মানবিক প্রকৃতির ইতিবাচক সম্পর্ক আকার নিতে শুরু করেছে বলে আমরা দেখি। তারা কার্যত অভিন্ন জিনিসের ওপর কাজ করে (যেমন, একই, ধারাবাহিক, অবোধ্য ফারাক, অ–ভাঙা ক্রম)। উভয়েই প্রকাশিত হয় সাধারণ বিশ্লেষণের সম্ভবনার এক বিরতিহীন বুনোটের পটভূমিতে। একটি টেবিলিকৃত পরিসরে এবং ক্রমিক ধারাবাহিকতার ওপরে, পৃথক করা সম্ভব এমন সত্ত্বা বা পরিচয়গুলোকে এবং দৃশ্যমান ফারাকগুলোকে বিতরণ করা–কে যা সম্ভব করে। কিন্তু তারা এটা করায় সফল হতে পারে না একে অপরের সাহায্য ছাড়া, এবং এখানেই তাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটে। প্রতিরূপের শৃঙ্খলা, ফলতঃ, নিজের প্রতিলিপি বানানোর ক্ষমতার জোরে (কল্পনায় এবং স্মৃতিতে, এবং তুলনায় নিয়োজিত বিবিধ মনোযোগে), পৃথিবীর বিশৃঙ্খলার নিচে পুনরাবিষ্কার করে অস্তিত্বের অটুট বিস্তার।

ফুকো, শব্দগুলি ও জিনিসগুলি, মানুষ ও তার দ্বৈত, ইংপৃষ্ঠা ৩৩৬–৩৭

এর ফলে কী হলো? বাচনের সার্বভৌমত্বের মধ্যে এনে ফেলতে পারা গেল পৃথিবীকে। প্রতিরূপের প্রতিরূপ বানানোর মাধ্যমে। প্রতিরূপকে বাঁকিয়ে তার ওপরেই ফেলে দেওয়ার মতো, মানবিক প্রকৃতি, চিন্তার সরলরৈখিক ক্রমকে রূপান্তরিত করে আংশিক ফারাকের ধারাবাহিক টেবিলে।

ক্লাসিকাল জ্ঞানতত্ত্বে, যদি মানবিক প্রকৃতি প্রকৃতির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে থাকে, তবে তা বেঁধেছে জ্ঞানের পদ্ধতিগুলো এবং সেগুলোর কার্যকলাপের মাধ্যমে। অন্যান্য প্রাণী যেভাবে প্রকৃতিতে জায়গা পেয়েছে, অর্থাৎ তাদের নির্দিষ্ট প্রকৃতির জন্য, সেরকমভাবে নয়। আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বে ব্যক্তি অর্থনীতির নিয়ম মেনে কাজ করে, বায়োলজির নিয়মমাফিক বাঁচে, ফিলোলজির নিয়ম মেনে কথা বলে; আবার এক আভ্যন্তরীন প্যাঁচ ও সমাপতনে সে ওই নিয়মগুলোর দৌলতেই ওগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার অধিকারী হয়ে ওঠে। সে এখন এমন এক প্রাকৃতিক অস্তিত্ব, যার প্রকৃতিই হলো প্রকৃতিকে জানা, এবং ফলতঃ, নিজেকে জানা। বদলে, ক্লাসিকাল জ্ঞানতত্ত্বে অস্তিত্ব

এবং প্রতিরূপের মোলাকাতের জায়গায় প্রকাশিত হত বাচনের ক্ষমতা। ভাষা তো অস্তিত্বের ধারাবাহিকতাকে কেটে নিয়ে অক্ষরের নকশায় বেঁধে ফেলে। আর বাচন–এ, প্রতিরূপগুলিকে পাশাপাশি সাজানো হয়, জিনিসগুলোকে একজোট করে বয়ান তৈরি হয়। ক্লাসিকাল ভাষায় অস্তিত্ব এবং প্রতিরূপের একটি সাধারণ বাচন তৈরি হয়েছিল। বাচক অস্তিত্ব রক্তমাংসের মানুষটিকে সেখানে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

> *ক্লাসিকাল বাচন–এ অস্তিত্ব এবং প্রতিরূপ একটি সাধারণ কক্ষপথ খুঁজে পেয়েছিল। তা অস্তমিত হলো। তারপর আর্কিওলজিক্যাল পরিব্যক্তির* (mutation) *এই প্রকাণ্ড ওঠাপড়ার মধ্যে, মানুষ দেখা দিল তার দ্ব্যর্থক অবস্থান নিয়ে – জ্ঞানের একজন বিষয় এবং একজন বিষয়ী, যে জানে।*
>
> *ফুকো, শব্দগুলি ও জিনিসগুলি, মানুষ ও তার দ্বৈত, ইংপৃষ্ঠা ৩৪০–৪১*

দ্ব্যর্থক অবস্থানটি কী?

> *একভাবে, মানুষ শ্রম, জীবন এবং ভাষার অধীন : তার মূর্ত অস্তিত্ব তার নির্ধারণ খুঁজে পায় এইগুলির মধ্যেই। তাকে পাওয়া সম্ভব তার শব্দগুলির মধ্যে, তার জৈবদেহ–র মধ্যে, সে যে জিনিসপত্তর বানায় তার মধ্যে – যেন বা সেগুলোই তারা যারা প্রাথমিক সত্যগুলোর অধিকারী (এবং কেবল তারাই)। এবং সে, যেই না সে ভাবতে শুরু করে, সে নিজের চোখের সামনে নিজেকে মেলে ধরে মাত্র, একটা অস্তিত্ব হিসেবে যা কিনা এরইমধ্যে, একটা আবশ্যিকভাবে এলাকাধীন নিবিড়তার মধ্যে, এক অসংকোচনযোগ্য অগ্রগণ্যতার মধ্যে, একটি জীবন্ত অস্তিত্ব, উৎপাদনের এক হাতিয়ার, শব্দগুলির এক বাহন, যা কিনা তার আগে থেকেই আছে।*
>
> *ফুকো, শব্দগুলি ও জিনিসগুলি, মানুষ ও তার দ্বৈত, ইংপৃষ্ঠা ৩৪১–৪২*

এই 'তার আগে থেকেই তার থাকা'র তাৎপর্য কী?

> *এইসব কিছুই যা তার জ্ঞান তার কাছে তুলে ধরে তার নিজের কাছেই বহিঃস্থ হিসেবে, এবং তারা তার চেয়ে বয়সে বড়ো, তারা তাকে আগে থেকে বুঝে ফেলে, নিজেদের সমস্ত কাঠিন্য দিয়ে তাকে ঝুলিয়ে দেয়, তাকে কাটাছেঁড়া করে যেন সে কেবল প্রকৃতির এক বস্তু মাত্র, একটা মুখ মাত্র যার নিয়তি হলো কালের যাত্রাপথে মুছে যাওয়া। জ্ঞানের ইতিবাচকতায় মানুষের সসীমতাকে চিহ্নিত করে, এবং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে।*

ফুকো, শব্দগুলি ও জিনিসগুলি, মানুষ ও তার দ্বৈত, ইংপৃষ্ঠা ৩৪২

আশাবাদী হয়ে বলে ওঠাই যায়, আরে মনুষ্য প্রজাতির বিবর্তন তো এখনো শেষ নাও হতে পারে, মানুষ তার শ্রমের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকে কাটিয়ে ওঠার মতো যোগ্য শ্রম ও উৎপাদন প্রক্রিয়া তৈরি করে নিতে পারে, বা এমন এক শুদ্ধ ভাষা বানাবে যাতে আর আগেকার ভাষাগুলোর মতো অসচ্ছতা থাকবে না। কিন্তু সে তো অনন্ত যাত্রার কথা। মানুষের সসীমতার সীমারেখা টানা অশেষের মধ্যে। এক কূটাভাস। না সে নিজের জ্ঞানের আলোয় আংশিক আলোকিত অবস্থায় নিজেকে আবিষ্কার করেছে তার প্রাণী–জীবনের মৌন সুখী দিনে, না সে নিজের অসীম বোঝাবুঝির বিদ্যুৎ চমকে নিজেকেই অদৃশ্য করে ফেলেছে। মানুষের নিজের কাছে আছে একটি শরীর। নিজের শরীর। শরীর – জীবনের অস্তিত্বের রূপ, উৎপাদনের অস্তিত্বের রূপ, ভাষার অস্তিত্বের রূপ।

> *সমস্ত অভিজ্ঞতালব্ধ ইতিবাচকতাগুলির, এবং মানুষের বিদ্যমানতার সীমা হতে সক্ষম যা কিছুর ভিত্তি–তে, আমরা আবিষ্কার করি একটি সসীমতা – যা একভাবে দেখলে একইরকম : যা শরীরের পরিসরতা দিয়ে চিহ্নিত, বাসনার জৃম্ভণ দিয়ে চিহ্নিত, এবং ভাষার সময় দিয়ে। এবং তথাপি এটা মৌলিকভাবে অন্য : এইভাবে দেখলে, এই সীমাটি বাইরে থেকে মানুষের ওপর আরোপিত নির্ধারন (কারণ তার একটি চরিত্র বা ইতিহাস আছে, তাই) দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে না, বরং এক মৌলিক সসীমতা যা কোনোকিছুর ওপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছে নিজের বিদ্যমানতার বাস্তবের ওপর। এবং তা সমস্ত মূর্ত সীমাবদ্ধতার ইতিবাচকতাকে উন্মুক্ত করে।*

ফুকো, শব্দগুলি ও জিনিসগুলি, মানুষ ও তার দ্বৈত, ইংপৃষ্ঠা ৩৪৩

তাই এগোনো হবে সসীমতার বিশ্লেষণে।

সসীমতার বিশ্লেষণের প্রাথমিক লক্ষণ : মানুষের অস্তিত্বের মাঝে ইতিবাচক ও মৌলিক–এর মধ্যে ফারাক এবং একত্ব, তাদের পুনরাবৃত্তি। যেমন, ইতিবাচক মৃত্যু, যা জীবিতের দৈনন্দিন বিদ্যমানতাকে অজ্ঞাতভাবে বিদ্ধ করে; এবং, মৌলিক মৃত্যু, যার অবশ্যম্ভবতা নিয়েই আমার প্রায়োগিক জীবন। দুটিই একই – মৃত্যু। যেমন, যে ইতিবাচক বাসনা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতার মধ্যে মানুষগুলোকে জুড়ে দেয় বা সরিয়ে দেয়; সেই একই বাসনা আমার সমস্ত চাওয়ার মূল। যে সময় ভাষাগুলোকে বহন করে, নিজেকে তাদের মধ্যে স্থাপন করে এবং তাকে ব্যবহার করে ফেলে; সেই একই সময় তো আমার বাচনকে, হয়ত আমার বলে ওঠার আগেই, নিয়ে

চলে যায় এক পরবর্তীর দিকে যার ওপর কেউ প্রভুত্ব করতে পারে না। মূলের মধ্যে ইতিবাচকের এই পুনরাবৃত্তি মুক্ত করে দেয় সরু কিন্তু অনেকটা বড়ো পরিসর – সসীমতার বিশ্লেষণ এখানে খেলবে।

ইউরোপীয় জ্ঞানতত্ত্বে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে : মানুষের সসীমতা তাকে বাধ্য করেছিল পশুর মতো বেঁচে থাকতে, কপালে ঘাম ঝরিয়ে কাজ করতে, অস্বচ্ছ শব্দে চিন্তা করতে। সে জানে না তার শরীর কীভাবে কাজ করে, তার চাহিদা কীভাবে পূরণ হতে পারে, অভ্যেস আর কল্পনা দিয়ে বোনা ভাষার কুসঙ্গ এড়িয়ে কীভাবে চিন্তা করা যায়। এ যেন এক অসীম অপর্যাপ্ততা, প্রায়োগিক অন্তর্বস্তু আছে বোঝা গেছে, কিন্তু তা তখনই জানা যাচ্ছে না। আর উল্টোদিক থেকে দেখলে, অসীম অপর্যাপ্ততাকে নেতিবাচকতা দিয়ে দেখলে, এটাই ভিত্তি দিল, শরীরের অস্তিত্বের, চাহিদার অস্তিত্বের, শব্দের অস্তিত্বের; এবং তাদের কোনো পরম জ্ঞানের অধীনে আনার অসম্ভবতার। ঊনবিংশ শতকে এই সসীমতার আবিষ্কারটিকে আর অসীমের চিন্তার মধ্যে রাখা হলো না। তাকে নিয়ে চলে আসা হলো প্রায়োগিক অন্তর্বস্তুতে, সসীম বিদ্যমানতার মূর্ত রূপ হিসেবে, জানা নামক একটি সসীম কার্যকলাপের মাধ্যমে। তাই যদি বলি মানুষের জ্ঞান সসীম, তার কারণ সে আটকে পড়েছে ভাষা, শ্রম এবং জীবনের ইতিবাচক অন্তর্বস্তুতে, মুক্তির সম্ভাবনা নেই।

আরেকটু অন্যভাবে বললে, ক্লাসিকাল চিন্তায় সসীমতা দিল কিছু কিছু নেতিবাচক রূপ : শরীর, চাহিদা, ভাষা; আর তাদের সম্পর্কে সীমাবদ্ধ কিছু জ্ঞান, যেটুকু সম্ভব। আধুনিক চিন্তায়, জীবন, উৎপাদন এবং শ্রমের ইতিবাচকতা ভিত্তি সরবরাহ করল জ্ঞানের সীমাবদ্ধ চরিত্রের, যা কিনা ওইগুলোর নেতিবাচক আন্তঃসম্পর্ক। আর, জ্ঞানের সীমা একটি ইতিবাচক ভিত্তি দিল, জানার সম্ভবনার, জীবন কি শ্রম কি ভাষা কি, যদিও তা কখনওই পুরোটা জানা যাবে না।

প্রতিরূপের পরিসরে ফেললে – এই প্রায়োগিক অন্তর্বস্তুগুলি (জীবন, শ্রম, ভাষা) – এগুলো হয়ত মানুষী সসীমতার উদ্ভাসিত রূপ, কিন্তু তাদের কক্ষপথ আর সত্য-কে থাকতে হবে প্রতিরূপের মধ্যে। অর্থাৎ অসীমের ভাবনা, এবং সসীমের মধ্যে তার নির্ধারন – একে অন্যের পরিপূরক। কিন্তু প্রতিরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যদি এই বাস্তব অন্তর্বস্তুগুলি নিজেদের মধ্যেই যদি তাদের বিদ্যমানতা ধরে রাখে, তাহলেই তো ওই অসীমের অধিবিদ্যা আর কোনো কাজে লাগে না।

ফুকোর পর্যবেক্ষণ, পশ্চিমী চিন্তা এইখানেই পুরো উলটে গেল। আগে ছিল প্রতিরূপের অধিবিদ্যা আর অসীমের আন্ত:সম্পর্ক এবং জীবিত অস্তিত্ব,

মানুষের বাসনা, তার ভাষার শব্দের বিশ্লেষণ। এখন নিজেকে আবিষ্কার করা গেল সসীমতার এক বিশ্লেষণ (আনালিটিক) ও মানুষী অস্তিত্বের মধ্যে, এবং এক আন্তঃসম্পর্কিত বিরোধিতায় জীবন, শ্রম ও ভাষার এক অধিবিদ্যা তৈরির নিরন্তর ঝোঁকের মধ্যে। কিন্তু তা ঝোঁকই, কারণ ওই অধিবিদ্যাকে নিজেকে ছোটো করে মানুষী সসীমতার স্তরে নামিয়ে আনতেই হবে। আধুনিক চিন্তার ব্যাপারটাই হলো নিজের মধ্যেকার অধিবিদ্যার আবেগকে সসীমতা দিয়ে আটকানো। অধিবিদ্যার অন্ত।

কিন্তু পশ্চিমী চিন্তায় অধিবিদ্যার অন্ত তো একটি নেতিবাচক দিক। ইতিবাচক দিকটি কী? ইতিবাচক দিকটি হলো, চিন্তায় মানুষ–এর হাজির হয়ে যাওয়া।

ক্লাসিকাল এবং আগেকার সমস্ত চিন্তা হয়ত সক্ষম ছিল মন নিয়ে শরীর নিয়ে কথা বলতে, মানবিক অস্তিত্ব নিয়ে কথা বলতে, এই বিশ্বসংসারে কত তুচ্ছ তার অবস্থান তা নিয়ে কথা বলতে, তার সমস্ত সীমাবদ্ধতা নিয়ে কথা বলতে যেগুলো তার জ্ঞান বা স্বাধীনতাকে মাপতে আবশ্যিক; কিন্তু তারা কখনোই সেই মানুষকে জানতে পারেনি যে আধুনিক জ্ঞানে স্থাপিত হয়েছে। রেনেসাঁর ‘মানবতাবাদ’ বা ক্লাসিকাল যুগের ‘যুক্তিবাদ’ সত্যিই মানুষকে বিশ্ব শৃঙ্খলায় একটি সুবিধাজনক ঠাঁই দিয়েছিল। কিন্তু তারা মানুষের ধারনা করতে পারেনি।

সসীমতার বিশ্লেষণে, মানুষ হলো একটা অদ্ভুত জাগতিক–তুরীয় (empirico - transcendental) দ্বৈততা।

ক্লাসিকালে ভাবা হতো, প্রতিরূপের কোন কোন বৈশিষ্ট্য ও রূপ থাকলে তা জ্ঞান হয়ে উঠতে পারে। আধুনিকে আবিষ্কৃত হলো মানুষ। যে একাধারে অস্তিত্ব। আবার জ্ঞানের বিষয়ী।

টিপ্পনি : আংশিকতাই শক্তি

শস, ৭।৬।২০১৮

অনেক কিছু জেনে বুঝে গেলে বা পড়ে ফেললে কি সমাজের জন্য বেশি কিছু করা যায়? না। প্রত্যেকটা মানুষের জানা বোঝা পড়ার একটা নির্দিষ্ট ট্র্যাজেক্টরি আছে। সবকিছু তো দূরের কথা, অনেককিছুও জানা বোঝা পড়া যায় না। আর, জানা বোঝা পড়ার কোনো কালেকটিভ এফোর্ট হয় না। আদানপ্রদান হতে পারে মাত্র। আমি ফুকো পড়লাম, তুমি দেল্যুজ, সে

নিতশে – তিনজনে ভাগাভাগি করে পড়ে তারপর তিনজন মিলে ফাটিয়ে দেব – এগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসুলভ বালখিল্যপনা এবং খিল্লি।

সমাজের জন্য কিছু করতে গেলে বরং প্রয়োজন কম জানা, কম বোঝা, কম পড়া। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু জানা, ততটুকু বোঝা, ততটুকু পড়া।

তা নাহলে কেউ বিজ্ঞ, বোদ্ধা এবং পণ্ডিত হতে পারে। সমাজের কাজে লাগবে না।

আংশিকতাই শক্তি।

টিপ্পনি : রক্তমাংসের মানুষ ও মহান মানুষ

শস, ২৭।৩।২০১৮

আমাদের জনজীবনে একটা প্রবাদ আছে। *নিজের ছেলে হাগলে বলে হেগে ফেলেছে। পরের ছেলে হাগলে বলে হেগে মরেছে।*

জনজীবন রক্তমাংসের মানুষ দিয়ে তৈরি। প্রবাদে তার স্বীকৃতি আছে। একইসাথে তার সীমাবদ্ধতারও ইঙ্গিত আছে। রক্তমাংসের মানুষ মানেই সীমাবদ্ধ।

তারাই মহান, যারা নিজের ছেলেমেয়ের হাগা আর পরের ছেলেমেয়ের হাগার ফারাক করে না। সমান প্রেমে দুয়ের হাগাই পরিষ্কার করে। তারা নমস্য।

তারা জনজীবনের কেউ না।

টিপ্পনি : মানুষের সসীমতা

শস, ২৯।৬।২০১৬

শুনলাম ক্যাম্পাসিং–এ যাদবপুরের ইউজি কম্পিউটার সায়েন্সের যে ছেলেটা কোটি টাকার (ডলারে পেমেন্ট) চাকরি বাগিয়েছে, সে মিডিয়াতে বলেছে, *যাদবপুরের ক্যাম্পাস পলিটিক্স ক্যান্সারের মত। এখানকার স্টুডেন্টরা পেটি আর ফেক ইসু নিয়ে প্রোটেস্ট করেই সময় নষ্ট করে।* জানিনা ও কতটা বলেছে আর মিডিয়া তাকে কী বানিয়েছে। তবে তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি,

ও এটাই বলেছে। সেক্ষেত্রে ...

ক্যানসার রোগটা সারানো যায় না। ক্যানসার রোগগ্রস্থ কোষগুলি দ্রুত ছড়িয়ে যায়, আশেপাশে, এক অঙ্গ থেকে অন্য অঙ্গে। তাদেরকে ধরমুণ্ডু শুদ্ধু কেটে বাদ দিতে বা ধ্বংস করতে পারলে নিস্তার পায় জীবদেহ। তবে যে যত বেশিদিন বাঁচে, তার ক্যানসারে মারা যাওয়ার চান্স তত বেশি। ইউএসএ-র চল্লিশ শতাংশ মৃত্যুর কারণ ক্যানসার। ওখানে গড় আয়ুও অনেক বেশি। বাকি বেশিরভাগ রোগব্যাধি সারানো বা না-হওয়া নিশ্চিত করতে পেরেছে মার্কিনরা। ... ক্যানসার রোগটা বারবার আমাদের মনে করিয়ে দেয় – আমরা মানুষ। আমরা সসীম। আমাদের উদ্যম, আমাদের উদ্যোগ, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ক্ষমতা, আমাদের দক্ষতা, আমাদের পারঙ্গমতা – সবই সসীম। যতই করো জারিজুরি, যেতে হবে যমের বাড়ি।

যাদবপুরের ক্যাম্পাস পলিটিক্স পাতি ইস্যু নিয়ে মাথা ঘামায়। 'ফেক' ইস্যু নিয়ে মাথা ঘামায়। সময় 'নষ্ট' করে। যাবতীয় ঘ্যাম/মিথ/আকাশচুম্বী ইমেজ/বারফাট্টাই-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে করিয়ে দেয় – এখানে যারা পড়ে, পড়ায়, কাজ করে, শাসন করে – তারা হাগে, মোতে, কাঁদে, চোদে, পাদে। সবাই মানুষ। সসীম। ... ছেলেটা ভুল কিছু বলেনি।

বেঁচে থাক যাদবপুরের ক্যাম্পাস পলিটিক্স। বেঁচে থাক ক্যানসার।

টিপ্পনি : 'রাজনীতি আসলে ভালো' এই নিরুচ্চার পূর্বধারনার বিপদ

শস, ২।৫।২০১৮

গত কয়েক মাস ধরে পুরো শনির দশা চলছে। যেদিন থেকে ঠিক করলাম, ফেসবুকে আর পলিটিক্যালি কারেক্ট কারেক্ট কথা লিখে পারস্পরিক পিঠ চাপড়ানির সুখী গৃহকোণ তৈরি করব না; আত্মপরিচয়ের সীমা ছেড়ে বেরোবো না; আত্মপরিচয়ের সীমার মধ্যে থেকেই বুঝব কে কতটা অন্যকে অস্বীকার করে, খাটো করে; আত্মপরিচয়ের সীমার মধ্যে থেকেই যুঝব পরিস্থিতির সঙ্গে – সেদিন থেকে হেন কোনো গালাগাল নেই আমি খাইনি। দালাল ফ্যাসিস্ট সাবোটর প্যাট্রিয়ার্কাল, এমনকি পোটেনশিয়াল গণধোলাইকারী, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরশুর মেট্রোর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গতকালের পোস্টগুলো আমি 'গণধোলাই অত্যন্ত নিন্দনীয় ...' বলে শুরু করতেই পারতাম, কিন্তু ওই যে বললাম, পলিটিক্যালি কারেক্ট কারেক্ট কথা বলা ছেড়ে দিয়েছি।

সুদিং কথা বলা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ, কোনোকিছু সুদিং নয়। যে মিলিউ সবচেয়ে সুললিত সুদিং ভালো নিরাপদ ইত্যাদি বলে মনে হয়, তার নখ দাঁত দেখতে পায় কেবল যে বাইরে গিয়ে সেই মিলিউ–এর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, সে। তখনি বোঝা যায়, কার নখ দাঁত কত ধারালো। আমিও কাল সারাদিন ধরে ফেসবুকে দেখেছি আলোকপ্রাপ্ত দিকপাল যুবক–যুবতীদের গালাগাল – কাকু, জেঠু, দাদু, বুড়ো, ভাম। মেপে নিয়েছি, কে কতটা অন্যকে ডিনাই করে। অস্বীকার করে। লজ্জতে মানবাধিকার থাকলেও কে কতটা মানবাধিকার মানে। এটাও বুঝে গেছি, মতামত আত্মপরিচয়ভিত্তিক। কেউ বলে। কেউ বলে না। সেটা লুকায় নানা রঙিন জিনিসের মধ্যে।

আমার রাজনীতি আংশিক, সীমাবদ্ধ। আমার আত্মপরিচয় দিয়ে সীমাবদ্ধ। কখনো তা ভালো, কখনো তা খারাপ। ভালো খারাপ মেশানো রক্তমাংসের মানুষের চেয়ে তা এক পা এগোয় না। কখনো তা ঠিক কখনো তা ভুল। ঠিক ভুল মেশানো রক্তমাংসের মানুষের চেয়ে তা এক পা এগোয় না। কখনো তা উদার কখনো তা রক্ষণশীল। উদার অনুদার রক্তমাংসের মানুষের চেয়ে অতিরিক্ত তার কোনো স্বার্থ বা লক্ষ্য নেই। আমার রাজনীতি মূলতঃ শান্ত কিন্তু আত্মপরিচয় আক্রমণের মুখে পড়লে তা ঠেকাতে সে ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে উঠতে দ্বিধা করে না। রক্তমাংসের মানুষের মতোই। আমার রাজনীতি তার আংশিকতা সীমাবদ্ধতা ভালো–খারাপের মিশেলের কারণেই, এটুকু বলতে পারি, সৃজনশীল।

আমার রাজনীতি মানুষের ভালো দিকগুলো ছেনে তৈরি হয় না। ঠিক দিকগুলো ছেনে তৈরি হয় না। 'ক্ষীর ননি চিনি আর ভালো যাহা দুনিয়ার' দিয়ে গড়া না। 'রাজনীতি আসলে ভালো' এই নিরুচ্চার পূর্বধারণা, এই সু–চিন্তার প্রতিকৃতির ওপর তৈরি না। তাই তা বন্ধ্যা নয়।

ইস্তাহার : একটি সমতার ইস্তাহার ও দুটি প্রশ্নোত্তর

শস, সেপ্টেম্বর ২০১৯

১) বর্তমান ভারতে সমতা নেই। জাত–ধর্ম–লিঙ্গ–শ্রেণী–বর্ণ–জাতিসত্ত্বা–ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি ভেদ–এ কারোর বেশি সম্পদ তো কারোর কম। কারোর শিক্ষার হার বেশি তো কারোর কম। কারোর চাকরি বেশি, ব্যবসা বেশি। কারো কম। কারো স্বাস্থ্য ভালো, কারো মন্দ। ফলতঃ আমরা সমতার ইস্তাহার তৈরিতে বাধ্য হচ্ছি। এই ইস্তাহার

একটি উদ্দেশ্য নিয়ে, তা হল এই যে অসমতা — তার অবসান।

২) ভেদাভেদ নানা প্রকার। ভেদাভেদ বরাবর বিদ্বেষও আছে ষোলো আনা। তাই ভেদাভেদগুলি এড়িয়ে যাওয়া ঠিক না। আমরা মনে করি, ভেদাভেদগুলি একে অন্যের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান নিয়ে তখনই চলতে পারবে, যখন অসমতা ঘুঁচে গিয়ে সমতা আসবে। নচেৎ পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ অনিবার্য, তাই সমতার ইস্তাহার এই পারস্পরিক বিদ্বেষ কাটানোরও একটা উপায়।

৩) ধর্মের দিক দিয়ে দেখলে ভারতে প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু বলে নিজেদের পরিচয় দেন। দেখা যায়, শিক্ষা স্বাস্থ্য সব দিক দিয়েই হিন্দুরা এগিয়ে মুসলমানদের তুলনায়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায়। তাই মুসলিমদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি, রোজগার, ব্যবসা, বাসস্থান ইত্যাদি উন্নয়ন সূচকে অমুসলিমদের সমপর্যায়ে আনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (সংরক্ষণ, ইনসেনটিভ ইত্যাদি) নিতে হবে। মুসলিমদের মধ্যে অপরাধের হার বেশি। তা কমাতেও সাহায্য করবে এই বিশেষ ব্যবস্থা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও উক্ত বিশেষ ব্যবস্থা চাই।

৪) লিঙ্গের দিক দিয়ে পুরুষ ও মহিলার (এবং অন্যান্য লিঙ্গের) ফারাক উল্লেখযোগ্য। সেই ফারাক সমস্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক পরিসর এবং সমস্ত জায়গায় ঘোঁচাতে হবে। এবং তার জন্য মেয়েদের দিকে টেনে নানা ব্যবস্থা করতে হবে, সংখ্যা অনুপাতে সংরক্ষণ ইনসেনটিভ ইত্যাদি ব্যবস্থার পাশাপাশি।

৫) জাতের দিক দিয়ে এসসি এসটি ওবিসি রিজার্ভেশনের একটা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এইসমস্ত ক্যাটেগরির মধ্যে পড়ে যে বিপুল সংখ্যক জাত, যাদের সাব-কাস্ট বলা হয়, তার মধ্যে দিয়ে যেন ভাবা হয় এসসি একটা জাত, আর তার অন্তর্গত কোনো একটা জাত হল এসসি-র সাব কাস্ট। এই ধারনা ভুল। এসসি, এসটি, ওবিসি এগুলো অফিসিয়াল বা সরকারি নাম মাত্র। আসল জাত হল, কুর্মী, মাহাতো, সাঁওতাল, লোধা, শবর, জাঠ, পতিদার ইত্যাদি। এসসি, এসটি, ওবিসি নামক সরকারি বন্ধনী দিয়ে নয়, জাতকে তার নিজস্ব জাত হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সংখ্যাগত অনুপাতে সুবিধার (সংরক্ষণ, ইনসেনটিভ ইত্যাদি) বন্দোবস্ত করতে হবে শিক্ষা, চাকরি, রাজনীতি সহ সর্বত্র।

৬) যে কোনো রাষ্ট্রীয় কাঠামো, রাজ্য বা প্রদেশ, স্বশাসিত অঞ্চল,

সার্বভৌম দেশ — সেগুলোর মধ্যেও সমতা নেই, অথচ এক ধরনের সমানতার প্রত্যাশা আছে, ফেডারেলিজম, সীমানা, রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইত্যাদি ধারনার মাধ্যমে। সেখানেও মানবোন্নয়নের সূচকে সমতার ধারনা সর্বাগ্রে প্রযোজ্য হবে — জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেমবাদ ইত্যাদির চেয়ে।

৭) শিক্ষা, যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা নির্ধারক। ফলতঃ উন্নয়নের এই নিরিখগুলিতে ভাষাগত অসমতা, যা কি না বৈষম্যের রূপে আসে – এই ভাষাগত অসমতা দূরীকরণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮) সমস্ত সামগ্রিক স্বার্থের কাজ – যেমন পরিবেশ রক্ষা, জৈব চাষ, শরীরচর্চা, বৃক্ষরোপণ, ত্রাণকার্য — এগুলোতে সরকার ও মানুষের সংগঠনগুলি কাজ করে। এই সমস্ত কাজ এবং উদ্যোগে জাত–লিঙ্গ–শ্রেণী–ধর্ম–ভাষা–জাতি ইত্যাদি ভিত্তিক সমতামূলক অংশগ্রহণ চাই। এগুলির সুফল ভোগও সমতার আদর্শের ভিত্তিতে হতে হবে।

৯) সম্পদের অসম বন্টন এবং এই অসাম্যের বেড়ে চলা আমাদের দেশের এক সমস্যা। হয়ত গোটা পৃথিবীরই। পুঁজিবাদের কারণে এই অসাম্য বেড়েই চলেছে, অর্থনীতিবিদরা তাই দেখাচ্ছেন। সেই সমস্যার নিরসনে এখানেও সমতার আদর্শের প্রয়োজন। বড়লোকদের কাছ থেকে সরাসরি টাকা নিয়ে গরীবদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এবং এই পুনর্বন্টন চলতেই থাকবে, যতদিন বিত্তবন্টনে অসাম্য থাকবে।

১০) চাকরির বেতনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বেতন এবং সর্বনিম্ন বেতনের মধ্যে তফাতও বড্ড বেশি। এক্ষেত্রেও সমতা প্রয়োজন। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষে বেতনের কমবেশি হতে পারে, কিন্তু সর্বোচ্চ বেতন কখনো সর্বনিম্ন বেতনের তিন–চার গুণের বেশি হওয়া চলবে না।

১১) এই ইস্তাহারে উন্নয়নের সূচক বলতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি, ব্যবসা, বিত্ত, ক্রয়ক্ষমতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, যোগাযোগের ক্ষমতা, সুপরিবেশ, অবকাশ, ভ্রমণ ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

১২) এই ইস্তাহার একটি অস্থায়ী কর্মসূচী। এটা কোনো সংগঠনের কর্মসূচী নয়। কোনো কার্যক্রমও নয়। সাধারণ ইস্তাহার। অনেকটা নুনের মতো। আমাদের চারপাশের নানা কর্মউদ্যোগের স্বাদ বদল করার ক্ষমতা রাখে এই ইস্তাহার, কিন্তু তা করতে গিয়ে এ সেই

কর্মউদ্যোগগুলির মধ্যে নিজের কেলাসিত রূপটি বিসর্জন দেয়, নিজে আলাদা অস্তিত্বে থাকে না। এই ইস্তাহার নিজে কখনোই কোনো কেলাসিত রূপ হয়ে উঠবে না। এই ইস্তাহার মাঝে মাঝে পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন, বিয়োজন হতে পারে। আপাতত একটা ফেসবুক পেজ–এ এই ইস্তাহারটি থাকতে পারে এবং এই ইস্তাহারের উপযোগী নানা তথ্য সম্বলিত প্রচার সমীক্ষা কথোপকথনের জন্য মাসে একদিন করে কয়েক ঘন্টার জন্য বসা যেতে পারে, ইচ্ছুকদের নিয়ে। এটুকুই তার সংগঠন।

প্রশ্ন : কেন সমতার ইস্তাহারের ওপর দাঁড়িয়ে কোনো সংগঠন করা হবে না?

উত্তর : কারণ সমতার ইস্তাহারে যে সমতার কথা বলা আছে, তার কোনো ধারক সামাজিক বর্গ নেই। ফলতঃ এই ইস্তাহার যদি কোনো সংগঠন তৈরি করে তবে তা হবে নিশ্চিতভাবে একটা মতাদর্শধারীদের সংগঠন। মতাদর্শধারীদের সংগঠনের কোনো সামাজিক ভিত্তি থাকে না, বা বলা ভালো, কোনো সামাজিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না, বরং সে সমাজের ওপর ওপর থেকে হস্তক্ষেপ করে। অপরদিকে সামাজিক ভিত্তিওয়ালা যে কোনো সংগঠন — নারী সংগঠন, মুসলিম সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, মাহাতো সংগঠন, সাঁওতাল সংগঠন, কামতাপুরী সংগঠন, সাইকেল সংগঠন, বাঙালী সংগঠন, ছাত্র সংগঠন — সে যে যা–ই হোক না কেন, সে সমাজের মধ্যে থেকে সমাজের ওপর হস্তক্ষেপ করে, ওপর থেকে নয়। মতাদর্শধারীদের সংগঠন তাই রাষ্ট্রের মতো।

সমতার ইস্তাহার নিঃসন্দেহে একটা আদর্শের কথা বলে। সমতার আদর্শ। অথবা আরো ভালো করে বললে, সমতার ধারনা। এই সমতার ধারনার বোঝাপড়া এবং মৌলিক প্রচারের জন্য তার নিঃসন্দেহে একটা কার্যকরী ছোট্ট সংগঠন থাকা বাঞ্ছনীয়। নানা রকম মানুষের সাথে তার কথোপকথন–ও খুবই জরুরি। কিন্তু ওইটুকুই।

প্রশ্ন : কিন্তু এই ইস্তাহার প্রয়োগ তাহলে কী করে হবে?

উত্তর : এই ইস্তাহারের প্রয়োগ দাঁড়িয়ে রয়েছে নানা সামাজিক আন্দোলনের, সামাজিক বর্গের আন্দোলনের ওপর। নানা সামাজিক আন্দোলন এবং সামাজিক বর্গের আন্দোলনের সঙ্গে এই ইস্তাহারের কোনো বিরোধ নেই। এই ইস্তাহার সেই সমস্ত আন্দোলনগুলিকে কিছু দৃষ্টিভঙ্গীর কথা পাশ থেকে বলে যেতে চায়। সেগুলি হল

— মানবোন্নয়ন, সমতা, সহিষ্ণুতা, আপেক্ষিকতা, রাষ্ট্রের সীমা, ধনতন্ত্রের সীমা। নানা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, যা সাম্যাবস্থা (equllibrium) বজায় রাখা এবং সামঞ্জস্যবিধানের (consistency, agreement) লক্ষ্যে নেওয়া হয়, তার মধ্যে দিয়ে এই সমতার ইস্তাহারের আংশিক প্রয়োগ হয়। যেমন ধরা যাক, ন্যূনতম মজুরি বাড়ানো, বা স্থির করে দেওয়া। মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু বাজারে জিনিসের দাম বাড়ে, তাই ন্যূনতম মজুরি স্থির না করলে বা কিছু বছর পর পর না বাড়ালে তা পরম দারিদ্র্যের পথ প্রশস্ত করে। এই পরম দারিদ্র্য সমাজের স্থিতিশীলতাকে নষ্ঠ করে, চুরি ডাকাতি বেড়ে যায়, সাম্যাবস্থা (equllibrium) সমস্যায় পড়ে। সমতার ইস্তাহার যেহেতু দারিদ্র্যকে আপেক্ষিক হিসেবে দেখে, তাই সে কখনোই মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে তাল রাখতে ন্যূনতম মজুরি স্থির করার কথা বলে না, বরং ন্যূনতম মজুরি স্থির করাকে সর্বোচ্চ মজুরি স্থির করার একটা মাপক হিসেবে দেখতে চায়, কারণ সে মনে করে, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মজুরির ফারাক কখনো তিন–চারগুণের বেশি হবে না। নানা সামাজিক আন্দোলন ও সামাজিক বর্গের আন্দোলন স্থিতিশীলতা এবং সাম্যাবস্থাকে সমস্যায় ফেলে, তখন রাষ্ট্রের তরফে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয় সেই স্থিতিশীলতা ও সাম্যাবস্থাকে বজায় রাখার জন্য। সমতার দৃষ্টিভঙ্গী সেই উদ্যোগগুলিকে দেখার সম্পূর্ণ আলাদা একটা দৃষ্টিভঙ্গী। সমতার দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো তৃপ্তি বা অর্জন নেই। তাই তা প্রয়োগমূলক নয়। বরং নিরন্তর এক অসম্পূর্ণতা ও অতৃপ্তির বয়ান তৈরি করে যাওয়া, সহিষ্ণুতাকে সঙ্গী করে — এটাই তার একমাত্র প্রয়োগ।

একত্ব ও উপস্থাপনা

ফারাকের কথা

অ্যারিস্টটলের দার্শনিক কাজের অনেকটা জুড়ে আছে ফারাকের একটি দর্শন তৈরির প্রকল্প। তার ক্যাটেগরিজ এবং মেটাফিজিক্স – এই দুটি খুব উল্লেখযোগ্য এ বিষয়ে। এছাড়াও টপিকস–এও কিছু আছে। অ্যারিস্টটলিয় গ্রীক শব্দ ডায়াফোরা–র ইংরেজি করা হয়েছে ডিফারেনশিয়া (ডাবলু ডি রস সম্পাদিত, ই এম এদঘিল কৃত ক্যাটেগরিজ থেকে)। দেল্যুজ ফরাসি করেছে দিফেরঁস। পল প্যাটোন ইংরেজি করেছে ডিফারেন্স। আমি বাংলা করেছি ফারাক। দেল্যুজ তার ফারাকের দর্শনের আলোচনা শুরুই করেছেন অ্যারিস্টটলের ফারাকের দর্শনের সমালোচনার মধ্যে দিয়ে। এই নোটটা তা নিয়েই। এই নোটটা দেল্যুজের মূল ফরাসী থেকে করা, এবং তারপর পল প্যাটোনের ইংরেজিটাও মেলানো হয়েছে। নোটটায় আছে দেল্যুজের পূর্ণাঙ্গ বয়ান ('দিফেরঁস এ রেপিতিশিঁও' বইটার 'লা দিফেরঁস অঁ এল–মেম' অধ্যায়ের প্রথম দিকে আছে)। এবং বুঝতে সুবিধার জন্য মাঝে মধ্যে অ্যারিস্টটলের জবান, দেল্যুজের টীকা, বা অন্য টীকা। এবং পরফিরি–র গাছের ছবি।

প্রসঙ্গত, এখানে বারবার গণ এবং প্রজাতির কথা আসবে। গণ এবং প্রজাতি কথাদুটো জীববিদ্যার দৌলতেই বেশি প্রচলিত। কিন্তু জীববিদ্যার গণ এবং প্রজাতির ধারণা ফিজিক্যাল বা ভৌত। দর্শনে গণ এবং প্রজাতির ধারণা মেটাফিজিক্যাল বা আধিভৌত, অর্থাৎ জ্ঞানতত্ত্বের ভাষায় – যা ভৌত জগত সম্বন্ধীয় ভৌত ধারণা (জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিভাষায় গ্রীক শব্দ মেটা কথাটার

মানে এইরকমই, যেমন, মেটাডাটা মানে ডাটার সম্বন্ধে ডাটা, পরিসংখ্যান সম্বন্ধে পরিসংখ্যান)। দর্শনে গণ বলতে বৃহত্তর বিভাজন, আর প্রজাতি হলো ক্ষুদ্রতম বিভাজন।

অ্যারিস্টটলের বিখ্যাত প্রতিপাদ্য : পৃথক কিছু নিজেদের পৃথক করে কেবলমাত্র নিজেদের সাধারণ কিছুর সাপেক্ষে। এইভাবে ফারাককে একত্বর অধীন করে দেওয়ার ব্যাপারটা দেখা যায় অ্যারিস্টটলের অন্টোলজির চিত্রকল্পেও – পরিফিরির গাছ–এ। ওই গাছের মাঝখানে নির্দিষ্ট ফারাক গণ বা ধারণাকে নিজের মতোই একরকম থাকতে দেয় (একত্ব) অথচ অন্যদিকে বিপরীতার্থক বিধেয়গুলি (নির্দিষ্ট ফারাক) র দ্বারা বিভাজনের মাধ্যমে তারা আলাদারকম হয়ে যায়। এইভাবে টেবিলের ওপরে এবং নিচে নির্দিষ্টকরণ তার সীমায় পৌঁছয়। নিচের দিকে, আলাদা আলাদা ব্যক্তিগুলির বহুত্ব একটাই ধারণার মধ্যে ফেলা যায় কেবল একটাই শর্তে যে একটা অনুভবযোগ্য মিল আন্দাজ করা যাচ্ছে (রাম, শ্যাম, যদু, মধু –> মানুষ)। ওপরের দিকে উচ্চতম গণগুলোর বা 'শ্রেণীগুলির' ফারাককে অস্তিত্বের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায় কেবল একটি কার্যকলাপের মাধ্যমেই, যাকে বলা হয় অ্যানালজি বা উপমা। ছবি এবং ক্যাপশনের এই বর্ণনাটি ড্যানিয়েল স্মিথ, 'ডকট্রিন অফ ইউনিভসিটি, দেল্যুজ এন্ড রিলিজিঅন', ২০০১ থেকে নেওয়া। পূর্ণাঙ্গ ছবিটি নোটের শেষে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি আংশিক ছবি।

শুরু করা যাক দেল্যুজের পাঠ, ফারাকের গ্রীক (অ্যারিস্টটলিয়ান) দর্শনের, এবং তার সমালোচনা। শিরোনাম, উপ–শিরোনাম – এ সবই আমার দেওয়া। এমনকি অনুচ্ছেদে ভাগও আমি করে নিয়েছি। দেল্যুজের মূল ফরাসি টানা লেখা।

> *চিন্তা ফারাক 'তৈরি করে', কিন্তু ফারাক হলো দৈতাকার। ... ফারাককে তার অভিশপ্ত দশা থেকে বাঁচানোটা তাই ফারাকের দর্শনের প্রকল্পের লক্ষ্য। ফারাক কি মিলেমিশে থাকা জীব হয়ে উঠতে পারে না এবং নিজের নির্ধারণকে কি অন্যান্য নির্ধারণগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত করে তুলতে পারে না একটি বাহ্যরূপের মধ্যে, অর্থাৎ, জৈবিক প্রতিরূপের একটি সমস্বত্ত্ব মাধ্যমের মধ্যে? ... প্রথমেই যেটা মনে হয় তার ভিত্তিতে (অর্থাৎ, ফারাক হলো শয়তান) প্রস্তাব দেওয়া হলো যে ফারাককে 'বাঁচাতে' হবে উপস্থাপনার মাধ্যমে, এবং তাকে সাধারণভাবে ধারণার প্রয়োজনগুলির সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে উপস্থাপনার মাধ্যমে। তাই প্রশ্নটা দাঁড়িয়ে গেল, সেই শুভক্ষণটি নির্ধারণ করা, গ্রীক শুভক্ষণটি, যখন ফারাককে ধারণার সঙ্গে সন্ধি করিয়ে দেওয়া হলো। ফারাককে তার গুহা ছাড়তেই হবে, তাকে দৈত্যাকার হওয়া বন্ধ করতেই হবে। অথবা কেবল যে ফারাক ওই*

পরফিরি-র গাছ (ই এম কার্লে (১৯৬৯), *স্পিনোজা'স মেটাফিজিক্স : এন এসে ইন ইন্টারপ্রিটেশন*, পৃ ২৯ থেকে বানানো)

ড্যানিয়েল স্মিথ, দি ডকট্রিন অফ ইউনিভোসিটি, ইন দেল্যুজ এন্ড রিলিজিয়ন (২০০১)

	ফারাকের ধরন
অস্তিত্ব → বিষয় ইত্যাদি	গণগত ফারাক (শ্রেণিবিভাজনগুলো)*
দৈহিক / বিদেহী	নির্দিষ্ট ফারাক
শরীর	অধস্তন গণ
গতিশীল / স্থবির	নির্দিষ্ট ফারাক
সজীব	অধস্তন গণ
বোধযুক্ত / বোধহীন	নির্দিষ্ট ফারাক
প্রাণী	অধস্তন গণ
যৌক্তিক / অযৌক্তিক	নির্দিষ্ট ফারাক
মানুষ	ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রজাতি
রাম শ্যাম যদু মধু ইত্যাদি	ব্যক্তিক ফারাক

*অ্যারিস্টটলের শ্রেণিবিভাজনের তালিকা : বিষয়, (তার) পরিমাণ, গুণ, সম্পর্ক, জায়গা, সময়, প্রকারভেদ, অবস্থা, কাজ, আবেগ

শুভক্ষণটি এড়াতে পারে, সে-ই দৈত্যাকার হবে, সেটা শুধুমাত্র একটি দুর্ঘটনা, একটি দুর্বিপাক।

এই জায়গাতেই ওই 'ফারাক তৈরি করা' শব্দবন্ধটি মানে পরিবর্তন করে ফেলল। এটার মানে দাঁড়ালো একটি নির্বাচনী পরীক্ষার মতো, যাকে নির্ধারণ করতে হবে কোন কোন ফারাকগুলিকে সাধারণভাবে ধারণার মধ্যে খচিত করা যায়, এবং কেমন করে। এই রকম একটি পরীক্ষা, এইরকম একটি নির্বাচন মনে হয় সম্ভব বড়ো এবং ছোটো-র মাধ্যমে। কারণ, বড়ো এবং ছোটো স্বাভাবিকভাবে এক-এর সম্পর্কে বলা কিছু নয়, কিন্তু ফারাকের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

প্রশ্ন উঠবে তাই, কতদূর অবধি ফারাককে বাড়ানো যায় এবং বাড়ানো দরকার, কতটা বড়ো, কতটা ছোটো? যাতে করে তা ধারণার সীমার মধ্যে থাকে, যাতে তা ধারনার মধ্যে হারিয়ে না যায়, অথবা ধারণাকে ছেড়ে বেরিয়ে না চলে যায়। যদিও খুবই কঠিন এটা জানা, এইভাবে সমস্যাটা তোলা কতদূর ঠিক হলো : ফারাক কি নিজেই একটি শয়তান? প্রশ্নটাকে কি এরকম নৈতিকভাবে তোলা যায়? ফারাকের কি 'মধ্যস্থতা' হতেই হবে তাকে নিয়ে চলতে পারার মতো এবং তাকে ভাবতে পারার

মতো কিছু করে তোলার জন্য? নির্বাচনকে কি এইসব পরীক্ষাগুলি করতেই হবে? ওই লক্ষ্যে এবং ওইভাবেই কি পরীক্ষাটিকে করা দরকার? কিন্তু আমরা এইসব প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারবো তখনই, যখন আমরা ওই মাহেন্দ্রক্ষণটির কল্পিত চরিত্রটিকে আরো সূক্ষভাবে নির্ধারণ করতে পারি।

১) নির্দিষ্ট ফারাক

ক) অ্যারিস্টটলের সর্বোত্তম এবং যথাযথ ফারাক – বৈপরীত্য

অ্যারিস্টটল বলেন, একটা ফারাক আছে যা একইসাথে সর্বোত্তম এবং এক্কেবারে যথাযথ। সাধারণভাবে ফারাক বৈচিত্র অথবা ভিন্নতার থেকে স্বতন্ত্র। কারণ দুটো শব্দের মধ্যে ফারাক হয় যখন তারা অন্য; না, নিজেদের মধ্যে থেকে তাদের অন্য হিসেবে দেখা হচ্ছে না, আলাদা কোনো কিছু দিয়ে দেখা হচ্ছে। যেমন যখন তারা আলাদা কোনো কিছুর মধ্যে মিলেও যায় : যেমন গণের মধ্যে মিলে যায়, যখন তারা প্রজাতিতে আলাদা; যেমন প্রজাতির মধ্যে মিলে যায় যখন তারা সংখ্যায় আলাদা; যেমন এমনকি 'অস্তিত্বের মধ্যে, অনুরূপতা অনুসারে' মিলে যায়, যখন তারা গণের মধ্যে আলাদা।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (ফারাক নিজের মধ্যেই), ইংপৃ ২৯

দেল্যুজের পাঠ এটা। অ্যারিস্টটলের নিজে কী বলেছিলেন?

৩৫০ বিসিতে লেখা গ্রীক–এ, মেটাফিজিক্স ১০ (৩), ডাবলু ডি রস–এর ইংরেজি অনুবাদ গত শতাব্দীর বিশের দশকে। তার থেকে বাংলা –

কিন্তু ফারাক আর ভিন্নতা এক নয়। কোনোকিছু ভিন্ন হলে সেটি এবং তা যার থেকে ভিন্ন সেইটিকে কোনো নির্দিষ্ট কিছু সাপেক্ষে আলাদা হওয়ার দরকার নেই (কারণ অস্তিত্বশীল প্রত্যেকটি জিনিসই হয় ভিন্ন অথবা এক), কিন্তু যাদের ফারাক আছে, তাদের ফারাক আছে কোনো নির্দিষ্ট কিছুর থেকে এবং কোনো নির্দিষ্ট ব্যাপারের সাপেক্ষে, সেই কোনো এক অভেদের সাপেক্ষে তারা আলাদা। এবং এই অভেদ জিনিসটি গণ অথবা প্রজাতি; প্রত্যেকটি জিনিসই যাদের ফারাক আছে, তাদের হয় গণের মধ্যে ফারাক আছে, অথবা প্রজাতির মধ্যে ফারাক আছে। গণের মধ্যে – যদি জিনিসগুলোর কোনো সাধারণ বিষয়বস্তু (ইং. ম্যাটার) না থাকে, এবং একে অন্যের সাপেক্ষে তৈরি না হয়ে থাকে (অর্থাৎ, যদি তারা পৃথক বাচনের কাঠামোর মধ্যে থাকে); এবং প্রজাতির মধ্যে – যদি তাদের একই গণ হয় ('গণ' মানে ওই অভিন্ন জিনিসটি যা ফারাকওয়ালা জিনিসদুটির উভয়েরই আবশ্যক বিধেয়)।

অ্যারিস্টটল, মেটাফিজিক্স ১০ (৩)

আবার দেল্যুজের পাঠ–এ ফিরে আসা যাক।

এই শর্তে, সর্বোত্তম ফারাক কী? সর্বোত্তম ফারাক সর্বদা একটি বিরুদ্ধতা। কিন্তু বিরুদ্ধতার সমস্ত রূপের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে যথাযথ, সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ, সবচেয়ে যাকে বলে 'খাপে খাপ'? পারস্পরিক সাপেক্ষ শব্দগুলি তো একে অন্যের কথা বলে। স্ববিরোধ তো একটি বিষয়ীর কথা বলেই দিয়েছে, কিন্তু তা শুধু তার (বিষয়ীর) কেবলমাত্র টিঁকে যাওয়াকে অসম্ভব করে তোলার জন্য; এবং তার (বিষয়ীর) যে পরিবর্তনের মধ্যে মধ্যে দিয়ে সে বিষয়ী থাকতে শুরু করবে বা তার বিষয়ী থাকা বন্ধ হয়ে যাবে সেই পরিবর্তনকে সূচিত করার জন্য। খামতি আবার প্রকাশ করে একটি অস্তিত্বশীল বিষয়ীর সাপেক্ষে নির্দিষ্ট অক্ষমতা।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (ফারাক নিজের মধ্যেই), ইংপৃ ৩০

খামতি বা প্রাইভেসন ব্যাপারটা কী ? অ্যারিস্টটল প্রাইভেটিভকে একটি বিষয়ীর সাপেক্ষে দেখেছিলেন, এবং তাকে ইতিবাচক বা পজিটিভের উলটো হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন। –

প্রাইভেটিভ এবং পজিটিভ এই দুটিই একই বিষয়ীর সাপেক্ষ। যেমন, দৃষ্টি এবং অন্ধত্ব দুটিই চোখ সাপেক্ষ। ... যার সক্ষমতা আছে কোনো নির্দিষ্ট পারঙ্গমতা বা দখল–এর, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সেই পারঙ্গমতা বা দখলগুলো তার স্বাভাবিকভাবে থাকার কথা থাকা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে নেই, তখন ব্যাপারটাকে আমরা বলি খামতি। যার চোখই নেই, তাকে আমরা দৃষ্টিহীন বলি না। যার দাঁতই নেই, তাকে আমরা দন্তহীন বলি না। তাদেরকেই বলি, যাদের স্বাভাবিকভাবে ওই সময় চোখ বা দাঁত থাকার কথা ছিল।

ক্যাটেগরিজ ১০ ইংরেজি অনুবাদ ই এম এদঘিল, গত শতাব্দীর বিশের দশকে, ডবলু ডি রস–এর অ্যারিস্টটল অনুবাদ–এর অন্তর্গত।

আবার দেল্যুজের পাঠ–এ ফিরে আসা যাক।

বৈপরীত্য–ই কেবল প্রকাশ করে বিষয়ীর নিজেকে সারবত্তায় একই রেখে (বিষয়বস্তুতে বা গণ–এ) বিরুদ্ধিতাকে নিয়ে চলার ক্ষমতাকে। কিন্তু কোন অবস্থায় বৈপরীত্য প্রতিবার তার যথার্থতা ফারাকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারে? যতক্ষণ আমরা মূর্ত অস্তিত্বকে তার পদার্থে গ্রহণ করি, বৈপরীত্যগুলো, যা একে প্রভাবিত করে, সেগুলো হয়ে যায় দেহগত

পরিবর্তন, যা কেবলমাত্র বহিরঙ্গের ফারাকের নিরীক্ষামূলক, আকস্মিক ধারণা দেয় আমাদের।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (ফারাক নিজের মধ্যেই), ইংপৃ ৩০

বৈপরীত্য বিষয়ে অ্যারিস্টটলের নিজের বয়ান :

যেহেতু একে অন্যের থেকে কোনোকিছু আলাদা হতে পারে কম বা বেশি, তাই সেখানে আছে সর্বোচ্চ ফারাক, এবং এই সর্বোচ্চ ফারাককেই আমি বলি বৈপরীত্য। ... সর্বোচ্চ ফারাক কেবল সম্পূর্ণ ফারাক, তাই নয়। একে ছাপিয়ে আর কোনো ফারাক আমরা পেতেই পারিনা গণ অথবা প্রজাতির মধ্যে। কারণ, আগেই দেখানো হয়েছে যে যেকোনো কিছুর মধ্যে, এবং গণের বাইরের জিনিসগুলির মধ্যে কোনো 'ফারাক'–এর অস্তিত্ব নেই। এবং প্রজাতির মধ্যে ফারাক হয় এমন জিনিসগুলির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ফারাকই হলো সর্বোচ্চ ফারাক।

অ্যারিস্টটল, মেটাফিজিক্স ১০ (৪)

আবার দেল্যুজের পাঠ–এ ফিরে আসা যাক।

বিষয়ী থেকে আকস্মিকতাকে আলাদা করা যেতেই পারে, যেমন 'মানুষ' থেকে 'সাদা' আর 'কালো' কে করা যায়; অথবা তাদের আলাদা করা নাও যেতে পারে, যেমন 'পশু' থেকে 'পুরুষ' ও 'মহিলা'কে করা যায় না : এই অনুসারে ফারাককে বলা হবে, সাধারণ (কমিউনিস), অথবা নিজস্ব (প্রপ্রিয়া)। কিন্তু যতক্ষণ তা বিষয়বস্তু সম্পর্কিতভাবে বলা হচ্ছে, ততক্ষণ তা আকস্মিক হবে সর্বদা। তাই সারবস্তুতে অথবা আকারে বৈপরীত্য আমাদের ফারাক সম্পর্কে একটি ধারণা দেয় তা নিজেই সারমূলক। বৈপরীত্যগুলো এইক্ষেত্রে পরিবর্তন, যা এক বিষয়ীকে তার গণ সাপেক্ষে অদলবদল করে। গণ তাই কার্যত সারবস্তুর ফারাক দিয়ে বিভাজিত যা বৈপরীত্যের আকার নেয়, যেমন, 'পা যুক্ত' এবং 'ডানা যুক্ত'। সংক্ষেপে, গণ–এ বৈপরীত্য হলো যথাযথ এবং সর্বোচ্চ ফারাক। তার ওপরে এবং তার নিচে, ফারাক হতে চায় সরল ভিন্নতা এবং ধারণাগত এক–কে ছেড়ে প্রায় বেরিয়ে যায় : আন্তঃগণ ফারাক খুবই বড়ো, অসংযোগ্য কিছুদের মধ্যে যাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা বৈপরীত্যের সম্পর্কের মধ্যে ঢোকেই না; আর ব্যক্তিগত ফারাক খুবই ছোটো, অবিভাজ্য কিছুদের মধ্যে, যাদের মধ্যে আর কোনো বৈপরীত্য নেই।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (ফারাক নিজের মধ্যেই), ইংপৃ ৩০

তাহলে প্রজাতি কী দাঁড়ালো ? অ্যারিস্টটলের জবান :

এই হলো তাহলে 'প্রজাতিতে ভিন্ন' যাদের বৈপরীত্য আছে, একই গণের মধ্যে তারা এবং তারা অবিভাজ্য (এবং যে জিনিসগুলো প্রজাতিতে একই তাদের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই, তারা অবিভাজ্য); আমরা বলি, 'অবিভাজ্য অস্তিত্ব', কারণ বিভাজনের প্রক্রিয়ায় বৈপরীত্যগুলির আবির্ভাব হয় মধ্যবর্তী পর্যায়ে, শেষ পর্যন্ত এসে আমরা পৌঁছই অবিভাজ্যে।

অ্যারিস্টটল, মেটাফিজিক্স ১০ (৮)

আবার দেল্যুজের পাঠে ফেরা যাক।

খ) বিশেষণাত্মক, বিধেয়

অন্য দিকে, সত্যিই মনে হয়, নির্দিষ্ট ফারাক যেন বা একটি সমন্বিত ধারণা এবং তা একটি জৈবিক প্রতিরূপের সমস্ত শর্ত পূরণ করে। এটা বিশুদ্ধ কারণ এটা বিধিবদ্ধ, সহজাত কারণ এটা সারবস্তুর ব্যাপার। এটা গুণগত, এবং গণ বলতে যতটা সারবস্তুকে বোঝানো হয়, নির্দিষ্ট ফারাক তখন খুব বিশেষ একটা গুণ 'সারবস্তু অনুসারে', সারবস্তুর নিজেরই একটা গুণ। এটা সাংশ্লেষিক, যেহেতু প্রজাতির নির্ধারন হলো গঠন। এবং নির্দিষ্ট ফারাকটিকে বাস্তবে তার গণ–টির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে, যে গণের মধ্যে সে এ পর্যন্ত কেবল অন্তর্ভুক্ত–ই ছিল। নির্দিষ্ট ফারাকটিকে মধ্যস্থতা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট ফারাকটি নিজেই মধ্যস্থতা, মধ্যম পুরুষ। নির্দিষ্ট ফারাকটি উৎপাদনশীল, যেহেতু গণ ফারাকগুলিতে বিভাজিত, তা নয়, ফারাকগুলি দিয়ে বিভাজিত, যা থেকে আনুষঙ্গিক প্রজাতির উদ্ভব হয়। এই কারণেই এটি সবসময় একটি কারণ, একটি বিধিবদ্ধ কারণ : সরলরেখার নির্দিষ্ট ফারাক হলো ন্যুনতম দূরত্ব, কালো রঙের নির্দিষ্ট ফারাক হলো চাপ দেওয়া, সাদা রঙের ক্ষেত্রে তা আলগা হওয়া। তাই তা এই অদ্ভুত ধরনের বিধেয়, যেহেতু তা প্রজাতির ওপর বিশেষিত, কিন্তু একই সাথে সে প্রজাতির মধ্যে গণের বিশেষণ ঘটায় এবং যে প্রজাতির মধ্যে তাকে বিশেষিত করা হয়েছে, সে প্রজাতিটিকেই সে গঠন করে। এইরূপ সংশ্লেষী এবং গঠনমূলক বিধেয়, যা যত না বিশেষিত করে তার থেকে বেশি বিশেষণাত্মক, উৎপাদনের একটি সত্যিকারের নিয়ম, এর আরও একটি অন্তিম বৈশিষ্ট্য আছে : তা হলো, এ যা বিশেষিত করে তাকে বহন করে নিয়ে চলে নিজের সাথে। ফলতঃ সারবস্তুর গুণ (অর্থাৎ নির্দিষ্ট ফারাক) যথেষ্ট বিশেষ কিছু, গণটিকে ভিন্ন কোনো একটা কিছু বানিয়ে দেওয়ার জন্য, এবং কেবলমাত্র অন্য গুণের কিছু না বানিয়ে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (ফারাক নিজের মধ্যেই), ইংপৃ ৩১

নির্দিষ্ট ফারাক–এর গুণবাচকতা নিয়ে অ্যারিস্টটলের স্পষ্ট কথা :

কারণ একটি গণ সবসময় বিভাজিত ফারাকগুলি দিয়ে, যেগুলি একটি বিভাজনের সমশ্রেণিভুক্ত সদস্য, যেমন, এই শব্দগুলো, 'হাঁটতে পারা', 'উড়তে পারা', 'জলচর', 'দ্বিপদ'। ... একটি নির্দিষ্ট ফারাক, যদি গণটির সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তাহলে তা সবসময় একটি প্রজাতিকে চিহ্নিত করে।' ... 'দেখো এটাও, যে ফারাক কি তার সংজ্ঞাত বস্তুটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আকস্মিকভাবে। কারণ, ফারাক কখনো একটা আকস্মিক বিশেষণ হতে পারে না, গণটির তুলনায়। কারণ কোনো জিনিসের ফারাক একই সাথে তার মধ্যে আছে এবং নেই, দুটো হতে পারে না।

অ্যারিস্টটল, টপিকস, ৬ (৬)

ফের দেল্যুজে ফেরা যাক।

গ) ফারাকের পরিবহণ : নির্দিষ্ট ফারাক থেকে অবিভাজ্য, ব্যক্তিগত ফারাকে

অর্থাৎ গণের প্রকৃতিই হলো নিজেদের মধ্যে একই থাকা এবং তাদের বিভাজিত করে যে ফারাকগুলি সেগুলির মধ্যে ভিন্ন হয়ে ওঠা। ফারাক নিজের মধ্যে নিয়ে চলে গণ–কে এবং মধ্যবর্তী সমস্ত ফারাকগুলিকে। প্রজাতির নির্ধারণ ফারাককে যুক্ত করে বিভাজনের পরপর স্তরগুলির মধ্যেকার ফারাকগুলির সঙ্গে, যেনবা ফারাকের পরিবহণ, ফারাকের ফারাক; যতক্ষণ না একটি অন্তিম ফারাক, একটি নিম্নতম প্রজাতির, তা একটি বেছে নেওয়া দিকে ঘনীভূত হয় সারবস্তুটি এবং তার ধারাপ্রবাহিত গুণ একসঙ্গে নিয়ে; সেগুলোকে জড়ো করে একটি আগাম আন্দাজ করা ধারণার নিচে; এবং তাদের মাটিতে দাঁড় করায় ভাবী সংজ্ঞা সহ; এভাবে সে হয়ে ওঠে অনন্য কিছু একটা এবং অবিভাজ্য (আটোমন, আদিয়াফোরোন, এইদস)। সুতরাং এইভাবে প্রজাতির নির্ধারণ নিশ্চিত করে ধারণাটির উপলব্ধির মধ্যে সংসক্তি এবং ধারাবাহিকতা।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (ফারাক নিজের মধ্যেই), ইংপৃ ৩১

অ্যারিস্টটল–এর মতে, অধস্তন গণ থেকে ঊর্ধতন গণ–এ ফারাক পরিবাহিত হয়। অ্যারিস্টটল ক্যাটেগরিজ–এ বলেন :

যখন একটি জিনিস আরেকটি জিনিসের বিধেয়, সেক্ষেত্রে বিধেয়–র যা কিছু বিধেয়যোগ্য, তা তার বিষয়ীরও বিধেয়যোগ্য। তাই, কোনো ব্যক্তি মানুষ হলো 'মানুষ'–এর বিধেয়, আবার 'মানুষ' হলো 'পশু'র বিধেয়।

তাই ব্যক্তি মানুষের যা কিছু বিধেয়যোগ্য, তা 'পশু'রও। কারণ ব্যক্তি মানুষ 'মানুষ' এবং 'পশু' – উভয়ই। যদি যদি গণগুলি আলাদা হয় এবং পাশাপাশি (কো–অর্ডিনেট) হয়, তখন তাদের ফারাকগুলোও আলাদা আলাদা। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, 'পশু' গণ এবং 'জ্ঞান' গণ। 'পশু'র ফারাকগুলি হলো 'পা–যুক্ত', 'দ্বিপদ', 'পাখাযুক্ত', 'জলচর'। 'জ্ঞানের' প্রজাতিগুলিকে কিন্তু এইসব ফারাক দিয়ে আলাদা করা যাবে না, জ্ঞানের একটি প্রজাতি আরেকটি প্রজাতি থেকে ভিন্ন 'দ্বিপদ' হবার জন্য নয়। কিন্তু যখন একটি গণ আরেকটি গণের অধস্তন, তখন তাদের একই ফারাক নিয়ে চলার বাধা কিছু নেই : যেহেতু নিম্নতর শ্রেণি উচ্চতর শ্রেণির বিধেয়, তাই বিধেয়দের ফারাকগুলি বিষয়ীরও ফারাক।

অ্যারিস্টটল, ক্যাটেগরিজ

আবার দেল্যুজের পাঠে ফেরা যাক।

ঘ) ফারাকটি 'সর্বোত্তম', গণের একত্বের আওতার মধ্যে

ফিরে আসা যাক এই বাক্যটিতে – 'সর্বোত্তম ফারাক'। এতক্ষণে বোঝা গেছে নিশ্চয়ই যে নির্দিষ্ট ফারাক কেবলমাত্র আপেক্ষিক অর্থে সর্বোচ্চ ফারাক। পরম অর্থে বললে, স্ববিরোধ বৈপরীত্যের চেয়ে বড়ো। এবং সবার চেয়ে বড়ো কথা, গণগত ফারাক নির্দিষ্ট ফারাকের চেয়ে বড়ো। যেভাবে অ্যারিস্টটল ফারাকের তফাত করেছেন বৈচিত্র অথবা ভিন্নতার থেকে, তা রাস্তাটা দেখিয়েই দিয়েছে : কেবলমাত্র একটি ধারণার ধরে নেওয়া একত্ব–র সাপেক্ষে নির্দিষ্ট ফারাককে সর্বোত্তম বলা যায়। এছাড়াও, গণ–এর ধারণার মধ্যে যে একত্বর রূপটি আছে, তার সাপেক্ষে ফারাক বিরোধিতা অবদি যায়, একে বৈপরীত্য অবদি ঠেলে দেওয়া যায়। নির্দিষ্ট ফারাক সুতরাং কোনোভাবেই একটি সার্বজনীন ধারণাকে প্রতিভাত করে না যা ফারাকের মধ্যের সমস্ত অনন্যতাগুলিকে ও বাঁকগুলিকে ধরতে পারে (অর্থাৎ, একটি আইডিয়া), বরং তা একটি মুহুর্তকে নির্দেশ করে যেখানে ফারাক সাধারণভাবে ধারণাটির সঙ্গে কেবলমাত্র মিটমাট করে নেয়। তাই অ্যারিস্টটলের ফারাকের ফারাক শুধু একটি মেকি পরিবহণ : এটা কখনওই দেখায় না যে ফারাক তার প্রকৃতি পরিবর্তন করছে, আমরা কখনোই এর মধ্যে আবিষ্কার করি না ফারাকের ফারাককারীকে, যারা, তাদের নিজ নিজ আপতকালে, সবচেয়ে সার্বজনীন–এর সাথে এবং সবচেয়ে অনন্য–র সাথে সম্পর্কিত। নির্দিষ্ট ফারাক কেবল দেখায় সর্বোততভাবে আপেক্ষিক এক বৃহত্তমকে – গ্রীক চক্ষুর জন্য একটি নিবাস বিন্দু – বিশেষভাবে সেই গ্রীক চক্ষুর জন্য যা দেখে গড়, এবং যা ডায়নিসিয়ান পরিবহণ ও রূপান্তরের বোধটা হারিয়ে ফেলেছে।

ঙ) ফারাকের স্বতন্ত্র ধারণার বদলে ধারণার মধ্যে ফারাককে খচিত করা

এখানে আমরা একটা নীতিকে দেখছি যা একটা ভুলবোঝাবুঝির পেছনে রয়েছে এবং যা ফারাকের দর্শনের পক্ষে ধ্বংসাত্মক : ফারাকের একটি স্বতন্ত্র ধারণা দেওয়াকে গুলিয়ে ফেলা হয় সাধারণভাবে ধারণার মধ্যে ফারাককে খচিত করে – ফারাকের ধারণার নির্ধারণকে গুলিয়ে ফেলা হয় একটা অনির্দেশ্য ধারণার একত্বর মধ্যে ফারাককে খচিত করে। এ হলো শুভলগ্নে হাতের ভোজবাজি (এবং হয়ত তারপর বাকি সবকিছু : ফারাকের বিরোধিতার অনুগত হওয়া, তুলনার অনুগত হওয়া, উপমার অনুগত হওয়া, মধ্যস্থতার সমস্ত দিকের অনুগত হওয়া।) ফারাক তখন একটি ধারণাকে বুঝতে একটি বিধেয়-র চেয়ে বাড়া আর কিছু হতে পারে না। অ্যারিস্টটল ধারাবাহিকভাবে আমাদের মনে করিয়ে দেন নির্দিষ্ট ফারাকের এই গুণবাচক চরিত্রের কথা। কিন্তু তিনি বাধ্য হন একে এক আশ্চর্য ক্ষমতা দিতে, বিশেষিত হওয়ার সমতুল্য বিশেষিত করার ক্ষমতা যেমন, অথবা, গণকে ততটা বদলানোর যতটা পরিবর্তন করা যায় তার গুণকে। যে পথগুলোতে নির্দিষ্ট ফারাককে মনে হয় তা স্বতন্ত্র ধারণার শর্তগুলি পূরণ করছে (বিশুদ্ধতা, অন্তর্বর্তীতা, উৎপাদনশীলতা, পরিবহণযোগ্যতা ...) সেগুলোকে ওই মৌলিক ভুলবোঝাবুঝির কারণে তখন দেখায় ভ্রান্তিমূলক, এমনকি পরস্পরবিরোধী।

নির্দিষ্ট ফারাক তাই বৃহত্তর ফারাকের থেকে ছোটো, বৃহত্তর ফারাক গণগুলির নিজেদেরই বিষয়। একই কথা প্রযোজ্য জীববিদ্যার শ্রেণীবিভাজনের ক্ষেত্রেও। তা বড়ো বর্গের তুলনায় খুব ছোটো হয়ে যায়; কোনো সন্দেহ নেই যে এটি বিষয়বস্তুগত ফারাক নয়, কিন্তু তথাপি বিষয়বস্তুর 'মধ্যেকার' সরল ফারাকগুলি, কাজ করে ছোটো ও বড়োর মধ্যে। নির্দিষ্ট ফারাক যদি সর্বোচ্চ এবং যথাযথ হয়, তা কিন্তু কেবল অনির্দেশ্যে এক ধারণার একত্ব-র (গণ) শর্তের অধীন।

২) গণগত ফারাক

ক) নির্দিষ্ট ফারাকের মতো সাধারণ ধারণার সাপেক্ষ নয়, সবচেয়ে সাধারণ ধারণাগুলির বৈচিত্র্যের মধ্যে কাজ করে

বিপরীতে, আন্তঃগণ ফারাকের মতো চরম নির্ধারণযোগ্য ধারণার তুলনায় তা তুচ্ছ। কারণ পরেরটি তো এই শর্তাধীন নয় যে তারা একই অভিন্ন ধারণার অথবা সাধারণ গণের অন্তর্গত। মনে করো, অস্তিত্ব কেন নিজেই গণ নয় : অ্যারিস্টটল বলেন, এর কারণ হলো ফারাকগুলো তাই। (গণ-কে তাই নিজেদের ফারাকগুলোর মধ্যে নিজেকে বিশেষিত করতে

সক্ষম হতে হয় : যেন বা পশুদের একসময় মানুষ প্রজাতির একজন বলে বলা হতো, কিন্তু অন্য এক সময় 'যৌক্তিক' ফারাকটির কারণে তা অন্য প্রজাতি গঠন করলো ...)।

তাই নির্দিষ্ট ফারাকের চরিত্র থেকে ধার করে যুক্তি সাজানো হয়, যা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় যে গণের ফারাক অন্য চরিত্রের। সবকিছু এমন করে ঘটে, যেন ওখানে দুটো 'যুক্তি', প্রকৃতিতে আলাদা, কিন্তু একে অন্যের মধ্যে মিলেমিশে আছে : একটি হলো প্রজাতির যুক্তি, যার কথা আমরা ভাবি ও বলি, গণের মতো সাধারণ ধারণার একার্থতা বা একত্ব–র শর্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছে; আর একটা হলো গণের যুক্তি, যার সম্পর্কে ভাবা হয় এবং বলা হয়, যা ওই শর্ত থেকে মুক্ত, অস্তিত্বের দ্ব্যর্থতা–র মধ্যে, যেমন সর্বাপেক্ষা সাধারণ ধারণাগুলির বৈচিত্র্যের মধ্যে, কাজ করে। যখন আমরা একার্থ–র কথা বলি, তখনও কি আমাদের মনের মধ্যে দ্ব্যর্থ কথা বলে না? আমাদের কি স্বীকার করে নেওয়া এখানে উচিত হবে না যে চিন্তার মধ্যে এক প্রকারের ভাঙন কাজ করছে? যার আরেকটি (অ–অ্যারিস্টটলীয়) পরিবেশে ছড়িয়ে যেতে আটকাবে না? কিন্তু সবার ওপরে, এখানে ফারাকের দর্শনের কি একটা নতুন সুযোগ এসে গেল না? ফারাককে সম্পূর্ণ আপেক্ষিক সর্বোচ্চতে পৌঁছে দেওয়ার শর্তগুলো থেকে একবার মুক্ত হয়ে ফারাকের দর্শন কি এবার কোনো পরম ধারণার দিকে নিয়ে যাচ্ছে না?

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (ফারাক নিজের মধ্যেই), ইংপৃ ৩২–৩৩

'যুক্তি' কি? অ্যারিস্টটলের মতে, কথা থেকে তিন ধরনের প্ররোচনা হতে পারে। প্রথমটি 'ইথোস', নির্ভর করে বক্তার ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর। দ্বিতীয়টি হলো 'প্যাথোস', যা কিনা শ্রোতাদের একটি নির্দিষ্ট মনোভঙ্গীর মধ্যে নিয়ে যাওয়া। তৃতীয়টি 'লোগোস', যা কিনা বক্তার যুক্তির ওপর নির্ভর করে। অ্যারিস্টটল–এর রেটোরিক–এ আছে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা। 'লোগোস' হলো শ্রোতার যুক্তিবোধের কাছে আবেদন। 'লোগোস' হলো 'যুক্তি'।

একার্থক ও দ্ব্যর্থক (ইউনিভোকাল ও ইকুইভোকাল) – অ্যারিস্টটলের ক্যাটেগরি শুরুই হচ্ছে একার্থক এবং দ্ব্যর্থক–এর ধারণার মধ্যে দিয়ে।

কোনোকিছুর নামকরণ 'দ্ব্যর্থক'ভাবে করা হয়েছে বলা হবে, যখন, একটি সাধারণ নাম থাকলেও, অবস্থা ভেদ–এ তার সংজ্ঞা পালটে যায়। তাই একজন সত্যিকারের মানুষ এবং একটি ছবির মানুষ, দুজনকেই 'প্রাণী' বলা হলে, সেক্ষেত্রে এই নামকরণ দ্ব্যর্থক, কারণ এদের একটি সাধারণ নাম (প্রাণী) রাখা হলেও একেকজনের ক্ষেত্রে তার সংজ্ঞা একেকরকম।

কেউ যদি সংজ্ঞা দিতে চায়, কেন প্রত্যেকটাই প্রাণী, তাহলে একটার ক্ষেত্রে সে যা বলবে, তা ওই একটার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

অ্যারিস্টটল, ক্যাটেগরিজ

অন্য দিকে কোনোকিছুর নামকরণ করা হয়েছে ‘একার্থক’ ভাবে বলা হবে, যখন নাম ও তার সংজ্ঞা একই। একজন মানুষ আর একটি ষাঁড় – দুটিই ‘প্রাণী’। এবং এদের একার্থকভাবে নামকরণ, কারণ শুধু নাম নয়, সংজ্ঞাও উভয়ক্ষেত্রে একই : কারণ কেউ যদি বলতে চায় কেন প্রত্যেকটিই প্রাণী, তাহলে দুটি ক্ষেত্রেই তাকে একই কথা বলতে হবে।

আবার দেল্যুজ।

খ) অস্তিত্বের শ্রেণিবিভাজন : উপমা ভিত্তিক

না, এসব কিছুই ঘটেনি অ্যারিস্টটলের ক্ষেত্রে। ঘটনা হলো, অ্যারিস্টটলিয়ান বোধ–এ গণগত বা শ্রেণীবিভাগ–গত ফারাক ফারাকই রয়ে গেছে, তা সরল বৈচিত্র অথবা ভিন্নতায় পর্যবসিত হয়নি। একটা অভিন্ন অথবা সাধারণ ধারণা এইভাবে রয়েই যায়, যদিও খুব বিশেষভাবে। এই অস্তিত্বের ধারণাটি সামুহিক নয়, যেমন গণ তার প্রজাতিগুলির সম্পর্কে, বরং কেবল বন্টনমূলক এবং উঁচুনিচু : এটার (অস্তিত্বের ধারণাটির) নিজস্ব কোনো অন্তর্বস্তু নেই, তাকে যারা বিশেষিত করে সেই বিধিমাফিক আলাদা শব্দগুলোর আনুপাতিক অন্তর্বস্তু আছে কেবল। এই শব্দগুলোর যে অস্তিত্বের সঙ্গে সমান সম্পর্ক হতে হবে, তার কোনো আবশ্যকতা নেই, প্রত্যেকের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কটি প্রত্যেকের আভ্যন্তরীন হলেই চলবে। অস্তিত্বের ধারণার দুটি চরিত্র আছে – একটি বন্টনমূলক সাধারণ বোধ মাত্র, আর একটা উঁচুনিচু প্রাথমিক বোধ। যদিও তা দেখিয়ে দেয়, একার্থক প্রজাতিগুলির সঙ্গে সম্পর্কে গণের যা ভূমিকা, শ্রেণীবিভাগের (অর্থাৎ গণগত বিভাগের) সঙ্গে সম্পর্কে অস্তিত্বের তা নেই। তারা আরও দেখায়, অস্তিত্বের দ্ব্যর্থতা খুবই বিশিষ্ট : উপমার একটা বিষয়।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (ফারাক নিজের মধ্যেই), ইংপৃ ৩৩

উপমা সম্পর্কে স্ট্যানফোর্ড এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফিলোজফি –

উপমার মধ্যযুগের তত্ত্বগুলো তিনটি ক্ষেত্রের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি। লজিক, থিওলজি এবং মেটাফিজিক্স। লজিসিয়ানরা বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন সেই সব শব্দগুলোর ব্যবহার নিয়ে যেগুলোকে একাধিক ভাব বোঝাতে ব্যবহার করা যায়, এবং তারা সম্পূর্ণ পৃথক ভাবও হতে পারে, আবার সম্পর্কিত ভাবও হতে পারে। থিওলজিয়ানরা ভাবিত

ছিলেন ঈশ্বর সম্পর্কিত ভাষার ব্যবহার নিয়ে। কেমন করে আমরা একটি উত্তরণশীল, সম্পূর্ণভাবে সরল আত্মিক অস্তিত্বের বিষয়ে কথা বলতে পারি, ব্যবহৃত শব্দগুলোর ভাবকে অদলবদল না করে? মেটফিজিসিয়ানরা বাস্তবতা সম্পর্কে কথা বলা কীভাবে যাবে তাই নিয়ে ভাবিত ছিলেন। কেমন করে আমরা বিষয়বস্তু (যেমন, সক্রেটিস) এবং আকস্মিকতা (যেমন, সক্রেটিসের দাড়ি) দুটিই অস্তিত্বশীল এটা বলব, যখন একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল? কেমন করে আমরা বলব যে ঈশ্বর এবং সৃষ্টি দুটিই আছে, যখন একটি অন্যটিকে সৃষ্টি করেছে। মধ্যযুগের চিন্তাবিদরা এই তিনটি সমস্যার মোকাবিলা করতে প্রেক্ষাপটের তোয়াক্কা না করে শব্দের তিন ধরনের বিভাজনের তত্ত্ব তৈরি করলেন। কিছু বিশুদ্ধ একার্থক (সবসময় একই ভাব বোঝায়), কিছু বিশুদ্ধ দ্ব্যর্থক (ভিন্ন ভাব বোঝায় ভিন্ন ক্ষেত্রে), এবং কিছু উপমাবাচক (সম্পর্কিত ভাব বোঝাতে ব্যবহার হয়)।

অ্যারিস্টটলের উপমা বা অ্যানালজি সম্পর্কে দেল্যুজের পাদটীকা :

আমরা জানি অ্যারিস্টটল নিজে অস্তিত্ব সম্পর্কে বলার সময় কখনো উপমার কথা বলেননি। তিনি শ্রেণিবিভাজনগুলো নির্ধারণ করেছিলেন এক-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ভাবে (অ্যারিস্টটলের ব্যবহৃত গ্রিক শব্দযুগলের 'প্রোজ হেন' এর অর্থ 'এক-এর সঙ্গে সম্পর্কিত') এবং কোনো সন্দেহ নেই, ওই এক থেকে দূরত্বের ক্রম অনুসারে (অ্যারিস্টটলের ব্যবহৃত গ্রিক শব্দ 'এফেক্সেস' এর অর্থ দুটি জিনিসের মধ্যবর্তী ক্রম। মোটামুটি কাছাকাছি ইংরেজি হলো 'সাকসেসিভ'। মোটামুটি কাছাকাছি বাংলা শব্দ হলো 'ধাপে ধাপে')। এই দুটি হলো দুটি ক্ষেত্র, বিশুদ্ধ দ্ব্যর্থকতা ছাড়া, যেখানে সাধারণ গণ ছাড়াই 'ফারাক' আছে। (পরফিরি-র গাছের ছবি দ্রষ্টব্য। সেখানে অস্তিত্বের শ্রেণিবিভাজন করা হয়েছে বিষয় এবং তার পরিমাণ, তার গুণ ইত্যাদি।) 'প্রোজ হেন' কথাটা বলা হয় একটি অনন্য শব্দের সাপেক্ষে। এটা যেন অনেকটা সাধারণ বোধ এর মতো, কিন্তু এই সাধারণ বোধ কোনো গণ নয়, কারণ এটা কেবল একটি বিতরণমূলক ঐক্য তৈরি করে (প্রচ্ছন্ন এবং তালগোল পাকানো) এবং যেমন আমরা গণে পাই সেরকম সামুহিক, প্রকট এবং স্বতন্ত্র ঐক্য নয়। তাই পণ্ডিতেরা যখন 'প্রোজ হেন' কথাটার মানে করেন, 'সমানুপাতিকতার উপমা', তখন তারা ঠিকই করেন। ফলত: এই উপমাকে কখনোই ভীষণ গাণিতিকভাবে বুঝলে চলবে না। এবং এটি সম্পর্কের কোনো সমানতা আগে থেকে ধরে নেয় না। এটা নিজেকে সংজ্ঞাত করে যা দিয়ে সেটা সম্পূর্ণ আলাদা কিছু – সম্পর্কের এক

অন্তর্বর্তীতা দিয়ে : প্রত্যেকটা শ্রেণির অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্ক সেই শ্রেণির অন্তর্বর্তী, তার নিজের কারণেই প্রতিটা শ্রেণির আছে ঐক্য এবং অস্তিত্ব, তার নিজস্ব চরিত্রের গুণেই। এই বিতরণমূলক চরিত্র অ্যারিস্টটল চমৎকার তুলে ধরেছিলেন, যখন তিনি শ্রেণিগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন ডায়াএরেসিস (বিচ্ছিন্নতা) বলে। তদুপরি, ইদানিংকালের কিছু ব্যাখ্যা সত্ত্বেও, যেভাবে 'অস্তিত্ব'-তে বিতরণ করা হয়েছে, সেভাবে অস্তিত্ব-র ভাগাভাগি সত্যিই আছে। যদিও, প্রোজ হেন-এ অনন্য শব্দটা শুধু সাধারণ বোধ রূপে অস্তিত্ব নয়, তা এরই মধ্যে প্রাথমিক বোধ রূপে বস্তু। যেখান থেকে তা গড়িয়ে যাচ্ছে এফেক্সেস-এর আইডিয়ার দিকে, একটি উঁচুনিচুভাব-এর দ্যোতনা দিয়ে। এখানে পণ্ডিতরা 'সমানুপাতের উপমা'-র কথা বলবে : এটা আর একটি বিতরণমূলক ধারণা নেই, যা বিধিবদ্ধভাবে সম্পর্কিত হয় আলাদা আলাদা শব্দগুলির সঙ্গে, বরং তা একটি সারিবদ্ধ ধারণা, যা বিধিবদ্ধভাবে-বিশিষ্টভাবে সম্পর্কিত হয় একটি মূল শব্দের সঙ্গে, এবং অন্যদের সঙ্গে তুলনায় কম মাত্রায়। অস্তিত্ব প্রথমত, কার্যক্ষেত্রে, সমানুপাতিকতার উপমা; কিন্তু তা কি 'বস্তুতপক্ষে' (এখানে ভারচুয়ালমঁ বা ভারচুয়ালি-র বাংলা করা হয়েছে বস্তুতপক্ষে) একটি সমানুপাতের উপমা-ও তুলে ধরে না?

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (ফারাক নিজের মধ্যেই), পাদটীকা

অস্তিত্বের উপমাবাচক শ্রেণিবিভাজন, অর্থাৎ 'প্রোজ হেন' এবং 'এফেক্সেস' নিয়ে অ্যারিস্টটল নিজে কী বলেছেন ? মেটাফিজিক্স ৪(২)-এ আছে –

একটি 'অস্তিত্ব' বলতে অনেক ভাব প্রকাশ করা যায়, কিন্তু সবগুলিই একটি কেন্দ্রীয় বিন্দুর সঙ্গে সম্পর্কিত, একটি নির্দিষ্ট ধরনের জিনিস, এবং 'অস্তিত্ব' দ্ব্যর্থক নয়। যাকিছু স্বাস্থ্যকর, তা স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। একটাকে স্বাস্থ্যকর বলা হয় কারণ তা হয়ত স্বাস্থ্যরক্ষাকারী ভাববাচক কিছু, অন্যটাকে স্বাস্থ্যকর বলা হয় কারণ তা হয়ত স্বাস্থ্য উৎপাদনকারী ভাববাচক কিছু, অন্য আরেকটা হয়ত স্বাস্থ্যের কোনো উপসর্গ ভাববাচক, অন্য কোনোটা হয়ত স্বাস্থ্যসক্ষমতার ভাববাচক। এবং যা কিছু আরোগ্যকারী তা চিকিৎসা সম্পর্কিত। একটাকে বলা হয় আরোগ্যকারী কারণ তাতে এই গুণটা আছে, আরেকটাকে বলা হয় কারণ হয়ত সেটা প্রাকৃতিকভাবেই চিকিৎসায় সক্ষম, আরেকটাকে বলা হয় কারণ হয়ত সেটা চিকিৎসার একটি অপেক্ষক। এইভাবে অন্যান্য শব্দের ব্যবহারও আমরা দেখতে পাব। তাই একটা অস্তিত্বের হরেক ভাব থাকে, কিন্তু সবগুলিরই একটা সূচনা-বিন্দু আছে; কোনো একটা অস্তিত্ব মানে তা বিষয়, অন্য মানে-তে তা ওই বিষয়ের অনুভূতি, অন্য মানে-তে ওই বিষয়ের হয়ে

ওঠার প্রক্রিয়া, অথবা বিষয়টির গুণ বা ঘাটতি বা ধ্বংস, অথবা বিষয়টির উৎপাদক বা গঠনকারী, অথবা সেইসব জিনিস যা ওই বিষয়ের সম্পর্কিত, অথবা ওই বিষয়ের নিজেরই নেতি। এই কারণেই আমরা বলি যে এমনকি না–অস্তিত্বও অনস্তিত্ব।

তাই যেমন আছে একটা বিদ্যা যা সমস্ত স্বাস্থ্যকর জিনিস নিয়ে কারবার করে, তেমনি অন্যান্য বিষয় ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কেবল একটি সাধারণ ধারণা আছে যা কিছুর তাদের ক্ষেত্রেই একটা বিদ্যা নয়, একটা সাধারণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত জিনিসগুলোও ওই একটি বিদ্যার অন্তর্গত; কারণ তাদেরও একভাবে একটি সাধারণ ধারণা আছে। তাই যেহেতু একটাই বিদ্যা, তাই এটা পরিষ্কার যে ওই একটা বিদ্যা কাজ ওই অস্তিত্বগুলিকে অস্তিত্ব হিসেবেই চর্চা করাটাও। কিন্তু সবজায়গাতেই বিদ্যা প্রাথমিকটা নিয়েই মূলতঃ কাজ করে, এবং তার ওপরেই অন্য জিনিসগুলো নির্ভর করে, তার কারণেই অন্যরা নামকরণ পায়। যদি সেটা হয়, ওই বিষয়, তাহলে ওই বিষয়গুলোর মূলনীতি এবং কারণগুলোকেই দার্শনিককে আয়ত্ব করতে হবে।

...

এবং দর্শনের ততগুলো অংশ আছে, যতগুলো ধরনের বিষয় রয়েছে। তাই তাদের মধ্যে একটাকে হতেই হবে প্রথম দর্শন। তার পরে আসবে আরেকটা। যেহেতু অস্তিত্ব মানেই তা কোনো না কোনো গণের অন্তর্গত; সেহেতু সংশ্লিষ্ঠ বিদ্যাগুলোও গণগুলোর মধ্যে পড়ে যাবে। দার্শনিক তো গণিতবিদ, যেভাবে এই শব্দটাকে ব্যবহার করা হয়। গণিতেরও অংশ আছে, সেখানেও আছে একটি প্রথম বিদ্যা, তারপর দ্বিতীয় বিদ্যা, এইভাবে ধাপে ধাপে বিদ্যাগুলো গণিতের চৌহদ্দির মধ্যেই।

...

সমস্ত কিছুই হয় বৈপরীত্য, অথবা বৈপরীত্য দিয়ে গঠিত। এবং একত্ব ও বহুত্ব হলো সমস্ত বৈপরীত্যর সূচনা–বিন্দুগুলো। এসবগুলোই একটা বিদ্যার অন্তর্গত, তা সেগুলোর একটা অর্থ থাকুক বা না থাকুক। মনে হয়, সত্যিটা হলো, তাদের একটা অর্থ থাকে না। তথাপি যদি 'একটি'র অনেক অর্থ থাকে, অন্য অর্থগুলো প্রাথমিক অর্থটির সঙ্গে সম্পর্কিত হবে (এবং একই কথা প্রযোজ্য বৈপরীত্যগুলোর ক্ষেত্রেও), যদিও অস্তিত্ব এবং এক কোনো সার্বজনীন কিছু নয় এবং তারা সর্ব মুহুর্তে একই নয় অথবা ওই বিশেষ মুহুর্তের থেকে বিচ্ছিন্নযোগ্য নয় (বাস্তবে সম্ভবত তা নয়; এক সার্বজনীন হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ সাপেক্ষে, আর কিছু ক্ষেত্রে

সারিবদ্ধভাবে পর পর আসার কারণে)। এবং এই কারণে সে ভৌগলিক পরিমাপের বিষয় নয় যা খুঁজবে বৈপরীত্য কী বা সম্পূর্ণতা কী বা এক কী বা অস্তিত্ব কী বা একরকম কী বা অন্যরকম কী, কিন্তু কেবল এইসব ধারণাগুলি সূচনা-বিন্দুর আগে থেকে ধরে নিতে হয়।

অ্যারিস্টটল, মেটাফিজিক্স ৪ (২)

আবার দেল্যুজের মূল পাঠ-এ ফেরা যাক।

গ) বিচারের উপমা

এখন, আমরা যদি জানতে চাই, কোন মুহূর্তটি সক্ষম, ধারণাটিকে শব্দগুলোতে ছকবদ্ধ করতে অথবা সেই বিষয়ীগুলোতে করতে যেগুলিকে তা প্রত্যয়িত করে; পরিষ্কারভাবেই সেটি হলো বিচার। কারণ বিচারের ঠিক দুটি অত্যাবশ্যক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে, এবং কেবল দুটিই : বন্টন, বিচার যা নিশ্চিত করে ধারণার ভাগাভাগির মধ্যে দিয়ে; এবং উঁচুনিচুকরণ, যা সে নিশ্চিত করে বিষয়ীগুলোর পরিমাপের মধ্যে দিয়ে। প্রথমটি বিচারের যে পারঙ্গমতাকে দেখায়, যাকে আমরা বলি সাধারণ বোধ। পরেরটি বিচারের যে পারঙ্গমতাটিকে দেখায়, তাকে বলে সু বোধ (অথবা প্রাথমিক বোধ)। এই দুটো মিলিয়েই তৈরি হয় সঠিক পরিমাপ, বিচারের মূল্যের ন্যায় 'ন্যায়বিচার'। এই ভাবে শ্রেণিবিভাজনের সমস্ত দর্শন বিচারের মডেলটিকে নিয়ে নেয় – যেমন আমরা দেখি কান্ট-এ, এবং একই জিনিস দেখি হেগেল-এও। বিচারের উপমা যদিও, তার সাধারণ বোধ এবং প্রাথমিক বোধ-এর হাত ধরে, ধারণার একত্বকে টিকিয়ে রাখে, হয় প্রচ্ছন্নে এবং বিভ্রান্ত ভাবে, অথবা ভারচুয়াল রূপে।

উপমা নিজেই বিচারের মধ্যে একত্বের অনুরূপ। উপমা হলো বিচারের সার। কিন্তু বিচারের মধ্যে উপমা হলো ধারণার একত্বের অনুরূপ। এইজন্য আমরা আশা করতে পারিনা যে গণগত অথবা শ্রেণিগত ফারাক, নির্দিষ্ট ফারাকের চেয়ে বেশি করে, সত্যিকারের ফারাকের ধারণার যোগান দেবে। নির্দিষ্ট ফারাক যেখানে সাধারণভাবে অনির্ধারিত ধারণার একত্বেই ফারাক খচিত করে দিয়ে সন্তুষ্ট। গণগত (বিতরণমূলক এবং উঁচুনিচু) ফারাক আবার সন্তুষ্ট সবচেয়ে সাধারণ নির্ধারণযোগ্য ধারণাগুলোর আপাত-একত্বর মধ্যে ফারাককে খচিত করে। অর্থাৎ বিচারের উপমার নিজেরই মধ্যে। অ্যারিস্টটলিয়ান ফারাকের দর্শন পুরোটাই এই দুই পরিপূরক খোদাই-এ ধরা আছে। একই স্বীকার্য-তে উভয়েই মাটি পেয়েছে এবং দুজনে মিলে শুভক্ষণটির খামখেয়ালী সীমানা আঁকে।

৩) জৈবিক প্রতিরূপ

ক) মূর্ত প্রতিরূপের সহচর্যে নির্দিষ্ট ফারাক, বিমূর্ত প্রতিরূপের সহচর্যে গণগত ফারাক

গণগত এবং নির্দিষ্ট ফারাক একে অন্যের সঙ্গে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বাঁধা রয়েছে প্রতিরূপের সঙ্গে তাদের সহচর্য দিয়ে। তারা কিন্তু কোনোভাবেই এক প্রকৃতির নয় : প্রজাতির সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে গণের একত্ব, আর গণের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে 'অস্তিত্ব'র একটা ওইরকম একত্ব তৈরি করার অসম্ভবতা – এটা তফাত। গণ নির্ধারিত হয় কেবল বাইরে থেকে নির্দিষ্ট ফারাক দিয়ে, কিন্তু এটা একেবারেই নির্দিষ্ট ফারাকের চরিত্র (এবং ঘটনা হলো সত্যিই তারা তাই-ই), যা গণগত ফারাককে বাধা দেয় এক সাধারণ গণ-এর মতো করে অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে, এবং এইভাবে স্থাপন করে ওই অসম্ভবতাকে। (যদি অস্তিত্ব হতো গণ, তাহলে তার ফারাকগুলোকে ধারন করা যেত নির্দিষ্ট ফারাক দিয়ে, কিন্তু তাহলে আর ফারাকগুলোকে 'ফারাক' বলা যেত না, কারণ গণ তো তাহলে তার নিজের ফারাকের মধ্যেই নিজেকে বিশেষিত করত না)।

এই ভাবে ভাবলে, একটি সাধারণ গণের মধ্যে প্রজাতির একার্থ, বিভিন্ন গণের মধ্যে অস্তিত্বের দ্ব্যর্থতাকেই ফিরিয়ে আনে : একটি অন্যটিকে প্রতিফলিত করে। আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই, আদর্শ শ্রেণিবিভাজনের শর্তগুলির মধ্যে : একসময় বড়ো ইউনিটগুলি – বৃহৎ গণ (জেন ম্যাজিস্তা), যাকে শেষপর্যন্ত বলা হবে শাখা, সেগুলি নিজেদের নির্ধারণ করছে যার ভিত্তিতে তা হলো উপমার সঙ্গে সম্পর্কগুলি, যে উপমা ধরে নেয় বিমূর্ত প্রতিরূপে বিচারের দ্বারা চরিত্রের চয়ন; এবং ছোটো ইউনিটগুলি – ছোট্ট গণগুলি বা প্রজাতি, সেগুলি নিজেদের নির্ধারণ করছে মিলের প্রত্যক্ষ অনুভব থেকে, যা ধরে নেয় মূর্ত প্রতিরূপে বোধগম্য আন্দাজের ধারাবাহিকতা।

খ) ফারাক দেখা দেয় কেবল একটি আত্মবাচক ধারণা হিসেবে

এমনকি নয়া-অভিব্যক্তিবাদও পুনরাবিষ্কার করবে বড়ো এবং ছোটো শ্রেণিবিভাগের মধ্যে ধরা থাকা দুটি দিককে, যখন সে তফাত করে বড়ো ভ্রূণতাত্ত্বিক ফারাকিকরণের সূত্রপাতগুলির সঙ্গে ছোটো ফারাকগুলি, যেগুলো মন্থর, প্রাপ্তবয়স্ক, প্রজাতি অথবা আন্তঃপ্রজাতি ফারাকিকরণ গুলোর। যদিও এই দুটি দিক পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে পারে; যার পরে বড়ো গণগুলি অথবা প্রজাতিগুলি-কে বেছে নেওয়া হবে প্রকৃতি-র ধারণা হিসেবে; দুটিই জৈবিক প্রতিরূপের সীমা নির্মাণ করে,

এবং সেই শর্তগুলি হিসেবে যেগুলি সমানভাবে প্রয়োজন শ্রেণিবিভাজনের জন্য : সাদৃশ্যের অনুভবের পদ্ধতিগত ধারাবাহিকতা কিন্তু উপমার বিচারের নিয়মানুগ বিতরণের চেয়ে কম জরুরি নয়। যদিও, এদিক ওদিক যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন, ফারাক দেখা দেয় কেবল একটি আত্মবাচক ধারণা হিসেবে। ফলত, সদৃশ, পারিপার্শ্বিক প্রজাতিগুলিকে এই ফারাক একটি গণের একত্বের মধ্যে চলে যেতে দেয়, যা তাদের ঢুকিয়ে নেয় ভেতরে – অর্থাৎ, একটি অনুভবযোগ্য ধারাবাহিক ক্রমের প্রবাহ থেকে গণগত একত্বগুলোকে নিষ্কাশন করা বা কেটে নেওয়া হয়। অন্যদিকে, এই ফারাক ক্রমানুসারে উপম (ফ. ইদেনতিক বা ইং. আইডেনটিক্যাল-এর বাংলা করা হয়েছে উপম, অভিন্ন করা যেত, করা হয়নি) গণগুলিকে চলে যেতে দেয় উপমার সম্পর্কগুলির মধ্যে, যেগুলি ওইগুলির মধ্যে লালিত হয় বুদ্ধিগম্যতার সাথে। প্রতিফলনের ধারণা হিসেবে, ফারাক প্রত্যক্ষ করে প্রতিরূপের সমস্ত শর্তের কাছে নিজের পরিপূর্ণ নতিস্বীকার, এবং তখন তা একেবারে হয়ে ওঠে যাকে বলে 'জৈবিক প্রতিরূপ'। প্রতিফলনের ধারণায়, মধ্যস্থতাকারী ও মধ্যস্থ হওয়া ফারাক ফলতঃ পদাধিকারবলেই পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার করে ধারণার একত্ব, বিধেয়র বিরুদ্ধতা, বিচারের উপমা এবং অনুভবের মিল-এর কাছে। এখানে আমরা পুনরাবিষ্কার করলাম প্রতিরূপের আবশ্যিকভাবে চৌমুখী চরিত্রকে।

গ) বিপর্যয়ের রাস্তাতেই ফারাকের মুক্তি?

যে প্রশ্নের উত্তর চাই, তা হলো, এই সমস্ত আত্মবাচক দিকগুলোর নিচে, ফারাক কি একসময় হারিয়ে ফেলে না তার স্বতন্ত্র ধারণা এবং তার স্বতন্ত্র বাস্তবতা, উভয়কেই। ফলত, যেখানে সে বিপর্যয়গুলোর নকশা করে কেবলমাত্র সেই পথেই ফারাক নিজের আত্মবাচক ধারণা হিসেবে থাকা-কে ব্যাহত করে, এবং সে পুনরুদ্ধার করে একটি কার্যত বাস্তব ধারণাকে : হয় সে মিলগুলির ক্রমের ধারাবাহিকতাটিকে ভেঙে দেয়, অথবা অনুরূপ কাঠামোগুলির মধ্যে অনতিগম্য ফাঁক তৈরি করে দেয়। এটি আত্মবাচক হওয়া বন্ধ করে, কেবলমাত্র বিপর্যয়মূলক হয়ে ওঠার জন্য। কোনো সন্দেহ নেই, একটি অন্যটির চেয়ে আলাদা হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বিপর্যয় আকারে ফারাক কি প্রত্যক্ষ করে না একটি বিদ্রোহী, অদম্য ভূমি যা লাগাতার কাজ করে জৈবিক প্রতিরূপের আপাত সাম্যাবস্তার নিচে?

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (ফারাক নিজের মধ্যেই), ইংপৃ ৩৪-৩৫

ড্যানিয়েল স্মিথ, ডকট্রিন অফ ইউনিভসিটি, দেল্যুজ এন্ড রিলিজিঅন, ২০০১

পরফিরি-র গাছ (ই এম কার্লে (১৯৬৯), *স্পিনোজা'স মেটাফিজিক্স : এন এসে ইন ইন্টারপ্রিটেশন*, পৃ ২৯ থেকে বানানো)

ড্যানিয়েল স্মিথ, দি ডকট্রিন অফ ইউনিভোসিটি, ইন দেল্যুজ এন্ড রিলিজিয়ন (২০০১)

	ফারাকের ধরন	নীতি
অস্তিত্ব → বিষয় ইত্যাদি	গণগত ফারাক (শ্রেণিবিভাজনগুলো)*	বিচারের উপমা
দৈহিক ← → বিদেহী	নির্দিষ্ট ফারাক	ধারণার একত্ব
দৈহিক → শরীর	অধস্তন গণ	
গতিশীল ← শরীর → স্থবির	নির্দিষ্ট ফারাক	
গতিশীল → সজীব	অধস্তন গণ	বিধেয়র বৈপরীত্য
বোধযুক্ত ← সজীব → বোধহীন	নির্দিষ্ট ফারাক	
বোধযুক্ত → প্রাণী	অধস্তন গণ	
যৌক্তিক ← প্রাণী → অযৌক্তিক	নির্দিষ্ট ফারাক	
যৌক্তিক → মানুষ	ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রজাতি	
রাম শ্যাম যদু মধু ইত্যাদি	ব্যক্তিক ফারাক	অনুভবের মিল

*অ্যারিস্টটলের শ্রেণিবিভাজনের তালিকা : বিষয়, (তার) পরিমাণ, গুণ, সম্পর্ক, জায়গা, সময়, প্রকারভেদ, অবস্থা, কাজ, আবেগ

থেকে নেওয়া পূর্ণাঙ্গ ছবিটি। অ্যারিস্টটল ফারাককে চারটি আন্তঃসম্পর্কিত নীতির অধীন করে দেন : ধারণায় একত্ব এবং বিধেয়তে বৈপরীত্য (নির্দিষ্ট ফারাক), অনুভবের মিল (ব্যক্তিগত বা অবিভাজিত ফারাক), এবং বিচারের উপমা (গণগত ফারাক)।

তুরীয় ও জাগতিক

জগতের কথা

জগত আর জাগতিকের তফাত কোথায়? জগত হল একটা ইট কাঠ মাটি অ্যান্টেনা সেলফোন একটি মেয়ে ইত্যাদি। আর জাগতিক হলো সেসবের অনুভব। বস্তুত, জগত কি তা বোঝার বা জানার যে আমাদের উদ্যম, তাতে যা হয়, তা জাগতিক। আমরা যা কিছুই দেখি, বা শুনি, বা স্পর্শ পাই — জগতের যে অনুভব আমাদের হয় — সবই জাগতিকের স্তরে। তাই, আমাদের 'জগতের কথা' আসলে 'জাগতিকের কথা'। সে আমরা খালি চোখে দেখি, অথবা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখি, তাতে জাগতিক তথাকথিত জগত-এ বদলে যায় না। আমাদের এই অনুভব বিনা জগত থাকল কি না থাকল, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।

তাহলে জগত আর জাগতিক-কে আলাদা করতে হচ্ছে কেন? কারণ জাগতিক কথাটার মধ্যে ওই অনুভবটি ধরা আছে। জগত কথাটার মধ্যে যেন বা ওই অনুভবটি ধরা নেই। আমাদের কল্পনায় আমরা মানুষের চেয়ে উচ্চতর স্বর্গীয় অস্তিত্ব-ও এনে ফেলি মাঝে মাঝে। যেমন ঈশ্বর। মুশকিল হল, আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিকেও নিজেরা বর্ণনা করে ফেলি। নিজেরা বলতে কোনো না কোনো মানুষ। ঐ ঐশ্বরিক দৃষ্টিতে যা দেখা যায় তা জগত। কারণ ঈশ্বরের তো আর অনুভব নেই। এখানে আবার মুশকিল। মুশকিলটা হল, সেই ঈশ্বরের দৃষ্টিও আমাদের মানুষদের দৃষ্টিতে যা দেখা যায় তার চেয়ে বেশি কিছু দেখে উঠতে পারে না। ফলতঃ ঐশ্বরিক দৃষ্টির বদলে মানুষের অনুভবের দুনিয়াই হল জগত। সে অনুভব ব্যক্তি মানুষের সীমাবদ্ধতায় বদ্ধ

নয়। এইজন্যই অনেক কিছু সম্পর্কে আমরা বই পড়ে জানি বা ক্যামেরায় জানি বা দৃশ্যশ্রাব্য হিসেবে, যা আমি নিজে দেখিনি। কিন্তু অন্যরা দেখেছে এবং লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছে।

এইভাবে যা আমি নিজে দেখিনি শুনিনি কিন্তু পড়েছি বা সিনেমায় দেখেছি বা লোকমুখে শুনেছি, এমনকি যা আমি আগে নিজে দেখেছি বা শুনেছি, এই দুই–ই আমার নতুন কিছু নিজে দেখা বা শোনাকে প্রভাবিত করে। নতুন দেখা বা শোনা–কে আর নতুন থাকতে দেয় না। অথচ সময়ের দিক দিয়ে বিচার করলে, আমার প্রতিটি নতুন দেখা বা নতুন শোনা–ই নতুন। এমনকি ধরা যাক আমি রোজ যে কম্পিউটার মনিটরটা দেখি বাড়িতে, সেই দেখাটাও প্রত্যেক নতুন দিনেই তো নতুন। কিন্তু অনুভবে এই নতুনের অনুভব কীভাবে থাকতে পারে? বলাই বাহুল্য, এটা কোনো মনোজাগতিক সমস্যা নয়। এটা বাস্তব দেখার সমস্যা। জাগতিকের এই সমস্যার জায়গাটিকে ধরেই তুরীয় জাগতিক।

দেল্যুজ সমস্যাটিকে প্লেটো থেকে টেনেছেন।

> *কিছু জিনিসের প্রতি আমাদের অনুভব চিন্তার উন্মেষ ঘটায় না পুনর্বিবেচনার জন্য, কারণ অনুভবে তাদের বিবেচনা পর্যাপ্ত বলে মনে হয়, কিন্তু অন্য জিনিসগুলো সর্বদা আমাদের মেধাকে টেনে আনে, কারণ তাদের অনুভব বিশ্বাসযোগ্য কিছু দিতে পারে না। তুমি নিশ্চয়ই উদাহরণ হিসেবে ভাবছ, দূরের জিনিস, বা, কৌণিকভাবে আঁকা কোনো কিছু। আমি কি বলতে চাইছি তুমি তা ধরতেই পারোনি।*

এবং এই লেখাটির মধ্যে থেকে দেল্যুজ চিন্তার প্রতিকৃতির (সু এবং সত্যের প্রতি আকর্ষিত) দিকে নির্দেশ করেন।

> *প্লেটোর লেখা এই টেক্সট–এ দুই ধরনের জিনিসের কথা বলা আছে। একটা, যা চিন্তাকে বিব্রত করে না। এবং আরেকটা, যা আমাদের বাধ্য করে চিন্তা করতে। প্রথমগুলি হলো, চেনা যাওয়া–র বিষয়বস্তু : চিন্তা এবং তার সমস্ত কর্মশক্তি বা সক্ষমতাগুলো হয়ত সেখানে পুরোপুরি কাজ করছে, হয়ত চিন্তা খুবই ব্যস্ত সেখানে, কিন্তু এই কর্মব্যস্ততার সঙ্গে চিন্তা করার কোনো সম্পর্ক নেই। চিন্তা সেখানে নিজের এক প্রতিরূপ দিয়ে পূর্ণ, যে প্রতিরূপে যত না কোনো জিনিসকে চেনা যায়, তার চেয়ে বেশি চেনা যায় নিজেকে (মানে চিন্তা–কে) : যেমন, এই হলো আঙুল,*

এই হলো টেবিল, সুপ্রভাত থিয়েটেটাস। এখান থেকে প্রশ্নটা আসবে সক্রেটিসের ইন্টারলোকিউটরের : তাহলে কি যখন আমরা ঠিক চিনতে পারছি না, চিনতে কষ্ট হচ্ছে, তখন আমরা সত্যিকারের চিন্তা করি? ইন্টারলোকিউটর তো মনে হচ্ছে কার্টেসিয়ান। যদিও এটা পরিষ্কার যে, সন্দেহ আমাদের চেনা–র দৃষ্টিকোণ থেকে সরিয়ে আনতে পারবে না। তার ওপর, এটা জাগাবে একটা স্থানীয় সন্দেহবাতিক, বা, বরং সাধারণীকৃত পদ্ধতিতে, যে, চিন্তার একটা চেনার ইচ্ছা আছেই যে, কোন জিনিসটা নিশ্চয়তা থেকে সন্দেহকে আলাদা করে। যা সন্দেহজনকের ক্ষেত্রে সত্যি, তা নিশ্চিত জিনিসগুলির ক্ষেত্রেও সত্যি : তারা ধরে নেয় চিন্তকের সু–ইচ্ছা এবং চিন্তার সু–প্রকৃতি, যা বোঝায় যে ওই চিন্তার মধ্যে আছে চেনা–র এক আদর্শ রূপ এবং সত্যের প্রতি তার আকর্ষণ, এই 'ফিলিয়া' (অনুরক্তি) যা আগে থেকেই নির্ধারণ করে দেয় একইসাথে চিন্তার প্রতিকৃতিটিকে এবং দর্শনের ধারনাটিকে। নিশ্চয়তা আমাদের সন্দেহর চেয়ে বেশি কিছুকে ভাবতে বাধ্য করে না।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৩৮–৩৯

সম্মুখীনতা

চিন্তা কি ধারাবাহিকতায় বেশি ধারালো থাকে? গতানুগতিক চিন্তা থেকে বেরোনোর উপায় কী? দেল্যুজ এখানে চিন্তার ধারাবাহিকতার বদলে সম্মুখীনতা সঞ্জাত চিন্তার কথা বলেন।

... বস্তুত, ধারনাগুলি কেবল সম্ভাব্যতাগুলিকে তৈরি করে। অত্যাবশ্য–কীয়তার নখর তাদের নেই। অর্থাৎ, একটা অকৃত্রিম হিংসা চিন্তার ওপর হানা দেয়; এক অদ্ভুতুড়ে বা এক শত্রুতা যা একাই জাগিয়ে তোলে চিন্তাকে তার স্বাভাবিক অসাড়তা বা চিরন্তন সম্ভাব্যতার মধ্যে থেকে : সেখানে আছে কেবল অনৈচ্ছিক চিন্তা, যা জেগে ওঠা কিন্তু চিন্তার মধ্যেই বেঁধে থাকা, এবং যার জন্ম কেবলমাত্র, অন্যায়ভাবে, আকস্মিকতা থেকে। চিন্তা হলো প্রাথমিকভাবে অনধিকার প্রবেশ এবং হিংসা, শত্রু; এবং কেউই দর্শনকে আগে থেকে ধরে নেয় না। সবকিছুই শুরু হয় মিসোজফি থেকে। চিন্তাকে আমল দিও না যা সে চিন্তা করে তার আপাত প্রয়োজনীয়তার কারণে। বরং কোনো এক সম্মুখীনতার আকস্মিকতাকে আমল দাও যা চিন্তাকে জেগে উঠতে বাধ্য করে এবং তাকে চিন্তা করতে বাধ্য হওয়া বা চিন্তা করার প্রচণ্ড আবেগ শেখায়। সত্যিকারের সমালোচনা এবং সত্যিকারের সৃজন–এর শর্ত একই : চিন্তার

প্রতিকৃতিকে ধ্বংস করা, যে চিন্তার প্রতিকৃতি ধরে নেয় নিজেকে এবং চিন্তার মধ্যেই চিন্তা করা–র জনন–কে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৩৯

চিন্তার বাধ্যবাধকতা

চিন্তা করা এবং চিন্তা করতে বাধ্য হওয়ার মধ্যে ফারাক আছে। চিন্তা করতে বাধ্য হওয়ার তুরীয়তার প্রতি নির্দেশ করেন দেল্যুজ।

জাগতিক দুনিয়ায় কিছু জিনিস আমাদের চিন্তা করতে বাধ্য করে। এই কিছু জিনিস কিন্তু কোনো চেনা যাওয়া–র জিনিস নয়, বরং অকৃত্রিমভাবে যার সম্মুখীন হলাম আমরা। যার সম্মুখীন হলাম, তা হতে পারে সক্রেটিস, একটা মন্দির, বা একটা দানব। হতে পারে তাকে বোঝার জন্য আমরা কিছু আবেগের সুরের স্মরণাপন্ন হলাম : অবাক হওয়া, ভালোবাসা, ঘৃণা, ভোগা। যে সুরই হোক না কেন, এর প্রাথমিক চরিত্রবৈশিষ্ট্য হলো, একে কেবল অনুভব বা বোধ করা যায়। এই ভাবে দেখলে এটা চেনা যাওয়া–র বিরোধী। চেনা যাওয়া–তে, যাকে বোধ বা অনুভব করা যায়, তা কখনোই এমন নয় যে তাকে কেবল বোধ বা অনুভব–ই করা যায়, বরং সে ওই বোধ বা অনুভবের ওপর চাপিয়ে দেয় আরেকটি বস্তুকে, যাকে স্মরণ করা যায়, কল্পনা করা যায় বা ভাবা যায়। অর্থাৎ, বোধগম্য বা অনুভবযোগ্য সেই বস্তুটি আর কেবল অনুভবযোগ্য থাকলো না, শুধু তাই নয়, বরং হয়ত বস্তুটি–তে উপনীত হতেই অন্য সক্ষমতাগুলো লেগেছে (সক্ষমতা — যেমন, চিন্তা, স্মরণ, কল্পনা, বোধ বা অনুভব ইত্যাদি)। অতএব বস্তুটিকে চেনা যাওয়া ধরে নেয় অনুভব বা বোধের অনুশীলন এবং অন্যান্য সক্ষমতাগুলোর অনুশীলন, একটি সাধারণ বোধের মধ্যে। অন্যদিকে, মুখোমুখি হওয়া–র বিষয়বস্তুটি বাস্তবিকই একটি প্রদেয় বোধের ভিত্তিতেই অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। ... সে কোনো গুণ নয়, বরং একটা চিহ্ন। সে কোনো অনুভবযোগ্য অস্তিত্ব নয়, বরং অনুভবযোগ্য–র অস্তিত্ব। এটা কোনো ঠিক করে রাখা কিছু নয়, বরং তা, যার দ্বারা ঠিক করে রাখা কিছু ঠিক করে রাখা কিছু হয়। অর্থাৎ সে একভাবে অগোচর (অবোধ্য)। আরও ভালোভাবে বললে, সে চেনা যাওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে অগোচর। অন্যভাবে বললে, বোধগুলির একটি জাগতিক অনুশীলনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, বোধগম্যতা তাকেই কেবল উপলব্ধি করতে পারে, যাকে অন্যান্য সক্ষমতাগুলি দিয়েও উপলব্ধি করা যায়, এবং যা সাধারণ বোধের পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে একটি বস্তুর সঙ্গে

সম্পর্কিত যাকেও বুঝতে হয় অন্যান্য সক্ষমতাগুলি দিয়ে। (অন্যদিকে) যা কেবল বোধ করা যায় (একইসাথে অগোচর), তার উপস্থিতিতে বোধগম্যতা তার নিজের সীমায় পৌঁছে যায়, একটা চিহ্নে, এবং নিজেকে উত্তোলিত করে ফেলে এক তুরীয় অনুশীলনের স্তরে : যাকে বলে কি না তার n *তম ক্ষমতায়। সাধারণ বোধের কাজ হলো, একটি যৌথ অনুশীলনের শর্তে বোধগম্যতার আপেক্ষিক ভূমিকাকে খর্ব বা সীমিত করা : সেখানে এই বোধগম্যতা এক তালমিলহীন নাটকে ঢুকে পড়ে, এর অঙ্গগুলি হয়ে যায় আধিভৌতিক।*

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৩৯–৪০

তুরীয় অনুভব, তুরীয় স্মৃতি, তুরীয় জানা

দ্বিতীয় চরিত্র : যা কেবল অনুভব করা যায়, (সেন্টিএনডাম, বা অনুভবযোগ্য–র অস্তিত্ব) যা আত্মাকে নাড়িয়ে দেয়, 'হতচকিত' করে দেয়, বা, বাধ্য করে একটা সমস্যা খাড়া করতে : যেন বা সম্মুখীন হওয়ার বস্তুটি, চিহ্নটি, সে–ই যেন সমস্যাটি বয়ে আনল, যেন সে–টাই সমস্যা। সমস্যা বা প্রশ্নকে কি তুরীয় স্মৃতির অনন্য বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করতেই হবে? যাতে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে যে কীভাবে যা কেবল মনে করা যায় তাকে উপলব্ধি করা যায় (প্লেটো অন্যত্র যেমন বলেছেন)? প্রতিটি জিনিস নির্দেশ করে সেই দিকেই : একথা বরং সত্যিই যে প্লেটোনিক স্মৃতি দাবি করে যে সে বিস্মৃত অতীতকে উপলব্ধি করতে পারে। মেমোরান্ডাম, যা কি না একই সাথে অত্যাবশ্যক ভুলে যাওয়া দিয়ে পীড়িত, যা, তুরীয়তার নীতি অনুযায়ী, যাকে কেবল মনেই করা যায়, তা জাগতিকভাবে মনে করা অসম্ভব। জাগতিক স্মৃতি সেই জিনিসগুলিকে উদ্দেশ করতে পারে, যেগুলো উপলব্ধি করা যেতে পেরেছিল এবং অবশ্যই উপলব্ধি করা হয়েছিল : যা মনে করা হলো, তা অবশ্যই দেখা হয়েছে বা শোনা হয়েছে, বা কল্পনা করা হয়েছে বা ভাবা হয়েছে। যা ভুলে যাওয়া হয়েছে, জাগতিক ভাবে, তা আর দ্বিতীয়বার স্মৃতি দিয়ে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় (তা অনেকদূর মুছে গেছে; ভুলে যাওয়া সেই স্মৃতি থেকে আমাদের সরিয়ে দিয়েছে বা মুছে দিয়েছে)। তুরীয় স্মৃতি, বিপরীতে, উপলব্ধি করে তাকে যাকে কেবল মনেই করা যায়, এমনকি প্রথম বারের জন্য : আকস্মিক অতীত নয়, অতীতের এক অস্তিত্ব রূপে এবং প্রতিটি সময়ের অতীত হিসেবে। এই ভাবে, ভুলে যাওয়া জিনিস ব্যক্তির স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হয় যা একে ধরে ফেলে।

এ স্মৃতিকে উদ্দেশ করে, কিন্তু তা স্মৃতির মধ্যে ভুলে যাওয়াকে উদ্দেশ না করে করে না। মেমোরান্ডাম মানে হলো এখানে যা উভয়ই — যা মনে রাখা যায় না, এবং যা স্মরণাতীত। ভুলে যাওয়া আর একটা আকস্মিক অক্ষমতা নয় যা আমাদের স্মৃতি থেকে আলাদা করে রাখে যে স্মৃতি নিজেই আকস্মিক : ভুলে যাওয়া থাকে আবশ্যক স্মৃতির মধ্যে যেন বা এটা ছিল স্মৃতির n *তম ক্ষমতা, তার নিজের সীমার পরিপ্রেক্ষিতেই, অথবা তার পরিপ্রেক্ষিতে যা কেবলমাত্র স্মরণ করা যায়। একই কথা প্রযোজ্য বোধগম্যতার ক্ষেত্রেও : আকস্মিকভাবে অগোচর যা আমাদের অনুভবগুলির জাগতিক অনুশীলনের তুলনায় খুবই ছোটো বা খুবই দূরের, তা আবশ্যিকভাবে অগোচরের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। যে আবশ্যিকভাবে অগোচর যা কি না বোধের তুরীয় অনুশীলনের দৃষ্টিকোণ থেকেই কেবল অনুভব করা যায় যাকে তার থেকে পৃথক করা যায় না। এভাবে বোধগম্য, সেন্টিএনডামের বোধের মুখোমুখি হবার ফলে বাধ্য হয়ে, স্মৃতিকে বাধ্য করে নিজের বেলায় মেমোরান্ডামকে মনে রাখতে, মেমোরান্ডাম, যাকে কিনা কেবল স্মরণই করা যায়।*

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৪০

শেষতঃ তুরীয় স্মৃতির তৃতীয় চরিত্র হলো, নিজের বেলায়, তা চিন্তাকে বাধ্য করে যা কেবল চিন্তাই করা যায়, তাকে উপলব্ধি করতে, কগিটান্ডাম বা নোয়েতেওন, যাকে বলে এসেন্স বা অন্তঃসার : যা বুদ্ধিগম্য তা নয়, কারণ তা তবুও আমরা যে রীতিতে চিন্তা করি যে তা চিন্তার চেয়ে আলাদা কিছু, তার বেশি কিছু নয়, কিন্তু বুদ্ধিগম্যের অস্তিত্ব, যেন বা এটা উভয়ই — চিন্তার অন্তিম ক্ষমতা এবং অচিন্ত্যনীয়। তার হিংসা যা চিন্তাকে সেন্টিয়েনডাম থেকে কগিটানডাম–এ বিকশিত হতে বাধ্য করে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৪১

সাধারণ বোধের মধ্যে দিয়ে সব ক'টি সক্ষমতা নিজেদের পায়ে বেড়ি পরায়। এবং প্রতিটি সক্ষমতার অভিসারী গতিতে কোনো কিছুকে চিনে যাওয়া যায়। অপরদিকে প্রতিটি সক্ষমতার পারস্পরিক অপসারী গতির মধ্যে দিয়ে যে হিংসাত্মক টানাপোড়েন, তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তুরীয়।

প্রতিটি সক্ষমতা স্বাধীন, কিন্তু শেকলটা কি? যদি সেটা সাধারণ বোধ না হয়, যা সমস্ত সক্ষমতাকে সক্রিয় করায় এবং কাছাকাছি টেনে আনে? প্রতিটি সক্ষমতা, তার নিজের মাত্রায় এবং নিজের বিচারে, সাধারণ

বোধের রূপটিকে ভেঙেছে (যে সাধারণ বোধ তাকে ধরে রেখেছিল সাধারণ ধারনার র জাগতিক উপাদানের মধ্যে), তার n তম ক্ষমতায় উপনীত হবার জন্য এবং তুরীয় অনুশীলনের মধ্যে কূটাভাসের উপাদানের জন্য। সবকটি সক্ষমতা এক জায়গায় মিলিত হয়ে এবং যে যার ভূমিকা রাখার মাধ্যমে কোনো একটা বস্তুকে চিনে যাওয়া-র সাধারণ প্রকল্পে সামিল হওয়ার বদলে বরং আমরা দেখি ভিন্নমুখী প্রকল্পগুলিকে, যার মধ্যে প্রতিটি সক্ষমতা হাজির থাকে তার 'নিজের' টা নিয়ে, এবং এটাই গুরুত্বপূর্ণ। সক্ষমতাগুলির অনৈক্যে, তাদের টানাটানিতে এবং গলে যাওয়ার মধ্যে প্রত্যেকে নিজের সীমার মুখোমুখি হয়, অন্যের কাছ থেকে পায় (বা অন্যকে দেয়) কেবল হিংসা যা একে নিজের উপাদানের মুখোমুখিই দাঁড় করিয়ে দেয়, যেন বা এ হয় বিলীন হয়ে যাবে বা নিজের পরিপূর্ণতায় পৌঁছবে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৪১

এবার দেল্যুজ প্লেটোর সমালোচনা শুরু করলেন। কীভাবে প্লেটো তুরীয় সক্ষমতাকে চিহ্নিত করতে গিয়ে জাগতিকের বদলে জগতের মধ্যে আটকা পড়ে যাবার কারণে অন্য এক জগৎকে টেনে আনলেন। অর্থাৎ টেনে আনলেন স্বর্গকে।

এবার একটু থামা দরকার, যদিও, প্লেটো যেভাবে প্রতিটির সীমার চরিত্রকে নির্ধারণ করেন, সেখানে। দি রিপাবলিক বইয়ে সংজ্ঞাত করেন তিনি, কী-টাকে, যার শুধু সম্মুখীন-ই হওয়া গেল, এবং যাকে তফাত করতেই হবে সমস্ত চিনে যাওয়া থেকে, একটা 'পরস্পরবিরোধী অনুভব'-এর বিষয়বস্তু হিসেবে। আর, একটি আঙুল সবসময় চিনে যাওয়া-কে আহ্বান করে, এবং কখনোই একটি আঙুলের বেশি কিছু নয়, যা শক্ত, তা নরম না হয়ে কখনোই শক্ত নয়, যেহেতু তা একটি হয়ে-ওঠার চেয়ে অপৃথকযোগ্য বা একটি সম্পর্ক যা নিজের মধ্যে তার বিপরীতকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে (একই কথা প্রযোজ্য বড়ো ও ছোটো, একটি এবং অনেকগুলির ক্ষেত্রে)। সেই চিহ্ন বা প্রস্থানবিন্দু যার জন্য চিন্তা বাধ্য হয় তা হলো বৈপরীত্যের সহবাস। বেশি এবং কম-এর সহবাস, অসীম গুণগত হয়ে ওঠার মধ্যে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৪১

চিনে যাওয়া, বিপরীতে, পরিমাপ করে এবং সীমায়িত করে গুণকে, তার সাথে অন্য কিছুকে সম্পর্কিত করে, এবং এভাবে পাগল-হয়ে-

ওঠাকে থামিয়ে দিয়ে। বৈপরীত্য বা বিরোধিতার রূপ দিয়ে প্রথমটিকে সংজ্ঞাত করতে গিয়ে যদিও প্লেটো কি এরই মধ্যে গুলিয়ে ফেললেন না বোধগম্যতার অস্তিত্ব কে সরল বোধগম্য অস্তিত্ব হিসেবে, বা শুদ্ধ গুণগত অস্তিত্ব হিসেবে (আইস্থেটন)? সন্দেহ দৃঢ়তর হয় যখন আমরা বিবেচনা করি দ্বিতীয়টিকে, স্মৃতিচারণ। স্মৃতিচারণ কেবল আসে চেনা যাওয়ার মডেলটাকে ভাঙতে যখন বাস্তবতঃ তা পরিকল্পনাটিকে জটিল করেই সন্তুষ্ট : যেখানে চেনা যাওয়া ধারন করে একটি গোচর বা গোচর হওয়া বস্তুকে, স্মৃতিচারণ ধারন করে অন্য একটি বস্তু, যা প্রথমটির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার কথা, তার নিচে ঢাকা পড়ে না গিয়ে। এই সংযুক্ত হয়ে যাওয়া দাবি করে নিজেই নিজেকে চেনা যাওয়া, কোনো স্বতন্ত্র অনুভব ব্যতিরেকেই।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৪১

এই 'স্বতন্ত্র অনুভব ব্যতিরেকেই' কথাটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে জাগতিকের বদলে জগতের মধ্যে আটকে পড়ার প্লেটোনিক ভ্রান্তি। দেল্যুজ বলে চলেন,

এই অন্য জিনিস, চিহ্নের নিচে ঢাকা পড়ে যাওয়া, তা হতেই হবে একই সাথে কখনো-দেখা-যায়-নি এবং তথাপি ইতিমধ্যে-চিনে-যাওয়া, অর্থাৎ, একটি ঝঞ্ঝাটে অনভ্যেস। এবার কাব্যি করে বলতে ইচ্ছা করবে যে সেটা দেখা হয়েছে, কিন্তু আরেক জনমে, এক অলীক বর্তমানে : তুমি সেই তার প্রতিকৃতি, সেই ...। এভাবে, যদিও, সবকিছুর সঙ্গে গদ্দারি করা হলো : প্রথমে, মুখোমুখি হওয়া যা কিনা কেবল চেনা যাওয়ার বিশেষ কোনো শক্ত পরীক্ষা স্বরূপ নয়, একটা ঢাকনা যা খোলা বিশেষ শক্ত, কিন্তু তার বদলে তা বিরোধিতা করে সমস্ত সম্ভাব্য চেনা যাওয়ার; দ্বিতীয়তঃ, তুরীয় স্মৃতির প্রকৃতি এবং তার যা কেবল মনেই করা যায়। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি কেবল ভাবা যায় স্মৃতিচারণে সদৃশ্যতার রূপের মধ্যে, সেইখানে যেখানে একই বাধা আসে : স্মৃতিচারণ গুলিয়ে ফেলে অতীতের অস্তিত্ব -কে অতীত অস্তিত্বের সঙ্গে, এবং যেহেতু স্মৃতিচারণ একটি জাগতিক মুহূর্ত নির্ধারিত করতে অক্ষম যখন এই অতীত বর্তমান ছিল, স্মৃতিচারণ আবাহন করে একটি আদি বর্তমান বা অলীক বর্তমান। স্মৃতিচারণের ধারনার গুরুত্ব (এবং কেন এটাকে সহজাত-তা-র কার্টেসিয় ধারনা থেকে মৌলিকভাবে তফাত করা দরকার) হলো, যেভাবে সেটা চিন্তার মধ্যে সময় বা সময়কাল এর ধারনাকে ঢোকায়, সেখানে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৪২

চিন্তার মধ্যে সময় বা সময়কাল এর ধারনা ঢুকলে কী হয় ?

এইভাবে স্মৃতিচারণ চিন্তার মধ্যে এক আজব অস্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করে, এবং সাক্ষ্য রাখে এক কু-স্বভাব এবং কু-ইচ্ছার যা অবশ্যই আসছে চিন্তার বাইরে থেকে। কিন্তু, আমরা যেমন দেখলাম, যে, যেহেতু সময়কে ঢোকানো হয়েছে কেবল এক ভৌতিক চক্র হিসেবে, তার শুদ্ধ বা সার রূপে নয়, চিন্তা-কে তাই এখনও মনে করা হচ্ছে সু-স্বভাবের অধিকারী এবং ঝকঝকে স্পষ্টতার অধিকারী হিসেবে, যা কি না প্রাকৃতিক পাকচক্রের কবলে পড়েছে বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। স্মৃতিচারণ এখনও অবদি চেনা যাওয়া মডেলের এক আশ্রয়, এবং প্লেটো কান্টের মতোই তুরীয় স্মৃতির কার্যকলাপকে জাগতিক অনুশীলনের প্রান্তরেখা থেকে আঁকতে চান (আমরা ফাএদো র অ্যাকাউন্টে সেটা পরিষ্কারভাবে দেখি)। তৃতীয় দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে, শুদ্ধ চিন্তার ব্যাপারটা, বা যা কি না কেবল চিন্তা-ই করা যায়, প্লেটো সেই দৃষ্টান্তটিকে নির্ধারণ করেন তফাতকৃত বৈপরীত্যের মাধ্যমে। এইভাবে, স্মৃতিচারণের চাপে পড়ে আমরা বাধ্য হই এই সব ভাবতে : বৃহত্ত্বতা হলো বৃহৎ, তার বেশি কিছু নয়; ক্ষুদ্রতা হলো ক্ষুদ্র, তার বেশি কিছু নয়; ভারীত্ব হলো ভারী, তার বেশি কিছু নয়; এবং একতা হলো এক, তার বেশি কিছু নয়। প্লেটোর মতে, তাই, অন্তঃসার সংজ্ঞায়িত প্রকৃত অভেদ-এর রূপ দিয়ে ...।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৪২

প্লেটো জাগতিক অনুশীলনের প্রান্তসীমা থেকে তুরীয়কে আঁকতে গিয়ে তৈরি করেন উপস্থাপনার জগতে যাবার রাস্তা।

সবকিছু চূড়ান্ত পরিণতি পায় মহান নীতিটিতে : সবকিছুর আগে এবং সবকিছু সত্ত্বেও, চিন্তার সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধ বা সত্যের প্রতি অনুরক্তি রয়েছে। সংক্ষেপে, একটি সু-স্বভাব এবং সু-বাসনা, যা দাঁড়িয়ে গেল এই শেষ দৃষ্টান্তে, ভালো-র উপমা রূপে। ফলতঃ, প্লেটো যে কিনা লিখেছিল ওপরের ওই বয়ানটা, দ্য রিপাবলিক -এ, সেই প্রথম খাড়া করল চিন্তার গোঁয়াড়ে এবং নীতিবাদী প্রতিকৃতি যা ওই বয়ানটিকে দিল ব্যর্থ করে, এবং তাকে রাখল 'খেদ' হিসেবে। সক্ষমতাগুলোর তুরীয় বা উচ্চতর অনুশীলনকে আবিষ্কার করার পর, প্লেটো তাকে বোধগম্যতায় বিরোধিতা, স্মৃতিচারণে মিল, অন্তঃসারে অভেদ এবং ভালো-য় অনুরূপ

–এর রূপগুলির অধীন করে রেখে দিলেন। এইভাবে তিনি তৈরি করলেন উপস্থাপনা এর জগতে যাবার রাস্তা, তার উপাদানগুলির প্রাথমিক বাঁটোয়ারা, এবং চিন্তার সেই অনুশীলন এক গোঁয়াড়ে প্রতিকৃতি হিসেবে যা একইসাথে চিন্তাকে পূর্বধারনা করে নেয় এবং একইসাথে তার সাথে প্রতারণা করে। একটি সক্ষমতার তুরীয় রূপ –কে তফাত করা যায় না তার অসম্বন্ধ, উচ্চতর বা তুরীয় অনুশীলন থেকে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৪২–৩

তাহলে তুরীয় কী?

তুরীয় কোনোভাবেই এই নয় যে সক্ষমতাটি নিজেকেই উদ্দেশ করে জগতের বাইরের বস্তুসমূহের প্রতি, বরং বিপরীতে, তুরীয় মানে সক্ষমতাটিকে আয়ত্ব করা জগতের মধ্যেই যা কেবলমাত্র সেই সক্ষমতাটিকেই নির্দেশ করে এবং তাকে জগতের মধ্যে টেনে নিয়ে আসে। সক্ষমতার তুরীয় অনুশীলনটিকে কক্ষনো সক্ষমতার জাগতিক অনুশীলন থেকে টানা যাবে না, কারণ সক্ষমতার তুরীয় অনুশীলন তাকে ধরে যাকে সাধারণ বোধের দৃষ্টিকোণ থেকে ধরা যায় না। যে সাধারণ বোধের দৃষ্টিকোণ মাপামাপি করে সমস্ত সক্ষমতাগুলোর জাগতিক কার্যকলাপ, যার যতটা ভাগে পড়ে, তাদের সহযোগের রূপের অনুসারে। এই কারণেই তুরীয় –কে জবাব দিতে হয় একটি উচ্চতর জগৎবাদ–এ যা একাই সক্ষম তার এলাকা ও অঞ্চলগুলো অনুসন্ধান করতে। কান্টের বিশ্বাসের বিপরীতে, একে কখনোই (সক্ষমতাগুলোর) সাধারণ জাগতিক রূপগুলি থেকে টানা যায় না, যেভাবে এদের দেখা যায় সাধারণ বোধের নির্ধারনের অধীনে। যদিও আজকাল সক্ষমতাগুলোর তত্ত্ব র সুনামহানি হয়েছে, এটা ঘটনা, তবু তা অত্যাবশ্যক একটি উপাদান, দর্শনের ব্যবস্থায়। এর সুনামহানিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে তুরীয় জগৎবাদের ভুল বোঝা দিয়ে, যে বোঝা তুরীয়–কে টানতে চেয়েছে জাগতিক থেকে, এবং ব্যর্থ হয়েছে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৪৩

সক্ষমতার ত্রিবিধ হিংসার মুখোমুখি হওয়া

প্রতিটি সক্ষমতাকে আবশ্যিকভাবে তার বিলীন হয়ে যাওয়ার চরমতম বিন্দুতে নিয়ে যেতে হবে, যেখানে সে ত্রিবিধ হিংসার কবলে পড়ে : প্রথমটার হিংসা তাকে বাধ্য করবে অনুশীলিত হতে, দ্বিতীয়টার হিংসা

যা ওই সক্ষমতাকে বাধ্য করবে তাকে উপলব্ধি করতে। এবং তৃতীয় হিংসা, তাকে একমাত্র ওই সক্ষমতাই উপলব্ধি করতে পারে, তথাপি তা ওই সক্ষমতার উপলব্ধিযোগ্য নয় (তার জাগতিক অনুশীলনের দৃষ্টিকোণ থেকে)। এই হলো অন্তিম ক্ষমতার ত্রিবিধ সীমারেখা। প্রতিটি সক্ষমতা আবিষ্কার করে এই বিন্দুতে, তার নিজস্ব একমেবাদ্বিতীয়ম আসক্তি, অন্যভাবে বললে, এর মৌলিক ফারাক এবং অনন্ত পুনরাবৃত্তি। তার ফারাকী এবং পুনরাবৃত্তিকারী উপাদানগুলো, তার অ্যাকশনের তাৎক্ষণিক সৃজন ও তার লক্ষ্যবস্তুর অনন্ত পুনঃপ্রদর্শনের মাধ্যমে যেভাবে জগতে আবির্ভুত হয় তা ইতিমধ্যেই পুনরাবৃত্তিমূলক। আমরা উদাহরণস্বরূপ জিজ্ঞেস করি : কী বোধগম্যতাকে বাধ্য করে বোধ করতে? কী তা যা কেবল বোধ করা যায়, তথাপি তা অগোচর একইসাথে? আমাদের এই প্রশ্ন শুধু বোধ, স্মৃতি ও চিন্তার জন্য করলে হবে না, কল্পনার জন্যও করতে হবে। ইমাজিনানডাম বলে কি কিছু আছে? ফ্যান্টাস্টেওন? যা কল্পনার সীমা আবার একইসাথে যা কল্পনায় অসম্ভব? ভাষা নিয়েও করতে হবে। লকুয়েন্ডান বলে কিছু আছে? যা একই মুহূর্তে নীরবতা? সামগ্রিক তত্ত্বে যা যা আর সক্ষমতা ঠাঁই পায় সবকিছু নিয়ে করতে হবে। সজীবতা, যার তুরীয় বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত বিকটত্ব; সামাজিকতা, যার তুরীয় বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত নৈরাজ্য; এবং আরও সব সক্ষমতা যা এখনও আবিষ্কার হয়নি, যাদের অস্তিত্ব এখনও আঁচ করা যায়নি। আরে কোনো কিছুই তো আগে থেকে বলে দেওয়া যায় না, গবেষণার ফল কী হবে তা কি আগে থেকে বলে দেওয়া যায় : হতে পারে কোনো খুব জানা কিছু সক্ষমতা, খুবই পরিচিত, যার দেখা গেল ঠিকঠাক কোনো সীমারেখা নেই, কোনো বলার মতো বিশেষণ নেই, কারণ সেগুলো আরোপিত এবং যার অনুশীলন কেবল আছে সাধারণ বোধের রূপের মধ্যে। আবার হয়ত দেখা গেল, নতুন কোনো সক্ষমতা উঠে এল, যেগুলো সাধারণ বোধের রূপের তলায় চাপা পড়ে ছিল। একটা সাধারণ তত্ত্বের জন্য, এই অনিশ্চয় গবেষণার ফল হিসেবে কোনোকিছুই অনুশোচনীয় নয়; এই হলো প্রতিটি সক্ষমতার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের গবেষণার জটিলতা। বিপরীতে, তুরীয় জগৎবাদ হলো তুরীয়কে জাগতিকের প্রান্তসীমা থেকে টানা–কে এড়ানোর একমাত্র রাস্তা।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৪৩–৪৪

এ প্রসঙ্গে দেল্যুজ উদাহরণ টেনেছেন জাক রিভিয়ের এবং আঁতোন্যাঁ আরতুদের চিঠিচাপাটির (১৯২৩)। রিভিয়ের এক ফরাসী পত্রিকার সম্পাদক।

আরতুদ উঠতি কবি। কবিতা পাঠিয়েছেন তাকে। সেগুলো পড়ে ওই মানের পত্রিকায় ছাপানোর যোগ্য মনে করেননি রিভিয়ের। কিন্তু কবিতাগুলো পড়ে তার ঔৎসুক্য জেগেছে, কবির সাথে আলাপ করার, কে সেই কবি যে এমন ভাবনা ভাবতে পারে। তাকে অফিসে এসে দেখা করতে বলেছেন, চিঠি লিখে। জবাবে কবি আরতুদ লিখছেন চিঠি, পীড়াপীড়ি করছেন কবিতাগুলো ছাপানোর জন্য — ' ... আমি এক মারাত্মক মানসিক রোগে ভুগছি। আমার চিন্তা আমাকে ছেড়ে চলে যায় প্রতি মুহূর্তে। চিন্তা করার সময় থেকে শুরু করে সেই চিন্তাকে শব্দে বাস্তবায়িত করার বাহ্যিক কাজটির সময় পর্যন্ত, যেকোনো সময়। শব্দে, বাক্যগঠনে, চিন্তার ঘনীভবনে, মনের সরলতম প্রতিক্রিয়ায়, আমাকে সবসময় ধাওয়া করতে হয় আমার বৌদ্ধিক অস্তিত্বকে। তাই, যখন আমি কোনো একটা রূপ দাঁড় করাতে পারি, যতই তা ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন, আমি তাকে ধরে রাখি, পাছে আমার সমস্ত চিন্তা হারিয়ে যায়। আমি জানি, আমি নিজের প্রতি সুবিচার করি না, আমায় ভুগতে হয় এর জন্য, কিন্তু আমি এটা মেনে নিয়েছি, আমার চিন্তার সম্পূর্ণ মৃত্যু এড়াতে।'

এই চিঠিচাপাটি পরে যখন প্রকাশিত হয় বই হিসেবে, তার ভূমিকায় লেখা আরতুদের আরেকটি স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করে দেল্যুজ এই তুরীয় জগৎবাদের আলোচনার ছেদ টেনেছেন।

'...চিন্তা করাই হলো সৃজন করা, আর কোনো সৃজন নেই, কিন্তু সৃজন করতে হলে তো প্রথমে চিন্তার মধ্যে 'চিন্তা করা' কে আনতে হবে। এই কারণে আরতুদ লৈঙ্গিকতাকে দাঁড় করান চিন্তার সহজাততা-র বিপরীতে, কিন্তু একইসাথে স্মৃতিচারণের বিপরীতেও, এবং এভাবেই তিনি প্রস্তাব করেন তুরীয় জগৎবাদের নীতিটিকে : 'আমি সহজাতভাবে চোঁদু ... কিছু বোকাপাঁঠা আছে, যারা নিজেদের কিছু একটা ভাবে, সহজাতভাবে কিছু একটা। আমি সে, যাকে সে যা তা হয়ে উঠতে গেলে, নিজের সহজাততাকে চাবুক মারতে হবেই। যে সহজাতভাবে কিছু একটা হতে বাধ্য, অর্থাৎ যে কিনা সদাসর্বদা চাবুক মেরে চলেছে এই রকম অস্তিত্বহীন কুত্তাকে, আরে অসম্ভবের কুত্তিরা। ... ব্যাকরণের তলায় থাকে চিন্তা, এই কলঙ্ক অতিক্রম করা কঠিন, সে এক অসীম কূট দাসী, যদি তাকে সহজাত ঘটনা বলে নেওয়া হয় তাহলে তাকে পেরোনো আরো কঠিন। কারণ গিন্নি-মা চিন্তাটিতো সবসময় থাকে না।'

টিপ্পনি : সমাজকর্ম : জাগতিক ও তুরীয়

শস, ফেব্রুতর্ক, ২৩।৩।২০১৮

কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, পশ্চিমবঙ্গের বাইরের কিছু কমবয়সী সমাজকর্মীর সঙ্গে মোলাকাতের সুযোগ হয়েছিল। তাদের বেশিরভাগই গান্ধীবাদী প্লাস লেফটিস্ট আইডিয়ালের। যাই হোক। একদিন তাদের সঙ্গে একটা শহরে ঘুরছি। তো তাদের একজনের এক বন্ধুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা। সেই বন্ধুটি জিজ্ঞেস করল — হোয়াট আর ইউ ডুয়িং দিজ ডেজ? আমার সঙ্গীটি উত্তর দিল — অ্যাকটিভিস্টি। পরে জেনেছিলাম, আমার সঙ্গীটি গান্ধী ফেলোশিপ পেয়েছিল তার আগের আগের বছর। আমি গান্ধী ফেলোশিপ কী জানতাম না।

বেসিক্যালি একথা আমার পক্ষে বোঝা সত্যিই বেশ দুষ্কর ছিল, যে, কারোর 'কাজ' বলতে 'সমাজকর্ম' হতে পারে। সত্যিই কি 'সমাজকর্মী', 'প্রতিবাদী', 'বিপ্লবী', 'রাজনৈতিককর্মী' — এগুলো পরিচয় হতে পারে? 'কাজ'-এর নিরিখে বেশ কিছু পরিচয় আছে। শিক্ষক, করণিক, ব্যবসায়ী, লেবার, ইঞ্জিনিয়ার, সিকিউরিটি গার্ড ইত্যাদি। সেইরকম কি একটা কাজ হতে পারে ওইগুলো? এই প্রশ্নটা করতে গেলে প্রথমেই যে কথাটা আসবে, পেড না আনপেড। এই তর্কটা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ভালো করে খেয়াল করলে বোঝা যাবে, এই তর্কটার গুরুত্ব কেবল আমার প্রাথমিক প্রশ্নটার সমাধা হয়ে গেলে, তখনই। অর্থাৎ, যখন ওগুলো 'কাজ', তখন এ বিতর্কটা গুরুত্বপূর্ণ।

যদি 'সমাজকর্মী' ইত্যাদিগুলো পরিচয় হয়, তাহলে সেগুলো মেইনটেইন করা, তাতে এক্সেল করার ব্যাপার থাকে। ইস্যু খুঁজতে হয়, কোন ইস্যুটার স্পেস আছে। কোন ইস্যুটায় কথা বললে নজর কাড়া যাবে।

যা সমাজকর্ম হওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু সমাজকর্ম হয়ে গেছে; যা প্রতিবাদ হবে ভাবা যায়নি, কিন্তু প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছু হয়নি; যা বিপ্লব হিসেবে শুরু হয়নি, কিন্তু দেখা গেল তা বিপ্লব; যা রাজনৈতিক কর্ম ছিল না, কিন্তু অভিঘাতে তা রাজনৈতিক — সেই তুরীয়গুলিই বাঁচিয়ে রাখে সমাজকর্ম প্রতিবাদ বিপ্লব রাজনৈতিক কর্ম-কে, জাগতিক সমাজকর্মী জাগতিক প্রতিবাদী জাগতিক বিপ্লবী জাগতিক রাজনৈতিককর্মীর হাত থেকে।

সু মু : সমাজকর্ম যখন একটা কাজ ও সেই কাজ-এ বেতন থাকে, সেই কাজের দায়িত্ববোধ, গুরুত্ব, টার্গেট এই ব্যাপারউলো চলে আসে... যদি নিজেদের ঘরোয়া প্রচেষ্টার মত হয় তখন অনেক দায়বদ্ধতা কমে আসে অনেক ক্ষেত্রে ... তবে আমি সহমত যে এগুলো 'কাজ' হিসেবে গণ্য

করাটা কানে লাগে ... এগুলো সহজাত বিষয় হওয়া উচিত।

শ স : সমাজকর্ম পরিষেবা নয় যে! তাই তার ইউটিলিটারিয়ান দিকটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সু মু : কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে সেবা কজন করতে পারছে তার চেয়ে পরিষেবা হয়ে যদি সেটা আরো কাজের হয় তবে তো ভালোই হয়।

শ স : পরিষেবা হলে তা আর সমাজকর্ম থাকল না। আমি পরিষেবার বিরুদ্ধে কিছু বলছি না। কিন্তু তা শেষ কথা নয়। পরিষেবার সুবন্দোবস্ত সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তার লেভেল-আপ করে, তাকে অপ্রয়োজনীয় করে দেয় না।

বি রা : সমাজকর্ম বা সমাজকর্মী — এই পরিচয় এবং 'কাজ' হয় কিনা সহজে বুঝিয়ে বলবে একটু, বাবা! আমার সাধারণ বোধে –হয়।কিন্তু কেন ইত্যাদি ব্যাখ্যা দিতে পারব না অবশ্য।

শ স : হয়। হয় বলেই তা তার অভিঘাত হারায়। যেমন ধরো, বন্যা হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা দিচ্ছে। আর যে সাধারণতঃ সেবা করে না, সে সেবা দিতে গেল। কোনটার অভিঘাত বেশি? কোনটা আসলে সমাজকর্ম? সেবা ঠিকঠাক দেওয়া গেল কি না সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। সেবা তো পরিষেবা নয়।

আ স : আচ্ছা, স্পন্সর্ড একটি পরিবর্তন এর ক্ষেত্রে একথা গুলো খাটে? কৃষির কর্পোরেটাইজেশনের যে খুব সূক্ষ রাজনীতি তৈরি করা হচ্ছে, সে বিষয়ে কি বলবে? বা ন্যাশনালিজম? বা এই যে আত্মপরিচয়ের রাজনীতি? এগুলো এমেরজেন্স তাই না? তৈরি করা নয়? আর সেই কারণেই বোধহয় আই বি এম এর এক কর্তা ব্যক্তি আজ যা ঘটেছে তার একটা সুস্পষ্ট চিত্র বছর দশেক আগেই আঁকতে পেরেছিল।

শ স : তুমি কৃষির কর্পোরেটাইজেশনের বিরুদ্ধে? কেন বল তো? আম্বেদকরাইটরা তো এমনকি কৃষি অ্যাবানডন করতে বলে কারণ কৃষিকাজ করে মূলত: দলিতরা আর সেটাই তার দারিদ্রের কারণ। কারণ কৃষিতে গ্রোথ সবচেয়ে কম। যার পেশা কৃষিকাজ সে অন্যদের তুলনায় গরীব হবেই। যদি বলি তুমি কৃষক নও, তোমার কেউ কৃষক নয়, তবু তুমি কৃষিতে কর্পোরেটাইজেশনের বিরুদ্ধে, কারণ নন-কর্পোরেট গরীব কৃষির দৌলতে তুমি সস্তায় কৃষিপণ্য ও উপজাত দ্রব্য পাও, তাই?

বি ন : সমাজকর্মী আদতে একটি ইওরোপিয় ঔপনিবেশিক শব্দবন্ধ, যেখানে

ভদ্রবিত্ত নিজেকে সমাজকর্মী আখ্যা দিয়ে ‘পিছিয়ে পড়া’ সমাজের বাইরের উঁচু মঞ্চে দাঁড় করিয়ে রেখে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের ‘ভাল’র জন্যে কাজ করার কথা ভাবে – দুরকম করে – নিজের সিদ্ধান্তকে সরাসরি চাপিয়ে দিয়ে অথবা সমাজে যারা বঞ্চিত ভাবছে, যারা পুঁজির তৈরি উতপাদন ব্যবস্থায় যুক্ত হতে না পেরে মানসিক যন্ত্রণা বোধ করছে, কৌশলে নিজের সিদ্ধান্তকে নানান কর্পোরেট পদ্ধতিতে আলোচনার মাধ্যমে তাদের ওপর নাচাপানোর আছিলায় সেই সিদ্ধান্তটিই নিতে বাধ্য করে। দুটি পদ্ধতির শেষ লক্ষ্য হল নানান আছিলায় তথাকথিত পিছিয়ে পড়া সমাজের এক গুচ্ছ গরীব দেগে দেওয়া, অশিক্ষিত দেগে দেওয়া, অকম্মা দেগে দেওয়া, অজ্ঞানী দেগে দেওয়া মানুষকে শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে কর্পোরেটিয় গণতন্ত্রিক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণযুক্ত বড় পুঁজি নির্ভর উতপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা।

শ স : মুশকিলটা হলো, কোনো তৃতীয় পদ্ধতি নেই। ... আর তাছাড়া গরীব একটা আপেক্ষিক কথা। চাষির ছেলে যখন দেখে চাকরি–বাকরি করে বেশি পয়সা আসে, আর তা দিয়ে সাধ–আহ্লাদ মেটানো যায়, তখন সে চাকরি–বাকরি করার চেষ্টা করে। চাষ করা বা নানা ধরনের বৃত্তি আহামরি কিছু জিনিস না (কর্পোরেট সংস্থায় নানা ধরনের কাজ বা সরকারি কাজও আহামরি কিছু জিনিস না)। যারা চাষ করে বা নানা ধরনের বৃত্তিতে যুক্ত, তারা খুব ভালো করেই জানে কথাটা। ওগুলো নিয়ে আহ্লাদ একটা নির্দিষ্ট ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জাত। আর সেই দৃষ্টিভঙ্গী ভদ্রলোকের সমাজে জাত।

টিপ্পনি : শিল্পকর্ম : জাগতিক ও তুরীয়

শস, ফেব্রুপো, ১৮।৩।২০১৮

‘... আমার চিন্তা আমাকে ছেড়ে চলে যায় প্রতি মুহুর্তে। চিন্তা করার সময় থেকে শুরু করে সেই চিন্তাকে শব্দে বাস্তবায়িত করার বাহ্যিক কাজটির সময় পর্যন্ত, যেকোনো সময়। শব্দে, বাক্যগঠনে, চিন্তার ঘনীভবনে, মনের সরলতম প্রতিক্রিয়ায়, আমাকে সবসময় ধাওয়া করতে হয় আমার বৌদ্ধিক অস্তিত্বকে।’

অনেকেরই কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, ছবি, গান সহজাতভাবে আসে বলে মনে হয়। কে জানে! হয়ত আসে! তারা কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক,

নাট্যকার। আবার অনেকেরই সহজাতভাবে কবিতা আসে না, বাক্য আসে না, ঢঙ আসে না। কবি আঁতোনাঁ আরতুদ বলেছিলেন, তাঁর চিন্তা পালিয়ে যায়, তাকে আকার দিতে গেলে তাকে ধাওয়া করতে হয় তাঁকে।

যে কবিতা লেখে না বা লিখতে পারে না সে যখন দেখে তার ভাবনাটি পালিয়ে যাচ্ছে, তাকে হ্যাঁচোর প্যাঁচোর করে ধরতে চেয়ে সে যখন লিখে ফেলে তা কোথাও, লিখে ফেলে দেখে যেটা হয়েছে সেটা কবিতা। অথবা গল্প। বা ছবি। ...

যা কবিতা হবার কথা ছিল না, কিন্তু কবিতা ছাড়া অন্য কিছু হয়নি; যা গল্প হবে কেউ ভাবেনি, কিন্তু হবার পর দেখা গেল সেটা গল্প; যা প্রবন্ধ বলে শুরু হয়নি, কিন্তু লেখার পর পড়ে বোঝা গেল সেটা প্রবন্ধ ... ... সেই কবিতা, সেই গল্প, সেই প্রবন্ধ, সেই নাটক, সেই গান বাঁচিয়ে রাখে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, গান–কে — কবি–গল্পকার–প্রাবন্ধিক–নাট্যকার–গীতিকারদের হাত থেকে।

আমাদের জনজীবনে, হাটে–বাজারে, বাউল গানের অঙ্গনে, সাহিত্যবাসরে, লিটল ম্যাগাজিনের আড্ডায়, গোষ্ঠী থিয়েটারে, পালাগান–এ, নৈশ যাত্রায়, চুটকিতে, মিম–এ, চাষের মাঠে, বিলের ডোঙায় কখনো কখনো মিলে যায় সেই কবিতা, গল্প, গান ...। দেশ বিদেশের সেইরকম কিছু কবিতা, গল্প, গান ... পেয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভবনা এই সপ্তাহের শেষে, শনি–রবিবার, কলকাতার ফুলবাগানে হতে চলা 'জনতার সাহিত্য উৎসব'–এ। এবারই প্রথম। তাই ঔৎসুক্যও বেশি। আমি একবার ঢুঁ মারব। কেউ চাইলে আসতে পারো।

অস্তিত্ব ও অস্তিত্বজনন

ব্যক্তির কথা

তুরীয় জগৎবাদ–এর সাধারণ সূত্র আলোচনা করার সময় দেল্যুজ প্লেটোর সমালোচনায় 'ভুল' যা কি না চিন্তার খারাপ দিককে নির্দেশ করে, সেদিকে আঙুল তোলেন। চিন্তার ভুল — অর্থাৎ পাগলামি, বোকামি, এবং কু–ইচ্ছা — এই ত্র্যহস্পর্শে তৈরি হওয়া ভুল তো আসলে চিন্তার বিষয় বা বাস্তব ঘটনা। তা তো চিন্তা নয়। চিন্তার যে মূল কাঠামো, তার যে প্রতিকৃতি — যা কি না হল, আসলে চিন্তা ভালো — তাকে কোনোভাবেই টসকাতে পারে না এই ত্র্যহস্পর্শে তৈরি হওয়া ভুল।

> *বোকামি, বদমাইশি, পাগলামি এগুলো হল ঘটনা যা বাহ্যিক কারণে ঘটেছে। যেগুলি নিয়ে আসে বাহ্যিক শক্তিগুলিকে যারা চিন্তার সৎ চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করতে পারে বাইরে থেকে — কতটা পারে? ততটাই পারে, যতটা আমরা শুধু চিন্তক নই। এইসমস্ত শক্তিগুলির চিন্তার ওপর একমাত্র প্রভাব তখন আত্তিকৃত হয় কেবল ভুল–এ, যা বাহ্যিক ঘটনাক্রমের সমস্ত প্রভাবকে অন্তর্ভুক্ত করে বলে নীতিগতভাবে ধরা হয়।*
>
> *দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৪৯*

এবার 'চেনা'র ক্ষেত্রে, সাধারণ সূত্র মোতাবেক যখন আমরা 'সম্মুখীন' হওয়ার মাধ্যমে কিছু চিনছি, অর্থাৎ তুরীয় চেনা, সেই ক্ষেত্রে এই ভুল–এর

প্রভাব কেমন দাঁড়াবে? ধরা যাক, আমি লিখলাম সাত যোগ পাঁচ সমান তেরো। এটা কী? এটা আমার জাগতিক সক্ষমতার ভুল। নিশ্চিতভাবেই। ঘটনাক্রমের ভুল। বোকামি, বদমাইশি, পাগলামি, অথবা না শেখা — কোনো এক জাগতিক ঘটনাক্রমেই এই ভুল। এবার তুরীয় চেনা-র ক্ষেত্রে এই ভুল-এর ভূমিকা কতটা থাকতে পারে, তা তুরীয় চেনা-য় 'নেতিবাচক' বলে অন্তর্ভুক্ত করা হল। কিন্তু তাতে চিন্তা-র সু-প্রতিকৃতিটা টসকালো না একটুও। বরং চিন্তা ইতিবাচক একটা ব্যাপার, এবং তার নেতিবাচক অংশ হল ভুল-গুলো, যেগুলো বাহ্যিক ঘটনাক্রমের প্রভাবে হয় — এইটাই জোরালো হল।

তবে? দেল্যুজ এখানে জোর দিয়ে বলেন,

ভীরুতা, নিষ্ঠুরতা, নীচতা, এবং বোকামি কেবল শারীরিক কিছু বা চরিত্রবৈশিষ্ট্য বা সামাজিক বৈশিষ্ট্য নয়। এরা হল যাকে বলে চিন্তার কাঠামো। তুরীয় পটভূমিটি জীবন্ত হয়ে ওঠে : অত্যাচারীর ঠাঁই, দাসের ঠাঁই, নির্বোধের ঠাঁই এর মধ্যেই — যারা এখানে আছে জায়গাটা তাদের মতো দেখতে না হয়ে, এবং তুরীয়কে কখনোই সেই জাগতিক চরিত্রগুলি থেকে না টেনে যারা তাকে সম্ভব করেছে। কগিতাশিও-র সূত্রগুলিতে বিশ্বাসই সর্বদা আমাদের আটকায় বোকামি-কে একটা তুরীয় সমস্যা হিসেবে দেখতে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৫১

অতএব, বোকামিকে যদি তুরীয় সমস্যা বা তুরীয় ব্যাপার হিসেবে স্বীকার করতে হয়, তাহলে একটা যথাযথ তুরীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় : কীভাবে বোকামি সম্ভব?

দেল্যুজ প্রশ্নটা করে নিজেই তার উত্তর দিচ্ছেন,

এটা সম্ভব চিন্তা এবং ব্যক্তিকরণের সংযোগের ফলে। এই সংযোগ অনেক গভীর, 'আমি ভাবি' তে যতটা সংযোগ দেখা যায় তার থেকে : এটা তীব্রতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, যা গঠন করে চিন্তক বিষয়ীর সংবেদনশীলতাকে। যেহেতু আমি এবং স্ব হয়ত প্রজাতির সূচকের থেকে বেশি কিছু নয় : মনুষ্যতা যেখানে প্রজাতি, বিভাজন সহ। এই প্রজাতি নিশ্চিতভাবেই মানুষ-এ একটা অন্তর্নিহিত অবস্থায় পৌঁছেছে। তার ফলে 'আমি' রূপটি ভূমিকা পালন করতে পারে চেনা-র এবং

উপস্থাপন-এর একটা সার্বজনীন নীতি হিসেবে, যেখানে নির্দিষ্ট ব্যক্ত রূপটি চেনা যায় কেবল এই 'আমি' দিয়ে, এবং প্রজাতির নির্ধারণ হল শুধু উপস্থাপনের অংশগুলির একটির নিয়ম। তাই 'আমি' কোনো প্রজাতি নয়। বরং যেহেতু এটা অন্তর্নিহিতভাবে ধারণ করে তা, যা প্রজাতি এবং প্রজাতিস্বরূপ-রা ব্যক্তভাবে তৈরি করেছে, বিশেষতঃ রূপ-এর মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়ে হওয়া — তাই তাদের একটা সাধারণ নিয়তি আছে, ইউদোক্সাস এবং এপিস্টেমন।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৫১

এখনও উত্তরটা শেষ হয়নি, পরের উদ্ধৃতিতে বাকিটা আছে। কিন্তু থামা হল এই ইউদোক্সাস এবং এপিস্টেমন বুঝতে। দেকার্তে তার জীবনের শেষের দিকের একটি লেখায়, যা তার জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত ছিল এবং যে লেখাটা অসম্পূর্ণ-ও বটে, সেটিতে একটি কাল্পনিক কথোপকথন বিবৃত করেছিলেন, এটা দেখানোর জন্য, যে, তাঁর যে যুক্তিক্রম, তা দিয়ে তিনি একজন সাধারণ মানুষকে একজন জ্ঞানী লোকের সঙ্গে সমান আসনে বসাতে পারেন। তবে হ্যাঁ, সেই সাধারণ মানুষকে একটা ভালোমানুষ হতে হবে। এই সাধারণ ভালোমানুষ হল পলিয়েন্ডার। জ্ঞানী লোক হল এপিস্টেমন। আর কার্টেসীয় যুক্তিবাজ হল ইউদোক্সাস। ... এবার দেল্যুজের উত্তরের বাকি অংশটা পড়া যাক।

বিপরীতে ব্যক্তিকরণের এমনকি প্রজাতি নির্ধারনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার সঙ্গেও কোনো লেনাদেনা নেই। এটা যে কেবল সমস্ত ধরনের প্রজাতি নির্ধারনের চেয়ে আলাদা, তা-ই নয়, আমরা দেখব, এটা প্রজাতি নির্ধারনের আগের ব্যাপার এবং এটা প্রজাতি নির্ধারনকে সম্ভব করে তোলে। এতে আছে তরল তীব্রতার ক্ষেত্র যা একটি স্ব-এর চেয়ে বেশি একটি 'আমি'-র রূপ নিতে পারে না। ব্যক্তিকরণ, যেহেতু তা সকল রূপের নিচে কাজ করে, তাই তাকে শুদ্ধ ভূমি-র থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়, যে ভূমিকে সে উপরিতলে আনে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যায়। সেই ভূমি-কে বর্ণনা করা কঠিন। অথবা যে সন্ত্রাস এবং আকর্ষণকে এই ভূমি উত্তেজিত করে। এই ভূমিকে উপরিতল বানানো সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কাজ, কিন্তু একইসাথে সবচেয়ে উত্তেজকও, এক নির্বোধ ইচ্ছার অবাক মুহূর্তে। কারণ এই ভূমি ব্যক্তির সাথে উপরিতলে উঠে আসে, তথাপি কোনো রূপ বা আকার ধারণ করে না। সে সেখানে আছে, আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু চোখ ছাড়া। ব্যক্তি নিজেকে এর থেকে

আলাদা করতে পারে। কিন্তু এটা নিজে নিজের স্বাতন্ত্র্য পায় না। বরং তার সঙ্গেই সহবাস করে চলে যে নিজেকে এর থেকে ছিন্ন করতে চায়। এটা হল অনির্ধারিত, কিন্তু অনির্ধারিত ততদূর যতটা দূর এ চলতে পারে নির্ধারিতকে জাপটে নিয়ে, যেমন মাটির সাথে জুতোর সম্পর্ক। প্রাণীরা হল এই দিক থেকে এই ভূমি সম্পর্কে পূর্বসতর্কিত। তারা তাদের ব্যক্ত রূপগুলি দিয়ে সুরক্ষিত।

কিন্তু 'আমি' এবং স্ব- এর ক্ষেত্রে এরকমটা নয়। তারা ব্যক্তিকরণ-এর ক্ষেত্র দিয়ে খর্বিত যা তাদের নিচে কাজ করে, তারা সেই ভূমির উত্থানের বিরুদ্ধে রক্ষণবিহীন যা তাদের সামনে তুলে ধরে একটি বিকৃত বা বিকৃত হতে থাকা আয়না যাতে সমস্ত বর্তমান চিন্তা-রূপগুলি বিলীন হয়ে যায়। বোকামি ভূমিও নয়, ব্যক্তিও নয়। বরং সে হল এই সম্পর্ক যেখানে ব্যক্তিকরণ ভূমিকে উপরিতল-এ নিয়ে আসে তাকে কোনো রূপ দিতে সমর্থ না হয়েই (এই ভূমি এই 'আমি'-র মাধ্যমেই উত্থিত হয়, চিন্তার সম্ভবনার মধ্যে গভীরভাবে সেঁধিয়ে যায় এবং প্রতিটি চেনা-তে অচেনা-কে গঠন করে)। সমস্ত নির্ধারন হয়ে যায় খারাপ এবং নিষ্ঠুর যখন তারা আয়ত্ত্ব হয় কেবল একটি চিন্তা দ্বারা যা তাদের আবিষ্কার করে এবং সাধনা করে, তাদের জীবন্ত রূপ থেকে আলাদা ও উন্মোচিত করে, এই খাঁ খাঁ ভূমিতে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায়। এই নিষ্ক্রিয় ভূমিতে সবকিছু হিংসা হয়ে যায়। সবকিছু এই জারক ভূমিতে আক্রমণ হয়ে যায়। এইখানে বোকামি এবং বদমাইশি-র বিশেষ উৎসব হয়। হয়ত এইটাই ওই করুণ সংগীত যা সুন্দরতম মানব-মুখ-এ ছায়া ফেলে : মানব-মুখের পক্ষে অদ্ভুত এক বীভৎস পূর্বঅনুভব, বোকামির এক জোয়ার আসা, এক শয়তানি বিকৃতি অথবা পাগলামি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত এক চিন্তা। প্রকৃতির দর্শন-এর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, পাগলামি আসে যখন ব্যক্তি নিজেকে ভাবে এই মুক্ত ভূমি-তে — এবং, ফলস্বরূপ, বোকামি বোকামিতে এবং নিষ্ঠুরতা নিষ্ঠুরতায় — সেই বিন্দু অবদি যেখানে সে নিজেকেই আর সহ্য করতে পারে না। 'তখন তাদের মনে এক নিদারুণ সক্ষমতা আসে, যে সে বোকামিকে দেখতে পায় এবং আর সহ্য করতে পারে না ...'। সত্যি যে এই নিদারুণ সক্ষমতাটিও হয়ে ওঠে রাজকীয় সক্ষমতা যখন এটা দর্শন-কে সঞ্জীবিত করে মনের দর্শন হিসেবে — অন্যভাবে বললে, যখন এটা অন্য সব সক্ষমতাকে নিয়ে যায় সেই তুরীয় অনুশীলনে যেখানে সে সম্ভব করে একটি হিংসাত্মক পুনর্মিলন — ব্যক্তি, ভূমি এবং চিন্তার মধ্যে। এই বিন্দুতে, ব্যক্তিকরণের প্রগাঢ় উপাদানগুলি

নিজেদেরকে এমনভাবে নিয়ে যায় যাতে সে গঠন করতে পারে তুরীয় বোধগম্যতার শীর্ষ উপাদানে, সেন্টিএন্ডাম। এবং একটি সক্ষমতা থেকে অন্য সক্ষমতায়, ভূমিটি জাত হয় চিন্তার মধ্যে — অচিন্তা এবং অচিন্তিত হিসেবে এখনো, কিন্তু এই অচিন্তা হয়ে ওঠে প্রয়োজনীয় জাগতিক রূপ যেখানে, ভগ্ন 'আমি'র মধ্যে (বুভার এবং পেকুচে), চিন্তা শেষ পর্যন্ত চিন্তা করতে পারে যাকে চিন্তা করতে হবে। অন্যভাবে বললে, তুরীয় উপাদান যাকে কেবল চিন্তাই করা যায় ('যা এখনো চিন্তা করা হয়নি' অথবা 'বোকামি কী')।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (চিন্তার প্রতিকৃতি), ইংপৃ ১৫১–৩

চিন্তার সঙ্গে ব্যক্তিকরণের সম্পর্ক, ব্যক্তির বদলে। যা অন্তর্লীন ভূমি-কে তুলে আনে ওপরে, ব্যক্তির মাধ্যমেই, কিন্তু তাকে কোনো অবয়ব দিতে পারে না। এই তুলে আনার থেকেই তৈরি হয় তুরীয়। সেখান থেকেই তৈরি হয় সেই চিন্তা যা আগে চিন্তা করা হয়নি। স্পষ্ঠতঃই তুরীয় চিন্তার বিষয়ীর খোঁজ পেয়েছেন দেল্যুজ চিরাচরিত ব্যক্তির বদলে ব্যক্তিকরণ-এর ধারায়। অস্তিত্বের বদলে অস্তিত্বজনন-এ। এই ব্যক্তিকরণের চিন্তা দেল্যুজ পান সিমন্দঁ-তে। বলা ভালো, আমরা পাই। কারণ দেল্যুজ কখনোই এই ব্যক্তিকরণ-কে বিস্তারিত করেননি কোথাও। পরবর্তী প্যারাগ্রাফগুলোতে আমরা জিলবের সিমন্দঁ-র ব্যক্তিকরণ-এর ধারনা আলোচনা করব বিস্তারিতভাবে। সিমন্দঁর ব্যক্তিকরণের ধারনার বিস্তারিত আলোচনা ব্যতিরেকে দেল্যুজ-এর তুরীয় জগৎবাদ অসম্পূর্ণ।

ব্যক্তিকরণ বোঝার পূর্বশর্ত : অস্তিত্ব এবং সাম্যের নয়া ধারনা

জিলবের সিমন্দঁ-র 'ব্যক্তিকরণ : মনোগত এবং সামুহিক' বইটির (মূল গবেষণা ১৯৫৮, লেখা ১৯৬৪ তে প্রকাশিত, আলাদা বই হিসেবে বেরোয় ১৯৮৯ এ) নির্বাচিত ও সম্পাদিত বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা যাক। সাবহেডিং ছাড়া এবং বাছাই ছাড়া আমার কিছু ভূমিকা নেই এই পর্যায়ে। দীর্ঘ অনুবাদ। বইটির নির্বাচিত অংশ। বইটির দুটি সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ ২০০৭ সালের সংস্করণের (এদিশিঁও ওবিয়ের) যে কপি আমার কাছে আছে, তাতে বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠা নেই মাঝখানে। ফলে মাঝের ওই পৃষ্ঠাগুলি ২০১৩ সালে নবকলেবরে ও সম্পাদনায় প্রকাশিত বইয়ের (এদিশিঁও জেরম মিল) থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। ফলতঃ সূত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যার তারতম্য আছে। এটা নিছকই টেকনিক্যাল একটি সমস্যা। বেশিরভাগ জায়গাতেই পৃষ্ঠা ক্রমিকের পাশে বন্ধনীর মধ্যে লাইন ক্রমিকও

দেওয়া হয়েছে।

হয় এবং হওয়া

ব্যক্তি-কে (ফরাসীতে অ্যান্দিভিদু) যদি অস্তিত্ব বা হয় (ফরাসীতে এত্র ইংরেজিতে বিয়িং) হিসেবে ধরতে হয়, তাহলে মুশকিল আছে। কারণ তা পরমাণু এবং পরমাণুর জীবন অসীম, এবং তার হওয়ার-ও (ফরাসীতে দ্যভনির ইংরেজিতে বিকামিং) কোনো শেষ নেই। পদার্থ একটা একটা রূপ গ্রহণ করতে পারে। এবং সেই পদার্থ-রূপের সম্পর্কের মধ্যে অস্তিত্বের জনন হয়। যেহেতু পরমাণুর মধ্যে, পদার্থের মধ্যে, বা আরো ভালো করে বললে, রূপের মধ্যে স্বতন্ত্র চরিত্রবৈশিষ্ট্যের নিশ্চিত ধারা পাওয়া যায় না, তাই সেই বাস্তবতার মধ্যে থেকেই ব্যক্তিকরণের নীতির দিকে ঝুঁকতে হয়।

ব্যক্তিকরণের নীতিটি অস্তিত্বজননের একটি উল্টো রূপকে দেখিয়ে দেয়। ব্যক্তির জননকে তার বৈশিষ্ট্য সহ সম্পূর্ণভাবে দাঁড় করাতে গেলে, একটা প্রাথমিক কিছুর অস্তিত্ব ধরে নিতেই হবে। নীতি হিসেবে, যা ধারণ করবে সেইগুলিকে, যার জন্য ব্যক্তিটি ব্যক্তি হল। যেগুলির মাধ্যমেই তার স্বতন্ত্র চরিত্রবৈশিষ্ট্যগুলোর সামগ্রিক ধারনা পাওয়া যায়।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১০ (১১-১৮)

ব্যক্তিকরণের নীতিটি ব্যক্তিকরণকে একটা প্রক্রিয়া হিসেবে করায়ত্ত্ব করে না। ওই প্রক্রিয়াটির মধ্যে সক্ষমতার চাহিদার অস্তিত্ব আছে, পদার্থ এবং রূপের জ্ঞানের মধ্যে নীতিটিকে ধরা হয় পদার্থ এবং রূপ দুইয়ের মধ্যেই আছে, কারণ ব্যক্তিকরণের প্রক্রিয়াটি নিজে ওই নীতিটিকে বহন করতে সক্ষম না, শুধু বাস্তবায়ন করতে পারে।

ব্যক্তিকরণের নীতির খোঁজ চলে ব্যক্তিকরণের পরে ও আগে। যেমন ব্যক্তির ভৌত, প্রাযুক্তিক ও জৈব মডেল। কিন্তু এই আগে ও পরের মধ্যে থাকে একটি ঝাপসা এলাকা, যা ব্যক্তিকরণের প্রক্রিয়াটিকে উদ্ধার করে।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১১ (২২-৩৬)

ব্যক্তিকরণের প্রক্রিয়াটিকে ধরা হয় ব্যক্তিকে বোঝার একটা স্টেপ বা সিঁড়ি হিসেবে। কিন্তু তারও আগে থাকে ব্যক্তিকরণের নীতি। যা ওই প্রক্রিয়াটির মধ্যেও কাজ করে।

বিপরীতে আমরা মনে করি, ব্যক্তিকরণ কেবল ব্যক্তি তৈরি করে না। আমরা ব্যক্তিকরণকে ব্যক্তিতে পৌঁছনোর সিঁড়ি হিসেবে খুঁজব না।

আমরা চেষ্টা করব অন্টোজেনেসিস বা অস্তিত্বজননতাকে বাস্তবতার সমস্ত প্রবাহের মধ্যে ধরতে। এবং ব্যক্তিকে জানতে চাইব ব্যক্তিকরণের মাধ্যমে, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিকরণকে জানার বদলে।

সিমন্দঁ (২০০৭), প্রায় অনুবাদ, পৃ ১২ (১–১৫)

ব্যক্তিকরণকে একমাত্র অস্তিত্বজনক বলে ধরা হয়, যতক্ষণ না তার কার্যক্রম শেষ হচ্ছে। সুতরাং ব্যক্তিকরণকে অবশ্যই ধরতে হবে আংশিক এবং আপেক্ষিক সমাধান হিসেবে, যা উদ্ভাসিত হয় সম্ভাবনাগুলির এক অন্তর্লীন ব্যবস্থায়। এবং তা ধারণ করে এক নির্দিষ্ট অসামঞ্জস্য যা কিনা নিজেরই মধ্যেকার, টানাটানির শক্তিগুলির অসামঞ্জস্য, এবং যদিও সেগুলির মাত্রার দিক থেকে চরম টার্মগুলোর মধ্যেকার পারস্পরিক বিনিময় অসম্ভব।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১২ (৩০–৩৯)

অস্তিত্বজনন–এর মানে দাঁড়াচ্ছে এখানে ব্যক্তির জনন। অস্তিত্ব বা হয়–এর হয়ে ওঠার যে চরিত্র, তা। হয়ে ওঠার আগে অস্তিত্ব যে দশার মধ্যে দিয়ে যায়।

অস্তিত্ব বা হয়, এবং হওয়া–র বৈপরীত্য : তা হয়ত নয়।

সিমন্দঁ (২০০৭), প্রায় অনুবাদ, পৃ ১২–১৩

কিন্তু হয়ে ওঠা বা হওয়া অস্তিত্ব বা হয়–এর একটি মাত্রা, অস্তিত্বের একটা সক্ষমতার তুল্য, যা নিজের দশাকে গড়ে তোলে, নিজের মধ্যে সমাধিত হয় ওই দশা গঠনের জন্য। প্রাক–ব্যক্তি অস্তিত্ব হলো — সেখানে কোনো দশা থাকে না।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৩ (৮–১৩)

হয়ে ওঠা বা হওয়া হলো অস্তিত্বের একটি মাত্রা। সমাধানের একটি সূত্র বা ধারা। সূচনার অসামঞ্জস্যের, পরিপূর্ণ সম্ভবনার।

ব্যক্তিকরণ হল অস্তিত্বের মধ্যেকার দশার চেহারার অনুরূপ, যা হল অস্তিত্বের দশা। ব্যক্তিকরণ হয়ে ওঠার শেষে ফলাফল নয়। বরং তা নিজেই হয়ে ওঠার নির্মাণ, বলা যেতে পারে, অস্তিত্বের বা হয়–এর সংরক্ষণ — হয়ে ওঠার বা হওয়ার সময়ে।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৩ (১৬–২২)

ব্যক্তিকরণ নিয়ে চিন্তা করতে গেলে, অস্তিত্বকে বা হয়–কে অবশ্যই ভাবলে চলবে না বস্তু হিসেবে, বা পদার্থ হিসেবে, বা রূপ হিসেবে; ভাবতে হবে ঝোঁকা ব্যবস্থা হিসেবে, অতিপৃক্ত, ঐক্য–র তলের নিচে, শুধু নিজের মধ্যেই গঠিত নয়। এবং পর্যাপ্তভাবে ভাবাও যাবে না যদি না ওই তিন নীতির মাধ্যমটি বাদ দেওয়া হয়। জমাটবিদ্ধ অস্তিত্ব, বা

পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্ব, অর্থাৎ প্রাক–ব্যক্তি অস্তিত্ব, তা হলো একটি অস্তিত্ব — যা এক ঐক্য–র চেয়ে বড়ো। ঐক্য, ব্যক্তিকৃত অস্তিত্বের চরিত্র বৈশিষ্ট্য, এবং অভেদ, এগুলি অনুমোদন করে ওই তিন নীতির ব্যবহার। ওগুলি প্রযোজ্য নয় প্রাক–ব্যক্তি অস্তিত্বের জন্য।

ঐক্য এবং অভেদ কেবল প্রযোজ্য অস্তিত্বের দশাগুলির একটির জন্য, ব্যক্তিকরণ হয়ে যাবার পর।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৩ (৩৩–৪১), পৃ ১৪ (১–৮)

অর্থাৎ, ব্যক্তিকরণ থেকে ব্যক্তিকে বোঝা, উল্টোটা নয় — এইভাবেই ব্যক্তিকরণকে অস্তিত্ব বা হয়–এর একটা দশাতে পরিণত করা হল। অর্থাৎ ব্যক্তিকরণও হয়ে গেল হয় বা অস্তিত্বের একটা অংশ। হয়ে ওঠার বা হওয়ার সময়ে। অর্থাৎ কেবল ব্যক্তি আর হয় বা অস্তিত্ব নয়। ব্যক্তিকরণ–ও একটা অস্তিত্ব। প্রাক–ব্যক্তি অস্তিত্ব। অনুবাদে বার বার ব্যক্তিকৃত অস্তিত্ব কথাটা ব্যবহার করা হবে এই জন্য। ব্যক্তি কথাটার ব্যঞ্জনা হল ব্যক্তিকৃত অস্তিত্ব।

অধিস্থিতি সাম্য

ব্যক্তিকরণকে পর্যাপ্তভাবে চিন্তা করা ও বর্ণনা করা যায় না, কারণ আমরা একটাই মাত্র সাম্যের রূপের কথা জানি, তা হলো স্থিতি সাম্য। আমরা জানি না মেটাস্টেবল বা অধিস্থিতি সাম্যর কথা। ভেতরে ভেতরে ধরে নেওয়া হয় যে অস্তিত্ব হলো স্থিতি সাম্য। কারণ, স্থিতি সাম্য বাদ দিয়ে দেয় হওয়া–কে, কারণ তা হলো সাম্ভাব্য স্থিতিশক্তির সবচেয়ে নিচের স্তর। এই ধরনের সাম্য, যা অর্জিত হয় একটা ব্যবস্থার মধ্যে যেখানে সমস্ত ধরনের সম্ভাব্য রূপান্তর উপলব্ধ হয়ে গেছে এবং আর কোনো বল পড়ে নেই। সমস্ত সম্ভাব্যতার বাস্তবায়ন হয়ে গেছে, এবং ব্যবস্থাটি তার শক্তির সবচেয়ে নিচের স্তরে চলে এসেছে এবং আর নতুন পরিবর্তনের সামর্থ্য নেই তার। প্রাচীনকালে কেবল এই স্থিতি এবং অস্থিতি, স্থির এবং গতিশীল, এই দুটি দশার কথাই জানা ছিল। অধিস্থিতি–কে পরিষ্কারভাবে এবং বিষয়গতভাবে জানা ছিল না। অধিস্থিতিকে সংজ্ঞা দিতে গেলে, ব্যবস্থার স্থিতিশক্তির ধারনা, শৃঙ্খলার ধারনা ও তার এনট্রপি–র বৃদ্ধির ধারনায় হস্তক্ষেপ করতে হবে।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৪ (১৪–৩১)

অধিস্থিতি সাম্যের ধারণা ব্যক্তিকরণকে অস্তিত্বের একটি দশা হিসেবে বোঝার জন্য অত্যন্ত জরুরী একটা বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার। তবে অধিস্থিতি সাম্য ভৌত

পরিসরে আমরা জানি, বিজ্ঞানের অঙ্গ হিসেবে। কিন্তু, ভৌত পরিসরে ব্যক্তিকরণের ধারনার আলোচনা এক রকমের। জীবন্ত পরিসরে আরেক রকমের। আমরা মূলতঃ উৎসাহী জীবন্ত পরিসরে ব্যক্তিকরণের ধারনা নিয়ে।

জীবন্ত পরিসরে ব্যক্তিকরণ

> *জীবন্ত পরিসরে এই অধিস্থিতির ধারনা ব্যবহার করা যায় ব্যক্তিকরণকে বিশেষিত করার জন্য। কিন্তু ভৌত পরিসরের মতো এখানে ব্যক্তিকরণ তাৎক্ষনিক, কোয়ান্টাম, স্থূল এবং নির্ধারক হিসেবে উৎপাদিত হয় না, যার পরে পড়ে থাকে পরিপার্শ্বের এবং ব্যক্তির এক দ্বৈততা; পরিপার্শ্ব যেখানে ব্যক্তির অভাবে থাকে, আর ব্যক্তি না হতে পারে পরিপার্শ্বের মতো বড়ো মাত্রার। সেই একই ব্যক্তিকরণ থাকে নিঃসন্দেহে জীবন্তের জন্য চরম মৌলিক কিছু হিসেবে। কিন্তু সে নিজেকে দ্বিগুণ করে ফেলে এক চিরন্তন ব্যক্তিকরণে, যা কিনা জীবন নিজেই, যা হওয়া-র মৌলিক ধারা: জীবন্ত নিজের মধ্যে সংরক্ষণ করে স্থায়ী ব্যক্তিকরণের একটি সক্রিয়তাকে।*
>
> *সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৬ (২৭-৪০)*

> *জীবন্তের মধ্যে আছে ব্যক্তির দ্বারা এক ব্যক্তিকরণ, এবং কেবলমাত্র এক কার্যকলাপ নয় যা একবারে ঘটে যাওয়া এক ফলাফলস্বরূপ ব্যক্তিকরণ নয়, যার সাথে তুলনা করা যায় ফেব্রিকেশন বা বানানো-কে। জীবন্ত সমাধান করে সমস্যাগুলির, কেবল অভিযোজনের মধ্যে নয়, অর্থাৎ নিজের সঙ্গে পরিপার্শ্বের সম্পর্কের পরিবর্তনের মধ্যে নয় (যেমন একটা মেশিন করতে পারে), বরং নিজেরই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, নয়া আভ্যন্তরীন কাঠামো তৈরি করার মধ্যে দিয়ে, জীবন্ত সমস্যাগুলির স্বতঃসিদ্ধগুলির মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঢুকিয়ে দিয়ে। জীবন্ত ব্যক্তি হলো ব্যক্তিকরণের ব্যবস্থা, ব্যক্তিকরণ হতে থাকা ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিকরণ হওয়া ব্যবস্থা।*
>
> *সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৭ (১৪-২৫)*

এখানে দুটি উল্লেখযোগ্য কথা বলতে হয়। জীবন্ত ব্যক্তিকরণে ব্যক্তি নিয়েই ব্যক্তিকরণের আধার। ব্যক্তিকরণ ব্যক্তিতে চিরন্তন। স্থায়ী। সিমন্দঁ তাকে বলছেন, জীবন নিজেই চিরন্তন ব্যক্তিকরণ। দেল্যুজ ব্যক্তিকরণ বলতে বুঝেছিলেন অন্তর্লীন ভূমিকে উপরিতলে নিয়ে আসার সম্পর্ক হিসেবে। জীবনের শেষের দিকে অন্তর্লীন কী তা বলতে গিয়ে দেল্যুজ বলেছিলেন, প্রাণ। এখানে সিমন্দঁ 'জীবন্ত ব্যক্তি' শব্দবন্ধ ব্যবহার করে তাকে ব্যক্তিকরণের

বিষয় ও বিষয়ী হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন ওপরের প্যারাগ্রাফের শেষ লাইনে।

ভাবোদ্রেক এবং আবেগোদ্রেক

ব্যক্তিকরণের মধ্যে সচেতনতার ভূমিকা বাজেভাবে সংজ্ঞায়িত কারণ সচেতন মননকে ধরা হয় অনির্দেশ্য বহুতা (পারমাণবিক মতবাদে) অথবা অচ্ছেদ্য ও ধারাবাহিক শুদ্ধ একতা (মনোজাগতিক পরমাণুবাদ-এর বিপরীত মতবাদগুলিতে, যেমন কিনা বার্গসনবাদ বা রূপ-এর তত্ত্বের শুরুতে) হিসেবে। বাস্তবতঃ যেহেতু ধরা হয়, ব্যক্তি-ত্ব হল সচেতনতার একটি অবস্থা, সচেতনতার একটি কাজ এবং গুণ, এবং পরিমাণগত, তাই চরম একতা ও অসীম বহুতার মধ্যে একটা মধ্যস্ততা আবিষ্কার করা সম্ভব। ...

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ৯৭ (১২-২৩)

ব্যক্তি ব্যক্তিকরণ করে নিজেকে সেইসব বন্দোবস্তের মধ্যে দিয়ে যেখানে সে অনুভব করে অস্তিত্বগুলিকে, গঠন করে এক ব্যক্তিকরণ কাজের মধ্যে দিয়ে অথবা বানানো নির্মাণের মধ্যে দিয়ে, এবং অংশ নেয় ব্যবস্থাটায় তার ব্যক্তিগত বাস্তবতা ও তার নিজের অনুভব করা ও গঠন করা বস্তুগুলির অংশীভূত হয়ে গিয়ে।

ভাবোদ্রেক এবং আবেগোদ্রেক হল মনোজগতের চমৎকার আড়প্রসারী রূপ-ও, স্বচ্ছ সচেতনতা এবং অবচেতনার মধ্যবর্তী, ব্যক্তির নিজের এবং দুনিয়ার কাছে সে যা, এই দুয়ের মধ্যেকার স্থায়ী ঘনিষ্ঠতা। অথবা বরং ব্যক্তির নিজের সাথে সম্পর্ক এবং দুনিয়ার সাথে সম্পর্কের মধ্যের ঘনিষ্টতা। ভাবোদ্রেক ও আবেগোদ্রেকের স্তরে কার্যকারণের সম্পর্ক ও অন্তিমতার সম্পর্ক পরস্পরবিরোধিতা করে না : ভাবোদ্রেক-আবেগোদ্রেকের সমস্ত নড়াচড়া একইসাথে বিচার ও কৃত কার্যক্রম। একতার মধ্যে বাস্তবতঃ তারা দ্বিমেরু।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ৯৮ (১৫-২৫)

ভাবোদ্রেক-আবেগোদ্রেকের এই মেরুকরণ পুষ্ট হয় নিজে নিজেই, সেইসব উপাচারের মধ্যে যেখানে সে (ব্যক্তি) হল একটা লব্ধি অথবা ধারন করে একটা অভিসন্ধিতাকে।

সে একইসাথে স্বয়ং-স্থাপন ও বিষম-স্থাপন।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ৯৮ (২৭-৩০)

এখানে ভাবোদ্রেক এবং আবেগোদ্রেক-কে বলা হয়েছে সচেতনতা এবং অবচেতনার মধ্যবর্তী স্তরের বিষয়। বিচার এবং কৃত কার্যক্রম একসাথে

কাজ করে এই ভাবোদ্রেক এবং আবেগোদ্রেকের স্তরে। ব্যক্তির গতিবিধি রচিত হয়ে এই স্তরে। সচেতনতার স্তরে বা অবচেতনার স্তরে নয়।

অবচেতন ভাবোদ্রেকের তাৎপর্য

মনোবিশ্লেষণ ভালোভাবে চিহ্নিত করে যে ব্যক্তির মধ্যে থাকে এক অচেতন। কিন্তু সে ধরে নেয় যে সেই অচেতন যেন এক পূর্ণাঙ্গ মনোজগৎ। তার কিছু প্রতিফলন পাওয়া যায় সচেতনতার মধ্যে এবং তাকে তখন জানতে পারা যায়। বিপরীতে আমরা ধরে নেব যে মৌলিক অচেতনের একটা স্তর আছে যা হলো বিষয়ীর কাজের সক্ষমতা : যে কার্যকলাপের মন্তাজ শুদ্ধ সচেতনতা দিয়ে খুব একটা জানা যায় না।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ৯৯ (৩–১১)

স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকলাপের সারণী প্রবাহিত হয় একভাবে যাতে পদ্ধতিগুলির স্মারকচিহ্নগুলিকে সচেতনে মনে হয় খুবই দুষ্প্রাপ্য এবং ঠিক পর্যাপ্ত নয় একটা গ্রহণযোগ্য ভিত্তি গঠন করার পক্ষে। বিপরীতে প্রতিরূপ অনেক বেশি পরিষ্কার। অচেতন প্রতিরূপ উপাদানগুলো দুষ্প্রাপ্য নয়, বরং সংক্ষিপ্তসার, নামমাত্র রেখচিত্র, এবং সাধারণতঃ আবিষ্কারে ও সত্যিকারের প্রগতিতে অক্ষম : তারা রয়ে যায় গতেবাঁধা মোটাদাগের এবং প্রতিনিধিত্বকারী বাস্তবতার ক্ষীণ প্রকাশ। উল্টোদিকে সচেতনতা ও অচেতনের সীমায় পাওয়া যায় অবচেতনের এক স্তর, যা আবশ্যিকভাবে ভাবোদ্রেককারী এবং আবেগোদ্রেককারী। এই সম্পর্কিত স্তরটিই গঠন করে ব্যক্তিত্ব–র কেন্দ্রটিকে। এই অদলবদলগুলিই ব্যক্তির অদলবদল। ভাবোদ্রেক ও আবেগোদ্রেক পরিমাণগত পুনর্গঠনকে ধারন করতে সক্ষম। তারা এগোয় মাত্রাগতভাবে এবড়োখেবড়ো লম্ফনের মাধ্যমে, এবং মেনে চলে সূত্রপাতের নিয়ম। তারা হলো শুদ্ধ ধারাবাহিক এবং শুদ্ধ অধারাবাহিকের মধ্যে সম্পর্ক। তারা হলো সচেতনতা এবং কাজ–এর মধ্যে সম্পর্ক। ভাবোদ্রেক এবং আবেগোদ্রেক ছাড়া সচেতনতাকে দেখতে লাগে মস্তিষ্কের এক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, এবং কাজ–কে দেখায় পরিপ্রেক্ষিতহীন ফলাফলহীন ধারাবাহিকতাহীন।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ৯৯ (১২–৩৫)

যেহেতু আমরা একটা গোষ্ঠীর বা একদল মানুষের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে কথা বলতে পারি, তা কাজের সাধারণত্বের কারণে নয়, খুবই ধারাবাহিকতাহীন তা, এক শক্ত ভিত্তি হিসেবে তাকে দাঁড় করানোর পক্ষে; সচেতন প্রতিনিধিত্বমূলক আত্মপরিচয়ের জন্যও নয়, তা খুবই বড়ো এবং খুবই

ধারাবাহিক, কিছু গোষ্ঠীতে ভেঙে ফেলার পক্ষে; ওই ভাবোদ্রেক আবেগোদ্রেকের স্তরে, প্রতিনিধিত্ব এবং কাজ-এর মিশ্রণে, সেগুলোই তৈরি করে সামূহিক গোষ্ঠী। আন্তঃব্যক্তি অংশগ্রহণ সম্ভব যখন ভাবোদ্রেক-আবেগোদ্রেককারী বয়ানগুলো একই।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১০০ (৩-১৩)

ভাবোদ্রেক এবং আবেগোদ্রেক কী করে? সচেতনতার ভিত্তি তৈরি করে। কাজ-এর দৃশ্যমান কাটা কাটা রূপের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া যোগাযোগ হিসেবে কাজ করে। এবং একইসাথে ভাবোদ্রেক ও আবেগোদ্রেক, তাদের বয়ানের সাদৃশ্য দিয়ে আন্তঃব্যক্তি কোনো কিছুকে তৈরি করে।

ভাববিনিময় এবং প্রকাশের মধ্যে ভাবোদ্রেক

যেমন পরিপার্শ্বের মধ্যে না থেকেও, ব্যক্তি থেকে যেতে পারে এবং সক্রিয় হিসেবে। মৃত্যুতে ব্যক্তি হয়ে ওঠে প্রতি-ব্যক্তি। সে বদলে ফেলে তার চিহ্ন। কিন্তু থেকে যায় তার অস্তিত্বের মধ্যে, তার ব্যক্তিগত না থাকার রূপের নিচে। দুনিয়া তৈরি আসল জ্যান্ত ব্যক্তি দিয়ে, যারা বাস্তব, এবং 'স্বাতন্ত্র্যের গহ্বর' গুলি নিয়ে। সত্যিকারের নেতিবাচক ব্যক্তি তৈরি হয় ভাবোদ্রেক এবং আবেগোদ্রেকের শাঁস থেকে। এবং তা থাকে চিহ্ন হিসেবে। যে মুহূর্তে একজন ব্যক্তি মরে যায়, তার কাজকর্ম অসম্পূর্ণ হয়ে যায়, এবং বলতে পারা যায় যে তা ততক্ষণ অসম্পূর্ণ থাকবে যতক্ষণ না তা বাঁচছে সেই ব্যক্তিবর্গের হাত ধরে যারা সক্ষম তা-কে পুনঃ-আসলিকরণ করতে — সেই কার্যকরী অনুপস্থিতিকে, সচেতনতা এবং কাজ-এর বীজ-কে। জীবন্ত ব্যক্তিবর্গের ওপরেই বর্তায় যারা মারা গেছে তাদের রক্ষা করার দায়ভার। জীবন্তদের অবচেতন পুরোটাই বোনা সেই রক্ষা করার দায়ভার দিয়ে যার মধ্যে থাকে মরা ব্যক্তিরা, যারা বিরাজ করে অনুপস্থিত হিসেবে, চিহ্নসমূহ রূপে যা জীবন্তদের মধ্যে ফিরে আসে। ধর্মীয় মতবাদের চেয়ে ভালো আত্মিকভাবে গড়ে তোলা এই পারিপার্শ্বিক হলো মৌলিক অনুভূতির। ধর্ম হলো আড়ব্যক্তিগত পরিসর। পবিত্র পুরোটা সমাজের মধ্যে তৈরি হয় না। পবিত্র পুষ্ট হয় জীবন্তের দায়িত্বে অস্তিত্বের চিরকাল থেকে যাওয়ার ভাবানুভূতি থেকে, যে থেকে যাওয়াটা নড়বড়ে এবং ভঙ্গুর। মৃতের ভয়ের মধ্যে পবিত্র সংস্কারগুলির সৃষ্টিকে খোঁজা একটা ব্যর্থ গবেষণা। ওই ভয় প্রতিষ্ঠা পায় একটি অভাবের আভ্যন্তরীন ভাবানুভূতির ওপর, যা উত্থিত হয় যখন

জীবন্ত বোধ করে — এভাবেই সে তার অনুপস্থিতির বাস্তবতাকে, তার বাস্তব চিহ্নটিকে, বিসর্জন দিতে পারবে।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১০২ (১৭–৪০), পৃ ১০৩ (১–৭)

মিথ বা অতিকল্প এখানে নিয়ে আসে একটা সুগভীর বোধ, কারণ সে কেবল কাজের প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যকরীতা নয়, বা কাজের সহজ উপায় নয়। আমরা মিথের হিসেব করতে পারি না প্রতিনিধিত্ব বা কাজ দিয়ে। কারণ সে কেবল অনিশ্চিত প্রতিনিধিত্ব নয় বা কাজ করার পদ্ধতি। মিথের সূত্র হলো ভাবোদ্রেক–আবেগোদ্রেক, এবং মিথ হলো অস্তিত্বের হওয়ার সাপেক্ষে ভাবানুভূতিগুলির বাণ্ডিল। সেই ভাবানুভূতিগুলি টেনে নিয়ে যায় তাদের সাথে প্রতিনিধিত্বের উপাদানগুলিকে এবং সক্রিয় সচলনগুলিকে, কিন্তু তাদের বাস্তবতাগুলি হলো তাদের লটবহর, এবং সেগুলি আবশ্যিকভাবে মিথ নয়।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১০৩ (২৬–৪১)

ব্যক্তি এবং পরিপার্শ্ব এখানে একে অন্যের পরিপূরক নয়। অনুপস্থিত ব্যক্তিও থেকে যেতে পারে পরিপার্শ্বে। উপস্থিত বা জীবন্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দিয়ে।

সিমন্দঁ এখানে ব্যক্তিকে তার নিজস্ব একটি বর্ণনায় অভিহিত করেছেন। যে ব্যক্তি সিমন্দঁ–র বিষয়ী। সে হল আড়ব্যক্তি। সিমন্দোঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধারনা — ট্রান্সইন্ডিভিজুয়াল / ত্রাঁসঅ্যান্দেভিদু। এর বাংলা আমি করেছি, আড়ব্যক্তিগত / আড়ব্যক্তি।

আড়ব্যক্তিগত

আধ্যাত্মিকতা পর জীবন নয়, এবং ইহ জীবনের চেয়ে বেশি কিছু নয়। সে একইসাথে পর এবং ইহ। সে হলো একটা ঊর্ধতন জীবনের মধ্যে ইহ এবং পর জীবনের তালমিলের তাৎপর্যবাহী। আধ্যাত্মিকতা হলো সেই অস্তিত্বের তাৎপর্যবাহী যা পৃথক এবং পুনঃসংযুক্ত, একা এবং সামূহিক–এর একজন। ব্যক্তিকৃত অস্তিত্ব একইসাথে একা এবং না–একা। তার অবশ্যই দুটি মাত্রা আছে। সামূহিক যাতে থাকতে পারে, তাই জন্য ব্যক্তিকরণ আগেরটা থেকে পৃথক করা এবং প্রাক–ব্যক্তিকে নিয়ে চলা, যার মাধ্যমে সামূহিক নিজের ব্যক্তিকরণ (স্বাতন্ত্র্যকরণ — অনুবাদক) করে পৃথক অস্তিত্বকে পুন:সংযোজন করে। আধ্যাত্মিকতা হলো ব্যক্তিকৃত এবং সামূহিক এর সম্পর্কের তাৎপর্যবাহী। এবং সেই সম্পর্কের ভিত্তিতে

যে ফলাফল তৈরি হয়, তারও। অর্থাৎ, ব্যক্তিকৃত অস্তিত্ব পুরোপুরি ব্যক্তিকৃত নয়, বরং তাতে থেকে যায় কিছু অব্যক্তিকৃত, প্রাক-ব্যক্তিকৃত বাস্তবতার ছাপ, এবং যা সে সংরক্ষণ করে, শ্রদ্ধা করে, বাঁচিয়ে রাখে তার সচেতন অস্তিত্বে, কোনো জড় ব্যক্তিগতর ন্যায় তাকে ভুলে যাওয়ার বদলে। সেই জড় ব্যক্তিগত হলো একটি ভ্রান্ত স্বয়ম্ভু ব্যক্তি যে ভাবে সে কেবল নিজের জন্যই, যে নিজেকে অন্য কোনো কিছুর থেকে আসা বলে দেখতে পায় না (স্বয়ম্ভু ব্যক্তি — আসেইতে, লাতিন পণ্ডিতদের একটি টার্ম। স্পিনোজা এবং সোপেনহাওয়ার ব্যবহার করেছেন)। ব্যক্তি এবং প্রাক-ব্যক্তি-র এই সম্পর্ককে শ্রদ্ধা করাকেই বলে আধ্যাত্মিক। তা হলো আবশ্যিকভাবে ভাবোদ্রেক এবং আবেগোদ্রেক। আনন্দ এবং বেদনা, দুঃখ এবং মজা, এগুলো হলো তীব্রতম ফারাক, এই ব্যক্তি ও প্রাক-ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক বাদে আর যা বিষয়ীর মধ্যে পাওয়া যায়। অবশ্যই তাকে বললে চলবে না শুধু ভাবোদ্রেক দশা, সে ভাবোদ্রেক আদানপ্রদানও, আদানপ্রদান বিষয়ীর মধ্যেকার প্রাক-ব্যক্তি এবং ব্যক্তির মধ্যে। ভাবোদ্রেক-আবেগোদ্রেক হলো স্বাভাবিক অনির্দিষ্টতা এবং বাস্তব অস্তিত্বের নির্দিষ্টতার মধ্যে চলাচল। সে হলো, যার মধ্যমে অনির্দিষ্ট আরোহনটি কাজ করে বর্তমানে এবং যা সামূহিকের মধ্যে চারিয়ে যায়।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১০৫ (২৫-৪০), পৃ ১০৬ (১-১৮)

হয়ত একটি শুদ্ধ শারীরিক আনন্দ এবং বেদনা আছে। কিন্তু ভাবোদ্রেক-আবেগোদ্রেকের বহিঃপ্রকাশ এর আরো একটা তাৎপর্য রয়েছে, ব্যক্তি এবং প্রাক-ব্যক্তির সম্পর্ক সাধন করা-তে : ইতিবাচক ভাবোদ্রেককারী দশা নির্দেশ করে ব্যক্তির ব্যক্তিগত এবং আসল ব্যক্তিকরণের চলাচলের তালমিল। নেতিবাচক ভাবোদ্রেককারী দশা নির্দেশ করে বিষয়ীর এই দুই পরিসরের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। ভাবোদ্রেক-আবেগোদ্রেক কেবল ব্যক্তি অস্তিত্বের অন্তর এবং কাজ-এর লব্ধি নয়। সে হলো একটা রূপান্তর, তার সক্রিয় ভূমিকা এই খেলায়। সে বিষয়ী অস্তিত্বের মধ্যেকার এই দুই পরিসরের সম্পর্ককে প্রকাশ করে এবং সেই সম্পর্কের কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে বিষয়ী অস্তিত্বের কাজকে বদলে দেয়, সেই সম্পর্কের তালে আনে তাকে, এবং চেষ্টা করে সামূহিককেও ছন্দে আনতে। সামূহিকের মধ্যে ভাবোদ্রেকের প্রকাশের একটা নিয়ামক মূল্য আছে। শুদ্ধ কাজ-এর এইরকম নিয়ামক মূল্য থাকবে না যখন প্রাক-ব্যক্তি নিজেকে ব্যক্তিকরণ করে বিভিন্ন বিষয়ীর মধ্যে সামূহিক-কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আবেগ হলো এই ব্যক্তিকরণ, যা আড়ব্যক্তিগত বর্তমানের মধ্যে কার্যকরী হয়। কিন্তু ভাবোদ্রেক নিজে থাকে আবেগের আগে ও পরে। সে হলো,

বিষয়ীর মধ্যে, যে কিনা ভাষান্তর করে এবং সামূহিকে চিরস্থায়ী করে রাখে ব্যক্তিকরণের সম্ভবনাকে।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১০৬ (১৯–৪১), পৃ ১০৭ (১–৪)

ব্যক্তির সমস্যা যা তা বোধের দুনিয়ার সমস্যা। কিন্তু বিষয়ীর সমস্যা হলো বিষমতার সমস্যা, বোধের দুনিয়া এবং ভাবের দুনিয়ার মধ্যে, ব্যক্তি এবং প্রাকব্যক্তির মধ্যে। এই সমস্যা হলো বিষয়ীর বিষয়ী হিসেবে সমস্যা। বিষয়ী হলো ব্যক্তি এবং ব্যক্তির চেয়ে আলাদা। সে নিজের সাথে মানানসই নয়। কাজ সমাধা করতে পারে না ভাবোদ্রেকের বোধ এবং আবেগের সমস্যাকে যে ভাবোদ্রেকের কাছে কাজ এবং আবেগ হলো পরস্পরের পরিপূরক, একজন আরেকজনের প্রতীকী, সামূহিকের ঐক্যের মধ্যে। কারণ সেখানে হয় কাজ এবং আবেগের অনুরণন। সেখানে এক ঊর্ধতন ব্যক্তিকরণ হতেই হয়, যা সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় : সেই ব্যক্তিকরণ হলো সামুহিকের ব্যক্তিকরণ।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১০৮ (১৫–২৭)

আধ্যাত্মিকতা নেই শুদ্ধ ভাবোদ্রেক-এ, নেই বোধের সমস্যার শুদ্ধ সমাধানে। যদিও আবেগ পারে ভাবোদ্রেকের সমস্যার সমাধান করতে, যদিও কাজ পারে বোধের সমস্যার সমাধান করতে, সেখানে থেকে যায় একটা ফাঁক যা বুঁজিয়ে ফেলা অসম্ভব, যা থাকে অস্তিত্বে, ভাবোদ্রেক এবং বোধের মধ্যে, হয়ে ওঠে আবেগের ঐক্য, বোধের ঐক্য। কিন্তু তাদের সংশ্লেষ এর সম্ভবনা হলো সমস্যাজনক।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১০৮ (৩৫–৪১)

জায়মান সামূহিকের অভ্যন্তরে বোধ এবং ভাবের মধ্যে আদানপ্রদান তৈরি করে সত্যিকারের কাজ এবং সত্যিকারের আবেগের মধ্যে ঐক্যের শর্ত। কাজ ও আবেগ জন্ম নেয় যখন সামূহিক ব্যক্তিকরণ করে নিজেকে। সামূহিক, বিষয়ীর কাছে, ভাবোদ্রেক এবং বোধের আদানপ্রদান, আদান প্রদান যা ঐক্যবদ্ধ করে এই দুই পরিসরকে প্রত্যেকবার তাদের নিজেদের মধ্যে এবং তাদের নয়া মাত্রা সংযোজন করে। কাজের সার্বজনীন দুনিয়ার সক্রিয় যাত্রাপথে, আবেগের অন্তর্লীনতা সম্ভব। আবেগ হলো দুনিয়ার মেরুত্ব, একইসাথে সে বিষয় এবং বিষয়ী।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১০৯ (৫–১৬)

উল্টোদিকে, আবেগে, যেমন বিষয়ীর মধ্যে, থাকে এক অন্তর্লীন কাজ। আবেগ অস্তিত্বকে উপরিতল হিসেবে গঠন করে। আবেগ নিজেকে প্রসারিত করে দুনিয়ায় কাজের রূপের নিচে যেমন কাজ নিজেকে প্রসারিত করে বিষয়ীর নিচে আবেগের রূপের নিচে: এক আড়প্রসারী

শৃঙ্খলা তৈরি হয় শুদ্ধ কাজ এবং শুদ্ধ আবেগ জুড়ে জুড়ে।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১০৯ (২২–২৭)

ব্যক্তিগত মানুষ তৈরি করে না তার কর্মকান্ড, মানুষ হিসেবে তার সারবস্তু কে পরিত্যাগ করে। মানুষ হিসেবে সে একটা প্রজাতি মাত্র, সম গণ কিন্তু নির্দিষ্ট ফারাকে।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১১০ (৩২–৩৭)

আধ্যাত্মিকতা নিয়ে এখানে বলা আছে। এখানে একটি ফেসবুক পোস্ট উদাহরণ স্বরূপ দিচ্ছি, আধ্যাত্মিকতা বিষয়টাকে আরেকটু ব্যাখ্যা করার জন্য। হতেই পারে, পোস্টটিতে আধ্যাত্মিকতা যেভাবে বলা আছে, তা সিমন্দঁ–র ব্যাখ্যার সাথে পুরোপুরি মেলে না, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা যে একইসাথে ইহ এবং পর জীবন তা এই পোস্টে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

টিপ্পনি : আত্মিকতা–আধ্যাত্মিকতা

শস, ফেবুপো, ২৩।১২।২০১৮

অ–দা কাল লিখেছিল, আমাদের ভারতবর্ষে জাতি ধর্ম ইত্যাদি বৈরিতা বেশ কম, এমনকি শ্রেণীগত বৈরিতাও বেশ কম। সে কারণে কৌমদাঙ্গা খুব কম হয় (এবং তা আশীর্বাদ)। ফলতঃ এখানে আলাদা করে সম্প্রীতি–সচেতনতার প্রয়োজন নেই।

আমাদের এখানে কৌমদাঙ্গা বেশ কম। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দাঙ্গা, অর্থাৎ বহু মানুষের সংগঠিত আক্রমণ / আগ্রাসন সমূহের মধ্যে বিশ শতাংশও হয়ত কৌমদাঙ্গা নয় (এক্সাক্ট পরিসংখ্যান ভুলে গেছি, সাইটে পাওয়া যায়)। আশি শতাংশ কৌমদাঙ্গারই লক্ষ্য প্রশাসন। যেমন এইবছরের শুরুতে ইএম বাইপাসে দু–জন সাইকেল চালক বাসের তলায় চাপা পড়ার পর যে কৌমদাঙ্গা হয়, তার লক্ষ্য ছিল প্রশাসন, সেরকম।

আমি অভিজিৎদার কথাটাকে আরেকটু বাড়াতে চাই। জাতি ধর্ম জাত বৈরিতা বেশ কম আমাদের এখানে, একথার সাথে আমি একশ' শতাংশ একমত। সেকারণেই বৈরিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি ছেয়ে ফেলতেও পারে না আমাদের দেশের জনসমাজকে। কিন্তু বৈরিতার সম্পূরক যে আত্মীয়তা, তা কি কম?

কম তো নয়ই। আমার তো বেশি বলেই মনে হয়। অন্য অনেক ভূখণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি। এই যে এখন ইউরোপ আমেরিকা জাপানে ফ্যামিলি ফ্যামিলি বাই উঠেছে, প্রায় প্রতিটি হলিউড ছবি ফ্যামিলির বিজ্ঞাপন, এসবের মানে কী? মানে তো হল, ওখানে ওসব বেশ ভয়ঙ্কর রকমের কমে টমে গেছে বা গেছিল! কিন্তু আমাদের এখানে আত্মীয়তার আধিপত্য যাকে বলে!

পরিবার ছাড়াও আত্মীয়তার নানা অক্ষ হয়। ধর্ম জাতি ভাষা জাত দেশ কাল লিঙ্গ গায়ের রঙ কাজ বৃত্তি শখ নানাকিছু। এসবই আমাদের এখানে প্রবল।

আত্মীয়তার সম্পূরক বা পরিপূরক হল বৈরিতা। তাহলে আত্মীয়তা এত প্রবল হলে বৈরিতা এত প্রবল নয় কেন? কারণ, আমাদের দেশে আধ্যাত্মিকতার প্রাবল্য। যারা ইংরেজি স্পিরিচুয়ালিজমের বাংলা আধ্যাত্মিকতা জানবেন, তাদের কাছে মেলবন্ধনটা ধরতে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু বাংলা মাধ্যমের সমস্যা হবার কথা না। আধ্যাত্মিকতা হল আধি আত্মিকতা। আধি মানে ইংরেজিতে মেটা। আধিভৌত (মেটাফিজিক্যাল) এবং ভৌত (ফিজিক্যাল) এর মধ্যে সম্পর্ক যেমন, আধিভৌত হল ভৌত বিষয়ক ভৌত। স্তরের তফাত। কিন্তু আধিভৌত স্তর দাঁড়িয়ে কিসের ওপর? আবশ্যিকভাবে ভৌত স্তরের ওপর। (আমি বলছি বলে ভাবছেন এটা? আজ্ঞে না। এমনকি অ্যারিস্টটলও বলে গেছে)। ঠিক তেমনি, আধি আত্মিকতা হল আত্মিকতা বিষয়ক আত্মিকতা। তোমার মতো করে তোমাকে ভাবা। তোমার করে তোমাকে ভাবা। তোমার আল্লা যে আমার হরি সে। আমি যদি আমার হরিকে ভালোবাসি, তাহলে তোমার আল্লাপ্রেমকে অবজ্ঞা করতে পারব না। আধ্যাত্মিকতা মানে আমার ঈশ্বরভক্তি নয়। আমার গুরুর ঈশ্বরভক্তিকে হাততালি দেওয়া নয়। আধ্যাত্মিকতা মানে তোমাকে বোঝা তোমার করে। আধ্যাত্মিকতার স্তর দাঁড়িয়ে রয়েছে আত্মিকতার স্তরের ওপর। আত্মিকতা ছাড়া আধ্যাত্মিকতাও নেই।

আধ্যাত্মিকতা আত্মিকতার সম্পূরক বা পরিপূরক নয়। পূরক। পূরক মানে স্তরভেদে মিল, অর্থাৎ একই স্তরে যা অমিল, অন্য স্তরে তার সাথে মিল। অন্য স্তরে ভারসাম্য। এবং সেই অন্য স্তরের কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। সেখানে লাফিয়ে যাওয়া বা থেকে যাওয়া যায় না। আনুভূমিক স্তর বা মাটিতেই থেকে এই প্রপঞ্চ স্তরের হদিশ পাওয়া যায়। মাটি বা ইন্দ্রিয় স্তরের সাধন বিনা অবশ্য এই প্রপঞ্চ স্তরের হদিশ মেলে না। সাধন বিনা আধ্যাত্মিকতা আসে না। যে নিজের মেয়েকে ভালোবাসে না, সে অন্যের তার মেয়ের প্রতি ভালোবাসাকেও বুঝবে না। সম্পূরক বা পরিপূরক মানে একই স্তরে ভারসাম্য। ভণ্ডের ভারসাম্য। ভারসাম্যের ভণ্ডামী। রাষ্ট্রীয় ভারসাম্য।

যে রাষ্ট্র কল্পনা করে যে সে প্রপঞ্চ স্তরে চিরস্থিত, তার কোনো আত্মিক ভিত্তি নেই। অর্থাৎ জোরাজুরির ভারসাম্য। আত্মিকতা–বৈরিতার ভারসাম্য ভণ্ডামী। আত্মিকতা–আধ্যাত্মিকতার ভারসাম্য সত্যিকারের ভারসাম্য। জাগতিক।

বৈরিতার মতোই, রাষ্ট্রও কখনও আমাদের দেশে প্রবল ছিল না। আজও নেই। হবেও না।

উদ্বেগ

উদ্বেগকে হয়ত কেবল একটি অনুভূতি অথবা কেবল একটি আবেগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১১৩ (১২–১৪)

উদ্বেগের মধ্যে, বিষয়ী চায় নিজেকে সমাধান/লব্ধি করে নিতে, সামূহিকের মধ্যে না চলে গিয়ে। সে চায় নিজের ঐক্যের একটা স্তরে আসতে, তার প্রাক–ব্যক্তিগত অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত অস্তিত্বের একটি সমাধান/লব্ধির মাধ্যমে। প্রত্যক্ষ লব্ধি, মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে, প্রত্যাশাবিহীন লব্ধি। উদ্বেগ হলো একটা কাজবিহীন আবেগ, বোধবিহীন অনুভূতি। উদ্বেগ হলো অস্তিত্বের নিজেরই মধ্যে শুদ্ধ রয়ে যাওয়া। সন্দেহবিহীন, প্রত্যাশাবিহীন, কালপ্রবাহ বিহীন — এসবই মনে হতে পারে উদ্বেগে।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১১১ (৪০–৪১), পৃ ১১২ (১–৭)

উদ্বিগ্ন অস্তিত্ব দাবি করে নিজের মধ্যে, তার প্রকাশ্য এবং গোপন কাজে, সে হয়ত কেবল আবেগ, কারণ তার সামূহিক ব্যক্তিকরণ নেই, সমস্যা হিসেবে তার সমাধান/লব্ধি নেই। বিষয়ী নিজের সচেতনতাকে গ্রহণ করে বিষয়ী হিসেবে যে উদ্বেগ করছে, যে প্রশ্নের মধ্যে পড়েছে, এখনও পৌঁছতে পারেনি বাস্তবসম্মত ঐক্যে। উদ্বেগ সবসময় নিজের মধ্যে নিয়ে আসে নিজেকে এবং এগোয়না, গঠনও করে না, কিন্তু সে গম্ভীর আহ্বান পাঠায় অস্তিত্বকে এবং তাকেও নিজেকে গম্ভীর আহ্বান পাঠানো করায়। উদ্বেগের মধ্যে, অস্তিত্ব নিজের যথাযথ বিষয়ের মতো থাকে, কিন্তু সে এমন বিষয় যা নিজের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বলতে পারি যে, বিষয়ী সেখানে হয়ে যায় বিষয় এবং নিজের ঠিকঠাক ছড়িয়ে যাওয়াকে সহায়তা করে সেইসব দিকে যেদিকে তার আয়ত্ত্ব নেই। বিষয়ী হয়ে পড়ে দুনিয়া এবং সেখানকার গোটা পরিসর ও সমস্ত সময় ভরে ফেলে উদ্ভুত সমস্যাগুলি দিয়ে : এমন কোনো সমস্যা নেই বা এমন কোনো দুনিয়া নেই যা সেই বিষয়ীর নয় : এক সার্বজনীন প্রতি–বিষয়ী হিসেবে নিজে নিজেকে গড়ে তোলে যে যেন এক রাত্রি যা তৈরি সমস্ত দিক থেকে বিষয়ীর নিজেরই অস্তিত্ব দিয়ে। বিষয়ী সংযোজিত হয় সম্পূর্ণভাবে

যেন সে নিজের সঙ্গেই সংযোজিত হলো। সে আর স্থানীয় নয়, সে সার্বজনীন এক নিষ্ক্রিয় সংযোজনী বরাবর এবং সে নিজেকে ভোগায়। বিষয়ী সম্প্রসারিত হয় বেদনাহত হিসেবে তার আভ্যন্তরীনতাকে হারিয়ে। সে এখানে এবং অন্যত্র, এখানকার থেকে বিচ্ছিন্ন এক সার্বজনীন অন্যত্র–র আকর্ষণে। সে মনে করে সে নিজেই গোটা পরিসর এবং সমস্ত সময়, সেগুলোর সবখানে সে বিরাজমান অস্তিত্ব হয়ে উঠেছে, সে নিজেই পরিসরায়ণ করে, সে নিজেই সময়ায়ন করে, সে নিজেই হয়ে ওঠে স্থানাঙ্কহীন দুনিয়া।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১১২ (১১–৩৬)

ব্যক্তিগত অস্তিত্ব কেটে পড়ে, ছেড়ে চলে যায়। এবং তথাপি তার এই ছেড়ে চলে যাওয়ার তলায় থাকে এক ধরনের প্রবৃত্তি, অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে গিয়ে পুনর্গঠনের, দুনিয়াকে পুনর্ধারন করে, যাতে করে সব কিছু হতে পারে ব্যক্তিগত। উদ্বিগ্ন অস্তিত্ব স্থাপিত হয় সার্বজনীনে, অন্যত্র এক বিষয়ীত্ব খুঁজে পাওয়ার জন্য। সে সার্বজনীনের সঙ্গে বিনিময় করে, অবগাহন করে সার্বজনীনের মাত্রাগুলোয়। কিন্তু তার সার্বজনীনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয় না কাজ এবং কাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আবেগ দিয়ে, এবং তার আড়ব্যক্তিগত সম্পর্ককে পুনঃসংস্থাপিত করতে পারে না, যাতে করে তাকে মনে হতে পারে যে এক সামূহিক ব্যক্তিকরণ। উদ্বেগ তর্জমা করে কেবল বিষয়ী অস্তিত্বের শর্তকে। সে যায় ততটা, যতটা পারে যেতে সেই অস্তিত্ব একা একা। তার একধরনের ঝোঁক আছে না–বিষয়ী আড়ব্যক্তিগত ব্যক্তিকরণ অস্তিত্ব দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে যাওয়ার, কেবল যখন অন্যান্য বিষয়ী অসম্ভব হয়ে যায়। উদ্বেগ উপলব্ধি করে একা অস্তিত্ব সেই অবদি পৌঁছতে পারে যে উচ্চতায় বিষয়ী হিসেবে পৌঁছনো যায়। কিন্তু সেই উপলব্ধি হয়ে দাঁড়ায় কেবল একটা দশায় থিতু হওয়া, সে সফল হয় না নয়া কোনো ব্যক্তিকরণে, কারণ সে সামূহিক হতে বঞ্চিত। যদিও আমরা পরম নিশ্চিত হতে পারি না এই পয়েন্টে : বিষয়ী অস্তিত্বের উদ্বেগজনিত রূপান্তর হয়ত সম্ভব খুব বিরল কিছু ক্ষেত্রে। বিষয়ী, উদ্বেগের মধ্যে, অনুভব করে যে, তার যা করতে হবে সে তা করতে পারছে না, যে, সে উন্মুক্ত হয়েছে খুব বেশি বেশি কেন্দ্রের দিকে এবং কাজের দিকে। আবেগ সেই অনুভব বাড়িয়ে দেয় এবং তাকে অন্তর্মুখী করে। বিষয়ী অস্তিত্বই থেকে যায়, এবং এক স্থায়ী রদবদল ঘটায় নিজের মধ্যে, যদিও সক্রিয়তা ছাড়াই, নিজেকে ঢুকিয়ে দেওয়া ছাড়াই, একটি ব্যক্তিকরণে অংশ না নিয়ে। বিষয়ী উন্মুক্ত হয় ব্যক্তিকরণে যা আবার মনে হয় সম্ভব। সে চলতে শুরু করে অস্তিত্বের

উল্টো অলিগলিতে। উদ্বেগ হলো অস্তিত্বজনন উল্টো চলাচল। সে খোলে যা বোনা ছিল, সে পশ্চাদ্ধাবন করে, তার সমস্ত বোধে। উদ্বেগ হলো প্রাক-ব্যক্তি অস্তিত্বে ডুবে থাকা ব্যক্তিকৃত অস্তিত্বের পরিহার। এবং যে স্বীকার করে অর্জিত স্বাতন্ত্রের ধ্বংসের রাস্তায় চলতে, অন্য এক অজানা ব্যক্তিকরণের দিকে। সে হলো অস্তিত্বের পরিত্যাগ।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১১৩ (২৭-৪১), ১১৪ (১-২৫)

উদ্বেগে বিষয়ী বিষয়ে পরিণত হয়। দুনিয়া হয়ে ওঠে তার কাছে যেন বিষয়ী। তবে উদ্বেগের এই নেতিবাচক ভূমিকা নিয়ে সিমন্দঁর একটু সন্দেহও আছে। কারণ, 'বিরল কিছু ক্ষেত্রে' উদ্বেগ হয়ত বিষয়ীকে রূপান্তরিত করে বিষয়ী হিসেবেই।

ভাবোদ্রেকের সমস্যা : ভাব ও আবেগ

যেহেতু চাবিকাঠিগুলোর এক নেটওয়র্ক, যাবতীয় সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণকে সংহতকরণ করে, এবং অস্তিত্বের মতো সাধারণ এক কাঠামো, যা সংহতকরণ করে সমস্ত সাম্ভাব্য আবেগ, তা তৈরি হতে পারে, তাই আসতেই পারে এক নয়া ব্যক্তিকরণ যা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুনিয়া সাপেক্ষে এবং অন্যান্য জীবন্তদের মধ্যে জীবন্ত সাপেক্ষে : আবেগকে যেতেই হবে বোধের দৃষ্টিকোণগুলির দিকে, এবং বোধের দৃষ্টিকোণগুলিকে যেতেই হবে আবেগগুলির দিকে : বোধ এবং আবেগের মধ্যে এক মধ্যস্থতা শর্তায়িত হয় সামূহিকের পরিসর দিয়ে, অথবা, আড়ব্যক্তিগত দিয়ে। সামূহিক, এক ব্যক্তিকৃত অস্তিত্বের জন্য, তা এক মিশ্র আবাস এবং স্থিতি যেখানে আবেগগুলি হলো বোধের দৃষ্টিকোণগুলি এবং যেখানে আবেগের দৃষ্টিকোণগুলি সম্ভব। জীবন্তের অদলবদল এবং দুনিয়ার অদলবদলের ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায় সামূহিকে, উপলব্ধি করে এক বদলানোযোগ্য দিশা, দুনিয়া সাপেক্ষে, বেঁচে থাকার সময়ের সঙ্গে সংহতি রেখে। সামূহিক হলো স্থান-কালে স্থিতি। সে বিনিময়ের পরিপার্শ্ব। সে অস্তিত্বের সক্রিয়তার দুই প্রকার, বোধ এবং আবেগ, তাদের মধ্যে বদলাবদলি করে নেওয়ার নীতি। একা, জীবন্ত, বোধ এবং আবেগকে ছাপিয়ে যেতে পারে না, অর্থাৎ বোধের বহুত্ব এবং আবেগের বহুত্ব।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১২২ (২৫-৪১), পৃ ১২৩ (১-৪)

বোধ এবং আবেগের মধ্যস্থতা করে সামূহিক বা আড়ব্যক্তি। এবার সংকেত

এবং সংকেতায়নের ফারাকে ব্যক্তিকে বোঝা যাক।

একটা ফারাক আছে সংকেত এবং সংকেতায়ন এর মধ্যে। আমরা বলি যে, সেখানে আছে ব্যক্তি যেখানে আছে বাস্তব ব্যক্তিকরণের প্রক্রিয়া। অর্থাৎ যখন সংকেতায়নগুলো ফুটে ওঠে। ব্যক্তি হলো যার দ্বারা এবং যার মধ্যে সংকেতায়নগুলো ফুটে ওঠে। এবং ব্যক্তিগুলির মধ্যে সংকেতগুলি থাকে কেবল। ব্যক্তি হলো সেই অস্তিত্ব যা উদ্ভাসিত হয় যখন সংকেতায়ন হয়। উল্টোভাবে বললে, কেবল সংকেতায়নই তা, যখন একটি অস্তিত্ব ব্যক্তিকৃত হয়ে উদ্ভাসিত হয় এবং দীর্ঘায়িত হয়, সেই অস্তিত্বের মধ্যে যা ব্যক্তিকৃত হচ্ছে।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১২৫ (১১–১৮)

ব্যক্তি হলো অস্তিত্বের এক গঠনপ্রণালীর স্ব–গঠন, যা সমাধান করে একটা প্রাক অসঙ্গতি, নয়া ব্যবস্থাপনা তুলে ধরার মাধ্যমে।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১২৫ (২৪–২৬)

ব্যক্তিকরণ এবং ব্যক্তিগতকরণ যথাক্রমে ইন্ডিভিজুয়েশন এবং ইন্ডিভিজুয়ালা–ইজেশন ইংরেজিতে। পারসনালিতে–এর বাংলা করা হয়েছে স্বকীয়তা।

ব্যক্তিকরণ, ব্যক্তিগতকরণ ও স্বকীয়তা

ব্যক্তি হলো এইভাবে অস্তিত্বের এক পরিসর–সময়গত স্বতঃসিদ্ধ; প্রদত্ত এতাবৎ বিরোধিতাগুলি যে সঙ্গতায়ন করে একটি ব্যবস্থার মধ্যে যা মাত্রায় সময়গত বা কালিক এবং পরিসরগত বা স্থানিক। ব্যক্তি হল একটা অস্তিত্ব যা হয়, সময়ের মধ্যে, তার কাঠামোর ক্রিয়াকলাপে; এবং যা কাঠামো পায় তার হওয়া–র কার্যকলাপে; টানটা হয়ে ওঠে ঝোঁক। তা কেবল ব্যক্তিকরণের প্রাক মুহূর্তে হয়ে ওঠে ধারাবাহিকতার ক্রম। ব্যক্তি হলো যা বহন করে সময় ও পরিসর অনুযায়ী ব্যবস্থাটিকে, সঙ্গে নিয়ে পারস্পরিক পরিবর্তনযোগ্যতা — পরিসরগত ক্রম (কাঠামো) এবং সময়গত ক্রম (হওয়া, ঝোঁক, বিকাশ ও লয়, অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে, কার্যকলাপে)। সংকেতগুলি হলো স্থানিক ও কালিক। একটি সংকেতায়ন হলো পরিসর–সময়ের দুই দিক থেকে। একটি হলো একটি কাঠামো সাপেক্ষে। আরেকটি হলো একটি ক্রিয়ামূলক হওয়া সাপেক্ষে।

সংকেতায়নগুলি গঠন করে ব্যক্তিগত অস্তিত্ব। যদিও সেগুলি আশা করে একটি আংশিক ব্যক্তিকৃত অস্তিত্বের প্রাক অস্তিত্ব। একটি অস্তিত্ব

কক্ষনো পুরোপুরি ব্যক্তিগত হয় না। সবসময় তার মধ্যে থাকে নিজের সক্ষমতার চাহিদা যা ধারাবাহিকভাবে নিজেকে ব্যক্তিগতকরণ করে পারিপার্শ্বিকের সমস্যাগুলি সমাধানের মাধ্যমে, যে সমস্যাগুলি ঘিরে থাকে তাকে, এবং যে সমস্যাগুলিই তার পারিপার্শ্বিক। জীবন্ত হলো এক অস্তিত্ব যা নিজেকে চিরস্থায়ী করে পারিপার্শ্বিকের ওপর সমাধানমূলক সক্রিয়তা প্রয়োগ করে। জীবন্ত নিজের সঙ্গে বহন করে সমাধানের জীয়নকাঠি কারণ সে জীবন্ত। কিন্তু যখন সে সমাধানগুলি ঘটায়, সে সেগুলো ঘটায় তার নিজের অস্তিত্বের সীমায় এবং ব্যক্তিকরণের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে : প্রাথমিক ব্যক্তিকরণের পর এই ব্যক্তিকরণ হলো ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগতকরণ, সেই উপায়ের মধ্যে যেখানে সে সমাধিত হয় পারিপার্শ্বিকের জন্য। ব্যক্তিকরণকে দেখার এই পদ্ধতি অনুযায়ী, এটা একটি নির্দিষ্ট মনোগত প্রক্রিয়া, যা হল সংকেতগুলির সমাহারের মধ্যে সংকেতায়নের এক আবিষ্কার। সংকেতায়ন দীর্ঘায়িত করে অস্তিত্বের প্রাথমিক ব্যক্তিকরণকে, এবং সেই অর্থে সম্পর্কও তৈরি করে বাইরের বিষয়গুলির সমাহারের সঙ্গে যা নিজেই অস্তিত্ব। যতক্ষণ সে (মনোগত প্রক্রিয়া) বহন করে সংকেতগুলির বহুত্বের মধ্যে একটি সমাধান, ততক্ষণ একটি সংকেতায়নের থাকে বাইরের বরাবর একটি শক্তি। কিন্তু এই বাহির ব্যক্তিকরণের এক লব্ধিরূপ অস্তিত্বের কাছে অচেনা নয়। কারণ ব্যক্তিকরণের আগে এই অস্তিত্ব অস্তিত্বের সমাহার স্বরূপ স্বতন্ত্র ছিল না যে পৃথক করেছে নিজেকে পরিপার্শ্ব এবং ব্যক্তির মধ্যে। একইভাবে, সংকেতবাচক সমাধান আবিষ্কারের একটি শক্তি আছে অস্তিত্বের অন্দর বরাবর, এবং সেই শক্তি বৃদ্ধি পায় তার দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের বোধগম্যতার জন্য। দুনিয়া হল কেবল যাকে বলে ব্যক্তির পরিপূরক, প্রাথমিক অবিভাজনের সাপেক্ষে। ব্যক্তিগতকরণ হল ব্যক্তিকরণের ধারাবাহিকতা। প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি ধারনাগত আবিষ্কার, প্রতিটি ভাবোত্থান হল প্রাথমিক ব্যক্তিকরণের পুনরাবৃত্তি। ব্যক্তিগতকরণ নিজেকে বিকশিত করে প্রাথমিক ব্যক্তিকরণের প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি হিসেবে, যার সে এক দূরবর্তী, আংশিক, কিন্তু বিশ্বস্ত পুনর্জাগরণ। এই অবগতি খুঁজে বের করে সেই লাইনটাকে যা দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করায় স্বীকৃত স্থিতিশীল আইন মোতাবেক। কিন্তু তা বলে এরকম কিছু নয় যে, বোধগম্যতার রূপগুলি আগে থেকেই বিষয়ীর মধ্যে আছে; এবং কাঁচা প্রদত্তটির সঙ্গে তাদের তালমিল হয়ে বোধের দুনিয়া হয়ে গিয়ে তা ব্যাখ্যাতীত হয়ে যায়। বরং এরকম কিছু, যে, বিষয়ী হিসেবে অস্তিত্ব এবং বিষয় হিসেবে অস্তিত্ব আসে একই আদি বাস্তবতা থেকে, এবং

একই চিন্তা থেকে যা এখন মনে হয় স্থাপন করেছে একটি ব্যাখ্যাতীত সম্পর্ক, বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে, যা সেই শুরুর ব্যক্তিকরণের প্রসারণ। অবগতির সম্ভবনার শর্তগুলি হলো বাস্তবে ব্যক্তিকৃত অস্তিত্বগুলির থাকার কারণগুলি।

ব্যক্তিগতকরণ ফারাক করে অস্তিত্বগুলির মধ্যে একটিকে অন্যদের সাপেক্ষে। কিন্তু সে তাদের মধ্যে বোনার কাজটিও করে। সে পুনরায় জোড়া লাগায় একের সাথে অন্যদের। কারণ প্রক্রিয়াগুলি নিজেদের ব্যক্তিকরণ অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিস্থিতির পশ্চাদ্ধাবন করে, যেগুলি পারে নিজেদের পুনরুৎপাদন করতে বহু বিষয়ীর সঙ্গে। অবগতির অধিকারের সার্বজনীনতা হলো কার্যত অধিকারের সার্বজনীনতা, কিন্তু সেই সার্বজনীনতা চলে ব্যক্তিগতকরণের মধ্যস্থতার শর্তগুলির মধ্যে দিয়ে, যা ওই একই অবস্থায় পতিত সমস্ত অস্তিত্বের জন্য একই, এবং তা ভিত্তিগতভাবে ব্যক্তিকরণের একই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। যে কারণে ব্যক্তিকরণ সার্বজনীন, বিষয় এবং বিষয়ীর মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে, তাই জন্য, তার অবগতি তাকে দেয় এক ধরনের বৈধতা যা সার্বজনীন। জাগতিক বিষয়ী এবং তুরীয় বিষয়ীর বিরোধিতা করে পুনরাবিষ্কার করে ওই স্থান-কালের বিষয়ীকে তার স্বকীয় ব্যক্তিগতকরণ, এবং ওই একই বিষয়ীর লব্ধিতে, যা একটি অদ্বিতীয় কাজের সমতুল। যা কার্যকর একইসাথে সমস্ত ব্যক্তিকরণে। বিষয়ীটি, যে একটি ব্যক্তিকরণকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে, এবং যে ব্যক্তিকরণের সে লব্ধি, সে হলো পূর্ব-হতেই-থাকা বা স্বতঃলব্ধ পরিপার্শ্ব। পরিপার্শ্বরূপ বিষয়ী এবং সংকেতগুলির মধ্যে সংকেতায়নের প্রগতিশীল আবিষ্কারের এজেন্ট, যে সংকেতগুলিই হয়ে উঠেছে দুনিয়া, সেই বিষয়ী হলো পরবর্তী-কালে-দেখা নীতি।

ব্যক্তিকৃত অস্তিত্ব হল তুরীয় বিষয়ী এবং ব্যক্তিগতকৃত অস্তিত্ব হলো জাগতিক বিষয়ী। কারণ, এটা একদমই ন্যায্য হবে না তুরীয় বিষয়ীকে একটি দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া জাগতিক বিষয়ীর পছন্দের মধ্যে। তুরীয় বিষয়ী পছন্দসই কাজ করে না। সেই নিজেই পছন্দ। অস্তিত্বের ভিত্তিতে তৈরি পছন্দের মূর্তায়ন। এই অস্তিত্ব থাকে সেই উপায়ের মধ্যে যেখানে সে হল সমাধান, কিন্তু সে ততক্ষণ পর্যন্ত অস্তিত্ব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি যে কি না আছে পছন্দের পূর্ব থেকেই এবং যে হল কি না পছন্দের নীতি। সে হল সমাবেশ, সে হল ব্যবস্থাটি যা থেকে সে সরে আসছে, এবং যার মধ্যে সে ছিল না ব্যক্তিকৃত উপাধিতে। তুরীয় পছন্দের ধারনাটি পুনরায় পদার্পন করে ব্যক্তিত্বের অনেক দূরে। তুরীয় চরিত্র বলে

কিছু হয় না। এবং ঠিক এই কারণেই অবগতি হল সার্বজনীনতার যোগ্য। সমস্যাগুলি হলো তুরীয় আমি-র সমস্যা, এবং একমাত্র চরিত্র, জাগতিক চরিত্র, হল সমস্যাগুলির সমাধানগুলির সমাবেশ। স্কিমগুলি, যেইগুলি অনুযায়ী সমস্যাগুলি পারে সমাধান করতে নিজেদের, সেগুলি সত্যি সমস্ত ব্যক্তিকৃত অস্তিত্বের জন্য যারা একই ধরনের ব্যক্তিকরণের মধ্যে দিয়ে গেছে। ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি সমাধানের বিশেষ দিকগুলি আত্মিকভাবে গড়ে তুলছে জাগতিক চরিত্রকে। একমাত্র যে চরিত্রটি নিজেকে গঠন করে তা হলো জাগতিক চরিত্র। তুরীয় বিষয়ী হল তার সাপেক্ষে যার সেখানে একটা সমস্যা আছে। কিন্তু সেখানে তার একটা সমস্যা থাকার জন্য তার আগে থেকে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, এবং তুরীয় বিষয়ী পছন্দসই কাজ করতে পারে না এই অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে। পছন্দ-র নীতি অনুযায়ী, পছন্দ করার আগে কোনো পছন্দ থাকতে পারে না।

আমরা স্বকীয়তা অভিহিত করি সেই সমস্ত কিছু দিয়ে যা ব্যক্তিকে পুনঃসংশ্লিষ্ট করে যতক্ষণ ব্যক্তিতে ব্যক্তিকৃত অস্তিত্ব ব্যক্তিগতকৃত হচ্ছে। ব্যক্তিগত অস্তিত্ব ঝুঁকে থাকে অনন্যতার দিকে এবং ঘটনাক্রমে ঘটে যাওয়াকে ধারন করে অনন্যতার রূপের নীচে। ব্যক্তি ব্যক্তিকৃত অস্তিত্ব হিসেবে থাকে নিজে-নিজেই, অস্তিত্বের ব্যবস্থার সাপেক্ষে যা থেকে সে এসেছে, যার ওপর সে গঠিত, কিন্তু সে নিজেকে একই ব্যক্তিকরণের প্রক্রিয়ায় গঠিত অন্যান্য ব্যক্তির সাথে বিরোধিতা করে না। ব্যক্তিগত, অস্তিত্ব হিসেবে, অন্যান্য ব্যক্তিগতকৃত অস্তিত্বের থেকে দূরে সরে যায়। বিপরীতে, ব্যক্তিকরণ ও ব্যক্তিগতকরণ এর মিশ্রণ হল স্বকীয়তা, তা হল সম্পর্কের নীতি যা ফারাকীকৃত এবং অসামঞ্জস, অন্যদের থেকে।

ব্যক্তিকরণের স্তরে একটি সম্পর্ককে তুলনা করা যায় যৌনতার সম্পর্কের সঙ্গে। ব্যক্তিগতকরনের স্তরে একটি সম্পর্ক হল প্রাত্যাহিক জীবনের আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীকে বহন করা। আর, স্বকীয়তার স্তরে একটি সম্পর্ক হল যেন কেউ সংহত করছে একটা অদ্বিতীয় যৌনতার অবস্থা এবং ঘটনামূলক ব্যক্তিগত কথাকে। মূর্ত মানুষ না শুদ্ধ ব্যক্তিকরণ, না শুদ্ধ ব্যক্তিগতকরণ। সে দুটোর মিশ্রণ।

আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্ক সর্বদা আন্তঃস্বকীয় নয়।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯

একটি আন্তঃস্বকীয় সম্পর্ক হল একটি অস্তিত্বের ব্যক্তিকরণ ও ব্যক্তিগতকরণ এবং অন্য একটি অস্তিত্বের এই দুটির মধ্যেকার সাধারণ মধ্যস্থতা। যেহেতু এই অদ্বিতীয় ও বৈধ মধ্যস্থতা সম্ভব, তাই অবশ্যই থাকতে হবে ব্যক্তিকরণ ও ব্যক্তিগতকরণের চেয়ে পৃথক সাধারণত্ব। আন্তঃস্বকীয়

সম্পর্কের গঠনে স্বকীয়তার স্তরে তা নয়, কিন্তু স্বকীয়তার দুই মেরুর প্রতিটির স্তরে আছে : এই সাধারণত্ব যে স্বকীয়তা দিয়ে তৈরি সেগুলোতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। স্বকীয়তার শর্তের পূর্বের একটি সাধারণত্ব থাকতেই হবে এক অদ্বিতীয় মধ্যস্থতার জন্য, এক অদ্বিতীয় স্বকীয়তা দুই ব্যক্তিকরণ ও দুই ব্যক্তিগতকরণের জন্য। এই জন্যই বাস্তবে প্রতিটি স্বকীয়তার ক্ষেত্রে এইরকম আন্তঃস্বকীয়–র পরিসরে সত্যিকারের সহাবস্থান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ...

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১২৯ (৩৪–৪১), ১৩০ (১–১১)

সচেতনতা এই ধরণের যোগাযোগের নিশ্চিতির জন্য যথেষ্ট নয়। সচেতনতার শর্তগুলির মধ্যে একটা যোগাযোগ থাকতেই হবে সচেতনতার যোগাযোগের জন্য।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৩০ (২০–২৪)

ওপরের আলোচনায় খুব গুরুত্বপূর্ণ হল জাগতিক এবং তুরীয় বিষয়ীকে আলাদা করা। বলাই আছে, ব্যক্তিকৃত অস্তিত্ব হল তুরীয় বিষয়ী এবং ব্যক্তিগতকৃত অস্তিত্ব হল জাগতিক বিষয়ী। জাগতিক মানুষ না শুদ্ধ ব্যক্তিকরণ, না শুদ্ধ ব্যক্তিগতকরণ, সে দুটো মিশিয়ে। অপরের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে পরম ব্যক্তিকৃত অস্তিত্ব আর থাকতে পারে না।

পরিপার্শ্বের সঙ্গে সম্পর্ক

অপরের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের ব্যক্তিকৃত অস্তিত্ব হিসেবে প্রশ্নের মধ্যে ফেলে। সে আমাদের স্থাপন করে এবং মুখোমুখি বসায় অন্যের সাথে, যেমন কমবয়সী ও বেশিবয়সী অস্তিত্ব, অসুস্থ ও সুস্থ, শক্তিশালী ও দুর্বল, ছেলে বা মেয়ে : কারণ, আমরা হতে পারি না পরম কোনো কমবয়সী বা বেশিবয়সী, এই সম্পর্কের মধ্যে। বরং হতে পারি বেশি যুবক বা বেশি বুড়ো, অন্যের চেয়ে। বা বেশি শক্তিশালী বা কম শক্তিশালী। পুরুষ এবং নারী অস্তিত্বে, নারীর সাপেক্ষে পুরুষ, পুরুষের সাপেক্ষে নারী।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৩১ (১৩–২১)

অস্তিত্বের ব্যক্তিগতকরণ হয়ত কার্যত বোঝা হয়েছে : একজন মেয়ে হয়ত বোঝা যায় এটা বা ওই বিশেষত্ব দিয়ে যা তাকে পৃথক করে অন্য সমস্ত ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে। কিন্তু সে শুধু একজন মেয়ে হিসেবে আলাদা নয়, একজন মানুষ হিসেবে, এবং একজন জীবন্ত মানুষ হিসেবে। এই মূর্ত অবগতি হল এক পূর্ণাঙ্গ স্বাতন্ত্র্যে (এই মেয়েটা) যেখানে ব্যক্তিকরণ এবং

ব্যক্তিগতকরণ এর সমাপতন হয়। (পৃ–১৩২ এদিশিঁও ওবিয়ের ২০০৭)

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৩১ (৩৬–৪১), পৃ ১৩২ (১–৩)

ব্যক্তিকরণ, ব্যক্তিগতকরণ এবং স্বকীয়করণ

বাস্তবে, মনে হয়, মনোজাগতিক ব্যক্তিকরণ ব্যক্তিকরণের চেয়েও বেশি ব্যক্তিগতকরণ, যেহেতু আমরা তাকে গ্রহণ করি ব্যক্তিকরণ দ্বারা নকশায়িত একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিগতকরণের চেয়ে ছোটো এবং যার জীবন্ত অস্তিত্বের সমর্থনের অভাব আছে নিজের ব্যক্তিকৃত অস্তিত্বের পুনঃবিকাশের জন্য।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৩২ (২৬–৩২)

ব্যক্তিগতকরণ, যা কিনা এক ব্যক্তিকৃত অস্তিত্বের ব্যক্তিকরণ, এক ব্যক্তিকরণের ফল হিসেবে, তৈরি করে এক নয়া কাঠামোয়ায়ন, ব্যক্তিকৃতর অন্তরাত্মায়। চিন্তা এবং জৈবনিক কার্যকলাপ হল দ্বিগুণায়িত জীয়ন এক অসমদৃশ খাঁজ বরাবর যা তুলনীয় একটি ব্যবস্থার প্রাথমিক ব্যক্তিকরণের সাথে। চিন্তা হল ব্যক্তিকৃতের ব্যক্তিকৃত–র মতো, যেখানে দেহ হল চিন্তার পরিপূরক পরিপার্শ্ব, সমগ্র (সিনলন) সাপেক্ষে ব্যক্তিকৃত হয়ে যাওয়া যা হল জীয়ন্ত অস্তিত্ব। তাই জন্য জীয়ন্ত ব্যক্তিকৃত ব্যবস্থা হল আভ্যন্তরীন অনুনাদের অবস্থায় যা নিজেকে ব্যক্তিকৃত করে দ্বিগুণায়িতভাবে, চিন্তায় ও শরীরে। মনোশারীরিক ঐক্য হল, ব্যক্তিগতকরণের আগে, সমজাতীয় ঐক্য। ব্যক্তিগতকরণের পরে, সে হয়ে ওঠে কার্যকলাপগত এবং সম্পর্কগত ঐক্য। ব্যক্তিগতকরণ কেবল আংশিক, দ্বিগুণায়িতভাবে, সাধারণ ঘটনার মধ্যে। কারণ মনো–শারীরবৃত্তীয় সম্পর্ক রক্ষা করে ব্যক্তিকৃত অস্তিত্বের ঐক্য। তদুপরি, কিছু কার্যকলাপ কখনো হয়ে ওঠে না কেবল মনোজাগতিক বা কেবল শারীরিক। এবং এইভাবে, তারা রক্ষা করে জীবন্তের মধ্যে ব্যক্তিকৃত অথচ ব্যক্তিগতকৃত নয় দশা : যেমন যৌনতা। যেমন, সাধারণ ভাবে, মূর্ত আন্তঃব্যক্তিগত কার্যকলাপগুলি, সামাজিক সম্পর্কগুলো যেমন, যা বাহিত হয় ব্যক্তিকৃত অস্তিত্বের ওপর।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৩৩ (১১–৩৫)

ব্যক্তিকরণের মূল যে ধারণার সঙ্গে বা সূত্রপাতের সঙ্গে সিমন্দঁ এখানে তর্ক করছেন, বলা ভালো, গোটা বইটা জুড়ে করছেন, সেই মূল ধারণা হলো অ্যারিস্টটলের, মেটাফিজিক্স রচনায়। অ্যারিস্টটল ব্যক্তিকরণের সমস্যাকে তুলে ধরেছেন অনেকটা এইভাবে — কোনো ব্যক্তি (tode ti), যেমন ধরা

যাক, সক্রেটিস, হল একটি সমগ্র (synolon) যা দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত : পদার্থ (hyle) এবং রূপ (eidos) । এই দুটি উপাদানের মধ্যে কোনটি সক্রেটিসকে ক্যালিয়াসের থেকে আলাদা করে? সিমন্দঁ বিতর্ক তুলেছেন এই 'ব্যক্তির দুটি উপাদানের ভিত্তিতে ব্যক্তিকরণকে বোঝা'–তে।

ব্যক্তিকৃত অস্তিত্ব নিজেকে প্রকাশ করে একটার পর একটা আসা দেহ–মনোগত জোড়া–তে, যেগুলি নিজেদের মধ্যে আংশিকভাবে সমন্বয়িত। ব্যক্তিকৃত অস্তিত্বের প্রথম থেকেই একটি আত্মা আর একটি দেহ থাকে না। সে নিজেকে গঠন করে যেন সে নিজের ব্যক্তিগতকরনের মধ্যে রয়েছে, যেন সে স্তরে স্তরে নিজের দ্বিগুণায়নের মধ্যে রয়েছে। মনোজাগতিক ব্যক্তিকরণ বলে ঠিক কিছু নেই। বরং আছে জীবন্তের এক ব্যক্তিগতকরণ যা জন্ম দেয় শারীরিক ও মনোজাগতিককে। এই জীবন্তের ব্যক্তিগতকরণ নিজেকে রূপান্তর করে শারীরিকে, বিশেষকরণের মাধ্যমে; এবং করে মনোজাগতিকে, প্রণালীসঙ্গতকরণের মাধ্যমে, যা কিনা ওই শারীরিক বিশেষকরণের সঙ্গে সূত্রবদ্ধ। প্রতিটি মনোজাগতিকে স্কিম একটি না একটি শারীরিক বিশেষকরণের সঙ্গে সূত্রবদ্ধ। আমরা নামকরণ করতে পারি দেহকে যা ওই জীবন্তের বিশেষকরণগুলির সম্মেলন, এবং যেগুলির সঙ্গে সূত্রবদ্ধ মনোজাগতিক প্রণালীসঙ্গতকরণগুলিও।

সিমন্দঁ (২০১৩), পৃ ২৬১ (২৭–৩৬)

মনোগত ব্যক্তিকরণের ব্যাখ্যার কাজে অভিযোজনের ধারনার অপ্রতুলতা

আধুনিক মনোবিদ্যা এবং মনোরোগবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যাকে তারা বলে এক নিহিত সমাজবিদ্যা, যা বিশেষকরে তাদের বিচারধারার আদর্শমান প্রসূত।

সিমন্দঁ (২০১৩), পৃ ২৬৬ (৩৪–৩৬)

আমরা এই আদর্শমানকে নিহিত বলছি, তা তাকে আমাদের গবেষণার মধ্যে এনে তাকে নাস্তানাবুদ করার জন্য নয়। কারণটা হল, সে ব্যক্তির উপস্থাপনার গোটা একটা দিককে আড়াল করে। যেহেতু এই গতিশীলতাটা নিহিত আদর্শমানটির মধ্যে থাকে, আমরা তৈরি করি এক ব্যক্তির মনোবৃত্তীয় তত্ত্ব যাতে মনে হয় কোনো গতিশীলতাই পূর্বধারণা করে নেওয়া হয়নি।

সিমন্দঁ (২০১৩), পৃ ২৬৬ (৪০–৪৩), পৃ ২৬৭ (১–৩)

স্নায়ুরোগ হল এমনই যে কোনো ভূমিকাতেই খাপ খায় না, এবং যে সদাসর্বদা মানিয়ে নেওয়ার সমস্যায় ভোগে। সমাজ এবং সেখানে তার ভূমিকার মধ্যে মানানসই না হওয়ার সমস্যা এটা নয়। এটা সমাজে তার ভূমিকার সঙ্গে তার নিজের মানানসই না হওয়ার সমস্যা। আমরা স্নায়ুরোগ ব্যাতিরেকেও মানিয়ে না নিতে পারি, আবার মানিয়ে না নেওয়া ব্যতিরেকেও স্নায়ুরোগী হতে পারি। কারণ ব্যক্তির নিজের সঙ্গে সম্পর্কে মানানসই হওয়া বা না হওয়া কে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না অন্যের সঙ্গে সম্পর্কের নিয়ম দিয়ে। এক নিহিত সমাজবিদ্যা মনোবিদ্যার বিষয়গত গ্যারান্টি নয়। সে কেবল প্রবাহিত হয় এবং ব্যক্তির নিজের সাথে সম্পর্কের সমস্যা তুলে ধরে না। কারণ সেই প্রশ্নটি নিজেই ওঠে ভৌতিক চিন্তার স্তরে। সেই প্রশ্নটি নিজেই ওঠে মনোবিদ্যার দৃঢ় যুক্তিতে, সুউচ্চ সংগঠনের কারণে, এবং সেই পরিসরে ব্যক্তির সুবিশাল জটিলতার মধ্যে।

সিমন্দঁ (২০১৩), পৃ ২৬৯ (১৩–২৩)

ব্যক্তিকরণে আত্মবাচকতার সমস্যা

ব্যক্তিগত বাস্তবতাকে ঠাঁই দিতে এবং অভিযোজনকে একটি বিষয়বস্তু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে যে মনোসমাজবিদ্যাজনিত বাধা, তার যা উৎস বলে মনে হয়, আর বৈজ্ঞানিক চিন্তার উৎস, এই দুটিই একই, যেখানে খোঁজে শারীরিক ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা : কার্যক্রম ব্যতীত অস্তিত্বের কাঠামো জানতে চেয়ে, এবং কাঠামো ব্যতীত অস্তিত্বের কার্যক্রম জানতে চেয়ে, সে (মনোসমাজবিদ্যা) যা বানায় তা হল এক পরম বিষয়বস্তুবাদ হয়ে পরম গতিশীলতা যে জায়গা ছাড়ে না ব্যক্তি অস্তিত্বের ভেতরের সম্পর্কে। সম্পর্কটা হয়ে যায় অপ্রয়োজনীয়। বার্গসন নিজে, যিনি কিনা ভীষণরকম চেষ্টা করেছিলেন ব্যক্তিকে মানসিক অভ্যাসের ফাঁদে পা না দিয়ে ভাবতে, যে মানসিক অভ্যাস মনোবৃত্তীয়তে আসে এক আত্মার দ্বারা যে অভ্যস্ত অন্য সমস্যাগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে, এবং এসে দাঁড়িয়েছিলেন বাস্তববাদিতার খুব কাছে। তিনি ওইরকমভাবেই অন্তঃব্যক্তি গতিশীলতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, এবং নির্ভর করেছিলেন কাঠামোগত বাস্তবতার ওপর যা সমানভাবে অন্তঃ–ব্যক্তিগত এবং গুরুত্বপূর্ণও। বার্গসনের দর্শনে যথাযথভাবে মানসিক অসুস্থতার ওপর কিছু খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়।

সেই মতধারা অনুসারে (যা আমরা উন্মোচিত করছি), মনোবৃত্তীয় ব্যক্তিকরণ হল শারীরিক ব্যক্তিকরণের মতোই, একটি আড়প্রসারী পরিসরের

তালমিল দিয়ে গঠিত। সেই চরিত্রের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই, ব্যক্তির গবেষণায় শক্তি অথবা নালিকা দিয়ে দুটি পরিসর গঠন করা অসম্ভব, একটা সাধারণ নালিকা আরেকটা প্যাথলজিক নালিকার জ্ঞান। এই জন্য নিশ্চয় নয় যে এই নালিকাগুলি সদৃশ একটি অন্যটির সাথে, কিন্তু এই কারণে যে সেগুলির একগুলি অন্যগুলির চেয়ে ভীষণ ভীষণ আলাদা যে কারণে আমরা কেবল দুটিই পরিসর গঠন করতে পারি।

সিমন্দঁ (২০১৩), পৃ ২৬৯ (২৪–৪২)

বাস্তবে, আড়প্রসারতার সমগ্র পরিসরে যেমন, মনোবৃত্তীয় ব্যক্তিকরণে একইসাথে ধারাবাহিক এবং বহু এক বাস্তবতা থাকে সমানভাবে। এই চরিত্র, বার্গসন যার কথা জেনেছেন মাত্রাগুলির একটির মধ্যে, তা একটি অস্থায়ী মাত্রার জ্ঞান। কিন্তু সমসাময়িকতার ক্রমানুসারে সম্পর্কিত চরিত্রগুলির গভীর পড়াশুনার বদলে, সে পরিসরতার বিপরীতে এসে দাঁড়ায়, (নিঃসন্দেহে এর কারণ মনোবৃত্তীয় পরমাণুবাদ–এর অপব্যবহার), এবং সে সন্তুষ্ট থাকে 'ওপর–ওপর আমি' এবং 'গভীর আমি'র বৈপরীত্য সাধনে। কারণ, মনোবৃত্তীয় স্তরে আড়প্রসারতা নিজেকে প্রকাশ করে সমসাময়িকতার আড়প্রসারতার ক্রমে, এবং, একটার পর একটা আসার আড়প্রসারতার ক্রমে। এই সম্পর্ক ব্যতিরেকে মনোবৃত্তীয় বাস্তবতা শারীরিক বাস্তবতার চেয়ে স্বতন্ত্র হয় না।

সিমন্দঁ (২০১৩), পৃ ২৭০ (৩–১২)

শেষমেশ, এই একই ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র দেখে মনে হয় যেন তা নিজেরই আত্মবাচক সচেতনতা, এই প্রকাশটি গৃহিত হয় সরল বোধে। না–আত্মবাচক সচেতনতা, নিজের নালিকার থেকেই বহিষ্কৃত হওয়া এক আদর্শমান আনতে অসমর্থ, উপলব্ধি করতে পারে না আড়প্রসারতার পরিসর যা গঠন করে মনোবৃত্তীয় ব্যক্তিকৃত। ফলতঃ, উদ্দেশ্যমূলক নালিকার চরিত্রগত মেরুত্ব রয়েছেই জীববৃত্তীয় স্তরে। কিন্তু তার খামতি হল সমসাময়িকের স্তর ও পারম্পর্যর স্তরের যে পারস্পরিকতা বা ব্যতিহার যা তৈরি করে মনোবৃত্তীয় বাস্তবতা। আমরা চাই না উল্টোটা, এটার ইতিবাচন করে যেভাবে একটা মৌলিক পার্থক্য তৈরি করা হয় মনোবৃত্তীয় স্তর জীববৃত্তীয় স্তরের মধ্যে। আমাদের প্রকল্পে আমরা কেবল বলছি যে শুদ্ধ জীববৃত্তীয় স্তরকে হতে হবে সমসাময়িকের পরিসর ও পারম্পর্যের পরিসরের সম্পর্কের অ–ব্যতিহারে। আর, মনোবৃত্তীয় বাস্তবতা হল এক্কেবারে এই ব্যতিহারের পুনর্নবীকরণ, যাকে আমরা আত্মবাচন নাম দিত পারি।

সিমন্দঁ (২০১৩), পৃ ২৭০ (১৭–২৯)

সমস্ত ব্যক্তিগত কাজ হল মূলতঃ দ্ব্যর্থক। কারণ, তা হল সেই বিন্দু যেখানে থাকে আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিকের রূপক। সে হল আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিকের সীমানাবিন্দু। আভ্যন্তরীন হল জীববৃত্তীয়, বাহ্যিক হল শারীরিক। মনোবৃত্তীয় ব্যক্তিত্বের পরিসর হল শারীরিক বাস্তবতার সীমায় এবং জীববৃত্তীয় বাস্তবতার সীমায়। প্রাকৃতিক ও প্রকৃতির মধ্যে, যেন দ্ব্যর্থবোধক সম্পর্ক যার আছে অস্তিত্বের মূল্য।

সিমন্দঁ (২০১৩), পৃ ২৭১ (৩১–৩৬)

মনোবৃত্তীয় ব্যক্তিত্বের পরিসর যথোপযুক্ত পরিসর পায় না। সে থাকে যেন এক ওপরছাপ হিসেবে, শারীরিক এবং জীববৃত্তীয় পরিসরের সাপেক্ষে। সে তাদের মধ্যে ঢোকা যাকে বলে, তা পারে না, কিন্তু তাদের পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করে এবং বোঝায় আংশিকভাবে, গোটাটাই তাদের মধ্যে থেকে। মনোবৃত্তীয় ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি হল আবশ্যিকভাবে দ্বান্দ্বিক, কেননা সে কেবল থাকে সেইটুকুতে যেখানে সে স্থাপন করে এক সঙ্গতি, যা ঘটে তার নিজের দ্বারা, প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিকের মধ্যে, আভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিকের মধ্যে; জীববৃত্তীয় বাস্তবতা আছে মনোবৃত্তীয় বাস্তবতার ভেতরে, কিন্তু মনোবৃত্তীয় বাস্তবতা পুনরায় ধরে ফেলে জীববৃত্তীয় গতিশীলতাকে, তার সাপেক্ষে নিজের স্থানচ্যুত হয়ে।

সিমন্দঁ (২০১৩), পৃ ২৭১ (৩৭–৪৫)

... (কারণ) দুনিয়ার সাথে ব্যক্তির দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক হলো আড়প্রসারী। কেননা, সেই সম্পর্কে থাকে দুনিয়া যা একইসাথে সমসত্ত্ব এবং অসমসত্ত্ব। তা নিয়ে গঠিত এবং তা নিয়েই চলে, কিন্তু বৈচিত্রায়িত হয়। তাকে না দেখতে লাগে ভৌত (বা শারীরিক) প্রকৃতি, না দেখতে লাগে জীবন্ত। কিন্তু তার সেই ব্রহ্মাণ্ডের গঠনের স্বরের মধ্যে থাকে যার নাম আমরা দিতে পারি আত্মা। কারণ, এই ব্রহ্মাণ্ড তৈরি জীবন্ত এবং ভৌত দুনিয়ার আড়প্রসার দিয়ে, জানা দিয়ে এবং কাজ দিয়ে, যা এই দুনিয়াতে গলে ঢুকে পড়ে। এই দুনিয়া নিজেকে শুধু মিশ্র কিছু হিসেবে গঠন করে না, বরং সত্যিকারের আড়প্রসারী সম্পর্ক হিসেবে গঠন করে। সবকিছুই যা ব্যক্তির গড়া, যা ব্যক্তির আওতায় আসতে পারে, তা হল সমসত্ত্ব, যেন তা হল পরিসরগত এবং সময়গত বৈচিত্র্যের মাত্রা, যা প্রভাবিত করে এই ব্রহ্মাণ্ড যে সব কিছু দিয়ে তৈরি সেগুলোকে। ব্যক্তিগত সমস্ত বাস্তবতা একটি ধারাবাহিক ক্রমের সারনীতে সাজানো যেতে পারে। মৌলিক কোনো অসমসত্ত্বতা ছাড়া। সমস্ত বাস্তবতাকে বোঝা যেতে পারে ভৌতিক অস্তিত্ব হিসেবে, জীবন্ত অঙ্গভঙ্গী হিসেবে, ব্যক্তিগত কার্যকলাপ হিসেবে। বাস্তবতার তৃতীয় ক্রমটি উপলব্ধি করে একটি আড়প্রসারতা যা জোড়া

দেয় পূর্বতন দুটি ক্রমকে, একটিকে অন্যটির সাথে, আংশিকভাবে এবং অসম্পূর্ণভাবে। মনোবৃত্তীয় ব্যক্তিকরণগুলির অস্তিত্বের ভূমিকায় তৃতীয়টির মধ্যে আগের দুটি ক্রমের উপাদানগুলির অন্তর্ভুক্তি হল ব্যক্তির কাজ, এবং ব্যক্তিকে প্রকাশ করে। এই অন্তর্ভুক্তি সবসময়, কখনোই সম্পূর্ণ নয়, কারণ তার প্রয়োজন ভৌতিক বা (শারীরিক) এবং জীববৃত্তীয় ভিত্তি। একইভাবে একটি পরিপূর্ণ জীববৃত্তীয় দুনিয়া পাওয়া যাবে না, একটি পরিপূর্ণ মনোবৃত্তীয় দুনিয়া পাওয়া যাবে না।

সিমন্দঁ (২০১৩), পৃ ২৭২ (১৩–৩১)

মনোবৃত্তীয় দুনিয়া তৈরি হয় মনোবৃত্তীয় ব্যক্তিকরণগুলির সম্পর্ক দিয়ে। এই ব্যাপারে ব্যক্তিরা থাকে এই দুনিয়ার ভেতরে এবং তারা এগুলো তৈরি করে অমনোবৃত্তীয় দুনিয়াগুলির থেকে শুরু করে। মনোবৃত্তীয় দুনিয়ায় ভৌতিক এবং জীববৃত্তীয় দুনিয়াগুলির সম্পর্ক ঘটে ব্যক্তির মাধ্যমে। মনোবৃত্তীয় দুনিয়া কে মনোবৃত্তীয় দুনিয়ার চেয়েও বেশি করে বলা উচিত আড়ব্যক্তিগত ব্রহ্মাণ্ড। কারণ, তার স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। যেমন, সংস্কৃতির নিজে নিজে টিঁকে থাকার কোনো বাস্তবতা নেই। সে কেবল বেঁচে থাকে স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক প্রত্যক্ষতাগুলি যখন ব্যক্তিগুলির দ্বারা পুনর্বাস্তবায়িত হয়, এবং ব্যক্তিরা বোঝে যেন সেগুলি চিহ্নিতকরণগুলির বাহক। যেহেতু সংবহিত হয় কেবল একটি সমস্যার সার্বজনীনতাটা, তাই তা বাস্তবে ব্যক্তিগত এক অবস্থার সার্বজনীনতা যা পুনরায় সৃজন করা হয়েছে সময় এবং পরিসর জুড়ে।

তাই মনোবৃত্তীয় দুনিয়া থাকে সেই সব উপায়ে যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি খোঁজে মানসিক প্রকল্পগুলির একটি সারণী এবং নালিকাগুলি যেগুলি একটি সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। এবং যা সেখানে নির্দিষ্ট সমস্যাগুলিকে তুলে ধরে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সবিস্তৃত হয়ে থাকা একটি আদর্শমানতা অনুসারে। মনোবৃত্তীয় ব্যক্তির কাজ করার একটি পছন্দ থাকে তার উদাহরণ হিসেবে পাওয়া মূল্যবোধ ও নালিকাগুলিকে মেনে। কিন্তু সবকিছু সংস্কৃতিতে বলে দেওয়া থাকে না। এবং অবশ্যই ফারাক করতে হবে সংস্কৃতি এবং আড়ব্যক্তিগত বাস্তবতার মধ্যে। কিছু কিছু ভাবে সংস্কৃতি হল নিরপেক্ষ। সে চায় বিষয়ীর দ্বারা দিশাপ্রাপ্ত হতে, যা বিষয়ী নিজেই প্রশ্ন করার মাধ্যমে করবে। বিপরীতে, আড়ব্যক্তিগত সম্পর্কে বিষয়ীর নিজেরই প্রশ্ন তোলার একটা বাধ্যবাধকতা আছে, কারণ এই প্রশ্নটা অন্যরা এরই মধ্যে শুরু করে দিয়েছে তুলতে। বিষয়ীর নিজের সাপেক্ষে মনোবিক্ষেপ ঘটে অংশতঃ অন্যদের দ্বারা আন্তঃব্যক্তিগত

সম্পর্কের মধ্যে। তাই নজর করা দরকার যে আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্ক ঢেকে রাখতে পারে আড়ব্যক্তিগত সম্পর্ককে, যে কায়দায় একটি শুদ্ধ কার্যগত মধ্যস্থতা প্রদত্ত হয় একটি সুবিধা হিসেবে যা এড়িয়ে যেতে পারে ব্যক্তির সমস্যার সঠিক জায়গাটি, ব্যক্তির নিজের দ্বারাই। আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্ক রেখে দিতে পারে একটি সরল সখ্যতা এবং এড়িয়ে যায় আত্মবাচকতা। পাস্কালের একটি মত ছিল এবং উল্লেখ করেছিলেন একটি খুব প্রাণবন্ত উপায়ের, যা হল, ব্যক্তির সমস্যার পরস্পর ক্রমসৃয়মান বিরোধ এবং আত্মবাচক সচেতনতা। এই উপায়ে যেখানে আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্ক দেয় নিজের ব্যাপারে একটি প্রাকমূল্যবোধ, যা ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত কার্যগত উপস্থাপনা জুড়ে, অন্যরা তাই মনে করে। এই সম্পর্ক এড়িয়ে যায় নিজেই নিজের তোলা তীক্ষ্ণ প্রশ্নটিকে। বিপরীতে, সত্যিকারের আড়ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেবল শুরু হয় একাকীত্বকে ছাপিয়ে গিয়ে। সে গঠিত হয় ব্যক্তি দ্বারা যে কোনোভাবে প্রশ্নের মুখে পড়ে গেছে, এবং তা আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্কগুলির কাছাকাছি আসার মাধ্যমে নয়।

সিমন্দঁ (২০১৩), পৃ ২৭২ (৩৫–৪৭), পৃ ২৭৩ (১–২০)

ওপরের পরিচ্ছদে উল্লিখিত মনোবিক্ষেপ বা decentration হল একটা ধারনা, যা পেডাগজি বা শিক্ষাপদ্ধতি এবং কগনিশন বা বোঝার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধরা যাক, একজন এক ঝলকে শুধু দৈর্ঘ্য বুঝতে পারে। কিন্তু প্রস্থ বুঝতে পারে না। তাহলে একঝলককে একই দৈর্ঘ্যের কিন্তু ভিন্ন প্রস্থের দুটি জিনিস দেখে সে পার্থক্য করতে পারবে না। কিন্তু দুটিই যদি বোঝে এক ঝলকে, অর্থাৎ সে দৈর্ঘ্য বোঝার সাথে সাথে যদি একইসাথে প্রস্থও বোঝে, তাহলে করতে পারবে। মাল্টিটাস্কিং ফ্যাকাল্টি এবং একসাথে বহু সক্রিয়তার জন্য এই মনোবিক্ষেপ এর প্রশিক্ষণ বা চর্চা জরুরি।

আড়ব্যক্তিত্ব

সত্যিকারের ব্যক্তি হল সে যে একাকীত্বকে পেরিয়ে গেছে। যাতে সে আবিষ্কার করতে পারে একাকীত্বকে ছাপিয়ে। তা হল এক আড়ব্যক্তিগত সম্পর্ক। ব্যক্তি খুঁজে পায় সম্পর্কের সার্বজনীনতা সেই ব্যাপারে সে যা নিজে চাপিয়েছে, এবং তা হল একাকীত্বের পরীক্ষা। এই বাস্তবতা, বিশ্বাস করো, তা কিন্তু স্বাধীন সমস্ত ধর্মীয় প্রসঙ্গ থেকে। এবং, সে সমস্ত ধর্মীয় প্রসঙ্গের অভ্যন্তর এবং সে হল সে যে সমস্ত ধর্মীয় শক্তির সাধারণ ভিত্তি, যখন সে নিজেকে ধর্মে অনুবাদ করে। সমস্ত ধর্মের সূত্র সমাজ নয়, যেমন কিছু সমাজতাত্ত্বিক মতামত বলতে চায়, বরং তা হল

আড়ব্যক্তিগত। সে কেবল সেই শক্তির ফলে সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক। কিন্তু সে তার নির্যাসে সামাজিক নয়।

সিমন্দঁ (২০১৩), পৃ ২৭৩ (২৪–৩৩)

ব্যক্তি এবং আড়ব্যক্তিগত বাস্তবতার মধ্যে একটা প্রাথমিক মোলাকাত হতেই হবে। আর সে মোলাকাত হয়ত কেবল একটা অস্বাভাবিক অবস্থা যা একটি উন্মোচনের দিকগুলি তুলে ধরে বহিরঙ্গে। কিন্তু বাস্তবে আড়ব্যক্তিগত হল স্বয়ং–গঠিত, এবং এই বাক্যাংশটি, 'তুমি যদি আমাকে না খুঁজে থাকো, তাহলে আমাকে খুঁজে পাবে না', যদি এটি ভালোভাবে তুলে ধরে ব্যক্তির সক্রিয়তার ভূমিকা, আড়ব্যক্তিগতর আবিষ্কারের মধ্যে, মনে হয় ধরে নেয় একটি অস্তিত্বের অলৌকিক অবস্থাকে যার মধ্যে সমস্ত আড়ব্যক্তিত্বের উতস। বাস্তবে, অন্তর্লীনের আইডিয়া বা অলৌকিকের আইডিয়া কেউই সম্পূর্ণভাবে মনোবৃত্তীয় ব্যক্তিকরণের সাপেক্ষে আড়ব্যক্তিগতর চরিত্রকে ধরতে পারে না। অলৌকিক অথবা অন্তর্লীন বাস্তবে সংজ্ঞায়িত হয় এবং নিবদ্ধ হয় সেই মুহুর্তে যখন ব্যক্তি হয়ে ওঠে সেই সম্পর্কগুলোর একটা যার মধ্যে সে নিজেকে সংহত করে, কিন্তু অন্যটা প্রদত্ত। কারণ যদি আমরা স্বীকার করে নিই যে আড়ব্যক্তিগত হল স্বয়ং–গঠিত, আমরা দেখি তবে অলৌকিকের প্রকল্প অথবা অন্তর্লীনের প্রকল্প কেউই এই স্বয়ং–গঠনকে ধরতে পারে না যা তার অবস্থানের দ্বারা সমসাময়িক এবং ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক। তা বাস্তবে প্রতি মুহুর্তে স্বয়ং–গঠন যা দিয়ে ব্যক্তি ও আড়ব্যক্তিগতর সম্পর্ককে নির্দিষ্ট করে, যেন তা ছাপিয়ে যায় ব্যক্তিকে দীর্ঘমেয়াদে। আড়ব্যক্তিগত ব্যক্তির বাইরের কিছু নয় এবং সে তাই ব্যক্তির কিছু নির্দিষ্ট চরিত্র থেকে আলাদা। অন্যভাবে বললে, এই অলৌকিকতা যা নেয় অভ্যন্তরীনতার ভেক, বা আরো বেশি করে যা অভ্যন্তর এবং বাহিরের সীমায়, বাইরের কোনো মাত্রা আনতে পারে না, কিন্তু তা ব্যক্তির সাপেক্ষে ছাপিয়ে যাওয়া। আড়ব্যক্তিত্বর পরীক্ষার ঘটনাটি হয়ত ব্যাখ্যা করা যেত কখনো একটা ঊর্ধতন এবং বহিঃস্থ এক শক্তির ফিরে আসা হিসেবে, কখনো আভ্যন্তরীনতার এক গভীরতা অর্জন হিসেবে, যেমন সূত্রে আছে – 'সত্য হল, আমাদের ভেতরকারটাই আমাদের'। বা, 'ঈশ্বর যে আমার চেয়েও বেশি আমার ভেতরে' (সেন্ট অগাস্টিন, De vera religione XXXIX.72, *এবং* Confessions III 6.11 *) দেখায় যে প্রস্থানবিন্দুতে থাকে এই মৌলিক দ্ব্যর্থকতা : আড়ব্যক্তিগত না বহিঃস্থ, না ঊর্ধতন। সে চরিত্রায়িত করে ব্যক্তির সাপেক্ষে সমস্ত বহিঃস্থতা এবং সমস্ত অভ্যন্তরীনতার মধ্যে সত্যিকারের সম্পর্ক। হয়ত দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটি যার অনুসারে মানুষ বাধ্য হয়ে যায় বাইরে থেকে ভেতরে, এবং ভেতর থেকে*

ঊর্ধতনে; তা পারে সমানভাবে বিবৃত করতে ভেতর থেকে বাইরের পথ, ঊর্ধ্বতন জিনিসগুলি করায়ত্ত্ব হবার আগেই। কারণ তা হল বাহির এবং অন্দরের মধ্যের সম্পর্ক যা তৈরি করে আড়ব্যক্তিত্বের প্রস্থান বিন্দুটি।

সিমন্দঁ (২০১৩), পৃ ২৭৪ (৮–৩৭)

প্রজ্ঞা, নায়কত্ব, সাধুতা, এগুলো হল তিনটি স্বর যা খোঁজে এই আড়ব্যক্তিত্বকে যথাক্রমে উপস্থাপনা, ক্রিয়া, এবং ভাবোদ্রেকের প্রাধান্য অনুযায়ী। তবে এগুলোর কোনোটাই একা একা আড়ব্যক্তিত্বর সম্পূর্ণ সংজ্ঞায় পৌঁছতে পারে না। কিন্তু প্রতিটিই নকশা করে কোনো না কোনোভাবে আড়ব্যক্তিত্বের নানা দিকের একটি না একটিকে। এবং বহন করে ব্যক্তিগত জীবনের একটি শাশ্বত মাত্রা। নায়ক অমর করে রাখে নিজেকে তার আত্মোৎসর্গের মধ্যে দিয়ে যেন সে তার প্রত্যক্ষদর্শনে শহীদ এবং তার বিচ্ছুরিত চিন্তায় জ্ঞানী। ক্রিয়ার উৎকর্ষ, চিন্তার উৎকর্ষ, ভাবোদ্রেকের উৎকর্ষ, একে অন্যকে বাদ দিয়ে নয় এরা। সক্রেটিস হলেন একজন জ্ঞানী, কিন্তু তার মৃত্যু প্রত্যক্ষদর্শনে নায়কোচিত, বিশুদ্ধ ভাবোদ্রেক। শহীদেরা হল নায়ক হয়ে ওঠা সাধু। আড়ব্যক্তিত্বের সমস্ত স্বর অন্যান্য স্বরগুলোর আরম্ভ ঘটায়।

সিমন্দঁ (২০১৩), পৃ ২৭৫ (২৭–৩৬)

মনোবৃত্তীয় ব্যক্তিত্ব হস্তক্ষেপ করে আদর্শগুলিতে, যেগুলি থাকতে পারে না জীববৃত্তীয়ের স্তরে। যেহেতু জীববৃত্তীয় অন্তিমতা হল হোমিওস্টাটিক বা গতিশীল সাম্যাবস্থা এবং তার লক্ষ্য হল অস্তিত্বের এক সন্তুষ্টি অর্জন করা, অতিবৃহৎ সাম্যের অবস্থার মধ্যে, মনোবৃত্তীয় ব্যক্তিত্ব থাকে এই কায়দাটায় যেখানে এই জীববৃত্তীয় সাম্য, এই সন্তুষ্টি, এগুলো ধার্য হয় অপর্যাপ্ত বলে।

সিমন্দঁ (২০১৩), পৃ ২৭৬ (১৩–১৭)

মনোবৃত্তীয় ব্যক্তিত্ব উপরিস্থাপিত হয় জীববৃত্তীয় ব্যক্তিত্বের ওপর, তাকে ধ্বংস না করে, কারণ আধ্যাত্মিক বাস্তবতা সৃজন করা যায় না জীয়নের এক সরল নেতিকরণের দ্বারা। আমাদের নজর করতেই হবে যে, জীয়নের ক্রম এবং মনোবৃত্তীয় ক্রম নির্দিষ্টভাবে নিজেদের প্রতিভাত করতে পারে যেটা দ্বারা তা হল তাদের নিজ নিজ আদর্শমানগুলির গঠন করা এক অলংকার : সে এক সময় যেখানে জীববৃত্তীয় শান্তি বিরাজ করে যেন দুশ্চিন্তা প্রতিভাত হচ্ছে, এবং সে এক সময় যেখানে বেদনা থাকে যেন আধ্যাত্মিকতার আদানপ্রদান হচ্ছে আত্মরক্ষামূলক প্রতিবিম্বগুলিতে। ভয় আধ্যাত্মিকতাকে কুসংস্কারে রূপান্তরিত করে।

শেষমেশ, অলৌকিকের আবেদন যা দেখে, আধ্যাত্মিক বাস্তবতার

মধ্যে, জীবন্ত ব্যক্তির এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, তা আবারো অন্তর্লীনের খুব কাছে। আবারো সেখানে জীববৃত্তীয় বাস্তবতার বাহুল্য, আধ্যাত্মিকতার প্যান্থেইস্তিক বা ক্রিয়েশনিস্ত ধারনার মধ্যে।

সিমন্দঁ (২০১৩), পৃ ২৭৬ (২২–৩৬)

আড়ব্যক্তি–র উদাহরণ হিসেবে আমরা একটি টিপ্পনী দেব এখানে।

টিপ্পনি : আড়ব্যক্তি

শস, ফেবুপো, ৪।৮।২০১৮

লোকের ফোনবুকে আধার কর্তৃপক্ষ ইউএডিয়াই এর ফোন নম্বর ভুতুড়ে ভাবে হাজির হয়ে যাওয়ায় শোরগোল পড়েছিল। কে ঢোকালো? গুগল বলেছে, আমরা ঢুকিয়েছি। হ্যাঁ, আপনি আপনার ফোনে যা যা করেন, যা যা করেন মানে যা যা করেন। পাপ পূণ্য। সব গুগল জানে, জানতে পায়। আরো প্রচুর অ্যাপ জানে, জানতে পায়। ওদের সার্ভারে লেখা হয়ে যাচ্ছে আজকের পৃথিবীর মানুষের মনোগত অস্তিত্বজননের বহু চিহ্ন। আপনি যেই তর্জনী ছোঁন, আপনার বর্তমানের ইতিহাস লেখা হয়ে যায় ওদের সার্ভারে। রাষ্ট্রায়ত্ত বাধ্যবাধকতায় আপনি আপনার কিছু মৃত তথ্য রাষ্ট্রীয় পঞ্জিতে ঢোকাবেন কিনা, তা বিতর্কের বিষয়, কারণ ওই বাধ্যবাধ্যকতা, পঞ্জিকরণ, ওই তথ্যগুলোকে বকলস বানিয়ে দেওয়া... সম্ভবতঃ। কিন্তু ঐচ্ছিকভাবেই আপনি আপনার বহু বহু জীবন্ত কিছুকে তথ্য হিসেবে বানিয়ে ওদের সার্ভারে চালান করে দিচ্ছেন।

তবে আপনার সুযোগ আছে ওদের কনফিউজ করার। নিজের সাথে সাবোতাজ করুন। ধরুন, আপনার খুব প্রেম করতে ইচ্ছে করছে, তো হরর সিনেমার খোঁজ করুন। আপনি সাইকেল কিনতে চান, তো তিনদিন ধরে গুগল ফ্লিপকার্ট আমাজনে কাঁটা কম্পাসের খোঁজ করুন, মাঝে একফাঁকে সাইকেল দেখে নিলেন দু'মিনিটের জন্য। আপনার ব্রেক–আপ হয়েছে, তো সদ্যজাত–র পরিবেশবান্ধব ন্যাপির খোঁজ করুন।

কী ভাবছেন? কীভাবে সম্ভব এই নিজের সাথে সাবোতাজ? একটু কম স্বার্থপর হলেই সম্ভব। খালি সারাক্ষণ আমার আমার করবেন না। নিজের চাহিদার বিষয় হিসেবে তার কথা না ভেবে তার মতো করে তাকে ভাবুন।

তাদের মতো করে তাদের ভাবুন। তার প্রয়োজনের জিনিস নিয়ে নিজের সময় ব্যয় করুন। এর, ওর, তার। আপনার ফোন আপনার ব্যক্তিগত। কিন্তু আপনাকেও যে পাতি ব্যক্তিগত হতে হবে এমন তো কোনো মাথার দিব্যি নেই। এর ওর তার দরকারকে ব্যক্তিগতর মধ্যে রাখলে আপনারটা আর পাতি ব্যক্তিগত থাকল না। হয়ে গেল আড়ব্যক্তিগত। ট্রান্সইন্ডিভিজুয়াল। আপনি আর ব্যক্তি থাকলেন না। হয়ে গেলেন আড়ব্যক্তি।

কীভাবে সবচেয়ে সহজে এটা শুরু করা যায় প্রাত্যাহিক ব্যবহারিক জীবনে? যা কিছু আপনি আপনার ব্যক্তিগত সামগ্রী বলে মনে করেন, তা অন্যদেরকে ব্যবহার করতে দিন। জামা পাজামা। মোবাইল। সাইবার–যুক্তির মৌলিক পূর্বধারণা হল ব্যক্তি। ব্যক্তিগত। তাকে ঘেঁটে দেয়, তার ডিস্টোপিয়াকে আছোলা বাঁশ দেয় আড়ব্যক্তি। আড়ব্যক্তিগত। নিয়ন্ত্রণী ব্যবস্থা থেকে বাঁচতে আপনি নিজেও একটু একটু করে পাঁচ আড় হতে শুরু করুন। পাচার হতে। ট্রান্সফারেবল।

সামুহিক ব্যক্তিকরণ এবং আড়ব্যক্তির ভিত্তি

সামাজিক সময় ও ব্যক্তিগত সময়

> *ব্যক্তি সমাজের মধ্যে মুখোমুখি হয় হওয়া স্বরূপ অত্যাবশ্যকতা এবং অতীতের এক সংরক্ষণের। সমাজের মধ্যে ব্যক্তির হওয়া হল এক জালিকাকার হওয়া, যা শর্তায়িত সে কোন বিন্দুগুলোতে স্পর্শ করে আছে সমাজকে, তা দিয়ে। এবং যার আছে একটি কাঠামো যা খুবই সদৃশ ব্যক্তিগত অতীতের সাথে। ব্যক্তির সমাজের সঙ্গে সংযোগ তাকে নিয়ে যায় এটা বা ওটা হওয়ার দিকে। হওয়া কার্যকরী হয় না আর, যখন অসামাজিক ব্যক্তিতে দেখা হয় প্রকল্প হিসেবে, বর্তমানের দিকে হওয়া–কে: তা কার্যকরী হয় উল্টোভাবে, বর্তমান থেকে ছেড়ে যাওয়া–য়। ব্যক্তি নিজেকে দেখে প্রস্তাবক হিসেবে, অভিলক্ষ্যের, পছন্দের চরিত্রের। সে অবশ্যই যায় সেই চরিত্রগুলির দিকে, সেই রকমগুলির দিকে, সেই ছবিগুলির দিকে, সেই কাঠামোগুলি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হতে যা সে বাধ্য করে নিজেকে উপলব্ধি করতে সেগুলির মতো করে, এবং সেগুলি যাতে সার্থক হয় তার জন্য।*
>
> *সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৭৫ (১৮–২৬), পৃ ১৭৬ (১–৪)*

সামাজিকতার প্রয়োজন বর্তমান। কিন্তু বর্তমান ফিরে আসে। সামাজিক আত্মা এবং ব্যক্তিগত আত্মা কাজ করে বিপরীতভাবে, ব্যক্তিকরণ করে একটিকে আরেকটিতে। সেই কারণে ব্যক্তিকে মনে হতে পারে নিজেকেই

যেন সামাজিক-এর মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে, এবং নিজের স্থানটি পোক্ত করেছে সামাজিকের বিপরীতে। সামাজিককে মনে হয় একটা বাস্তবতা যা ব্যক্তি সাপেক্ষে তার পরিপার্শ্ব থেকে খুবই আলাদা। এটা হলো বোধের এক প্রসারণ মাত্র এবং যথেষ্ট অযথাযথ এইভাবে তাকে সামাজিক পরিপার্শ্ব বলা। সামাজিক হতে পারত এক পরিপার্শ্ব, যদি ব্যক্তিকৃত অস্তিত্ব হত একটি সরল লব্ধি ব্যক্তিকরণ যা সম্পূর্ণ হয়েছে সবটা একবারে, অর্থাৎ যা বদলে বদলে যাওয়ার মাধ্যমে বেঁচে থাকছে না। সামাজিক পরিপার্শ্ব কেবল সেইসব উপায়ের মধ্যে থাকে সামাজিক পরিপার্শ্ব হিসেবে যেখানে তাকে চেনা জানা যায় না সামাজিক হিসেবে, বৈপরীত্য রূপে। সেই ধরনের এক পরিস্থিতি কেবল মেলে একটি শিশুর সঙ্গে বা অসুস্থ কারোর সঙ্গে। সে সংহত প্রাপ্তবয়স্ক নয়। সংহত প্রাপ্তবয়স্ক সামাজিকের সাপেক্ষে সমানভাবে সামাজিক একটি অস্তিত্ব, সেইসবের মধ্যে যেখানে সে ধারন করে এক আসল সক্রিয় সচেতনতা, অর্থাৎ সেই উপায়ের মধ্যে যেখানে সে সম্প্রসারণ করে এবং চিরস্থায়ী করে ব্যক্তিকরণের গতিবিধিকে যা তাকে জন্ম দিয়েছে, সেই ব্যক্তিকরণের লব্ধিকরণের বদলে। সমাজ অনেক ব্যক্তির পারস্পরিক বর্তমান থেকে বাস্তবে সরে যায় না, কিন্তু সে এক সার বাস্তবতাও নয় যাকে ব্যক্তি অস্তিত্বগুলির ওপর পতিত হতে হবে এবং যাকে ভাবা হবে তাদের থেকে স্বাধীন : সে হল ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার শর্ত যার দ্বারা বর্তমানের একটি ধারা তৈরি হয় যা ব্যক্তি অস্তিত্বের একার বর্তমানের তুলনায় খুব জটিল।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৭৬ (২২-৪১), পৃ ১৭৭ (১-৯)

আভ্যন্তরীন গোষ্ঠী এবং বাহ্যিক গোষ্ঠী

একটি ব্যক্তিকৃত অস্তিত্ব এবং অন্য আরেকটি ব্যক্তিকৃত অস্তিত্বের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হতে পারে তুল্যতার মাধ্যমে, যখন প্রত্যেকের অতীত এবং ভবিষ্যত অন্যের অতীত এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে সমাপতিত; আবার তৈরি হতে পারে অ-তুল্যতার মাধ্যমে, যখন একজন ব্যক্তিকৃত অস্তিত্ব ভবিষ্যত খোঁজে অন্য অস্তিত্বগুলির সঙ্গে মেলবন্ধনের মাধ্যমে, তাদের বিষয়ী হিসেবে নিয়ে নয়, একটি জালিকাকার কাঠামো হিসেবে যা সে যেগুলোর মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে সেগুলো মিলিয়ে তৈরি। প্রথম কেসটি হলো আমেরিকান নামকরণে ইন-গ্রুপ. আর পরেরটিকে আমরা নাম দিই আউট-গ্রুপ। কারণ, এমন কোনো ইন-গ্রুপ বা অন্তর্গোষ্ঠী নেই যা ধরে নেয় না কোনো আউট-গ্রুপ। সামাজিক হল মধ্যস্থতা, ব্যক্তিগত

অস্তিত্ব এবং আউট-গ্রুপের বা বহির্গোষ্ঠীর মধ্যে, ইন-গ্রুপের মাধ্যমে। বার্গসন যেভাবে এগিয়েছিলেন, বদ্ধ গ্রুপ এবং উন্মুক্ত গ্রুপের মধ্যের বৈপরীত্যের মধ্যে দিয়ে (ল্য দ্যো সোর্স দ্য মরাল এ দ্য লা রেলিজিয়ঁ), সেভাবে এগিয়ে কোনো লাভ নেই। সামাজিক, কাছ থেকে দেখলে, উন্মুক্ত; দূর থেকে দেখলে, বদ্ধ। সামাজিকের কাজকর্ম বরং অবস্থিত ইন-গ্রুপ এবং আউট-গ্রুপের সীমারেখায়, ব্যক্তি এবং গ্রুপের সীমারেখার চেয়ে।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৭৭ (১০-২৭)

ব্যক্তিকে অবশ্যই খুঁজে পেতে হবে এক সামাজিক ব্যক্তিকরণ যা তার নিজস্ব ব্যক্তিকরণকে পুনরুদ্ধার করে। তার অন্তর্গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক এবং তার বহির্গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক হল একটা এবং অন্যটা যেন ভবিষ্যত ও অতীত। অন্তর্গোষ্ঠী হল হল অলীকত্ব বা ভার্চুয়ালিটির উৎস, টেনশনের, যেমন, ব্যক্তিগত ভবিষ্যত। তা হল বর্তমানের আকর কারণ তা ব্যক্তির আগে চলে যখন বহির্গোষ্ঠীর সাথে মোলাকাত হয়। সে বহির্গোষ্ঠীকে ফিরিয়ে দেয়। বিশ্বাসের রূপের নিচে, অন্তর্গোষ্ঠীকে মনে হয় একটা ঝোঁক যা কাঠামোগত নয়, ব্যক্তির ভবিষ্যতের সঙ্গে তুলনীয় যা। সে মানানসই হয় ব্যক্তিগত ভবিষ্যতের সঙ্গে, কিন্তু সে ব্যক্তির অতীতকেও ধরে নেয়, কারণ ব্যক্তি নিজের এক জন্ম দেয় আভ্যন্তরীন গোষ্ঠীর মধ্যে, বাস্তব অথবা অতিকথা হিসেবে। সে সেই গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠীর জন্য। ভবিষ্যত এবং অতীত সরলীকরণ করে নেওয়া হয়, নিয়ে আসা হয় এক মৌলিক শুদ্ধতার দশায়।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৭৮ (৩২-৪১), পৃ ১৭৯ (১-৭)

সামাজিক বাস্তবতা যেন সম্পর্কের ব্যবস্থা

... আভ্যন্তরীন গোষ্ঠী মধ্যস্থতা করে ব্যক্তিকৃত এবং সামাজিক এর ভেতর সম্পর্কের মধ্যে। গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীনতা হল ব্যক্তিগত স্বকীয়তার একটি মাত্রা। তা কিন্তু ব্যক্তির কোনো স্বাতন্ত্র্যের সূচক নয়। তা ব্যক্তির অপরের অংশগ্রহণের এলাকা। অংশগ্রহনের পরিপার্শ্ব এবং না-অংশগ্রহনের পরিপার্শ্বের মধ্যে সম্পর্ক হল সামাজিক জীবন।

মনোবিদ্যাবাদ বা সাইকোলজিবাদ অপর্যাপ্ত, সামাজিক জীবনকে উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে, কারণ, তা মনে করে আন্তঃগোষ্ঠী সম্পর্কগুলিকে ধরা যেতে পারে ব্যক্তি এবং আভ্যন্তরীন গোষ্ঠীর সম্পর্কের প্রসারণ হিসেবে।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৭৯ (১৯–২৯)

কারণ, মনোবৃত্তীয় বা সামাজিক নয়, বরং যা মানুষিক, তা তার চরম সীমায় এবং কদাচিৎ নিজেকে দ্বিগুণায়িত করতে পারে মনোবৃত্তীয় এবং সামাজিকের মধ্যে। মনোবিদ্যা সমাজবিদ্যার মতোই, এই দুটি হল দুটি উপায় যারা তাদের যথাযথ বিষয় তৈরি করে নেয় তাদের আভ্যন্তরীনতা এবং বাহ্যিকতা থেকে : প্রথমতঃ সামাজিকের মনোবৃত্তীয় কাজ করে ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলির মধ্যস্থতায়। কারণ, এভাবে মনোবৃত্তীয় থেকে সামাজিক-কে আনা যায় প্রথমে, যা মেনে চলে সামাজিকের কিছু জিনিসকে মনোবৃত্তীয় হিসেবে। যেমন আমেরিকান মনোবিদদের 'অ্যাফেকটিভ স্টেবিলিটি', ব্যক্তিগত অস্তিত্বের চরিত্র যা এরই মধ্যে সামাজিক এবং প্রাকসামাজিক। সেইভাবেই, অভিযোজন এবং সাংস্কৃতিক অভিযোজনের সক্ষমতা হল অস্তিত্বের প্রাকসামাজিক কিছু দিক। ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে দেখা হয় সেই ঘটনাগুলি দ্বারা যেগুলি উপচে পড়ছে তার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব দিয়ে।

একইভাবে সামাজিক ভাব আটকে থাকে সামাজিকের মধ্যে। যা ধরে রাখে যা প্রাকসামাজিক এবং যা অনুমোদন করে তার পুনর্গঠনের মধ্যে ব্যক্তিগত বাস্তবতার পুনরানুসন্ধান। এই কায়দার মধ্যে আমরা বুঝে যাই, কেন শ্রমের গবেষণায় এই ধরনের সমস্যাগুলো গুলিয়ে যায় মনোবিদ্যাবাদ এবং সামাজিকের বৈপরীত্যের কারণে। মানবিক সম্পর্কগুলি যা শ্রমকে চরিত্রায়িত করে অথবা যা, কমবেশি খেলাটার মধ্যে আছে শ্রমের দ্বারা তারা না পারে আটকে থাকতে সামাজিক বিষয়বত্তা-র খেলাটার মধ্যে, না পারে আটকে থাকতে এক আন্তঃমনোবৃত্তীয় পরিকল্পনার মধ্যে। তারা থাকে আভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক গ্রুপের সীমানায়। কারণ, আন্তঃমনোবৃত্তীয় সম্পর্ক হিসেবে দেখতে গেলে, শ্রমের মানুষিক সম্পর্কগুলো আত্তীকৃত হয়ে যাবে কিছু সংখ্যক অভাব পূরণের মাধ্যমে, যদিও সেই তালিকাকে সাজানো যেতে পারে ব্যক্তিগত অস্তিত্বের এক তত্ত্বতালাশ থেকে যে ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে সমস্ত সামাজিক সংযোগের আগে গ্রহণ করা হয়েছে। যেন সে এক শুদ্ধ ব্যক্তি, এবং পূর্ণাঙ্গ, সমস্ত ধরনের সাম্ভাব্য সংযোগের আগেই। শ্রমকে ধরা হয় তখন ব্যক্তিগত অভাবের পূরণ রূপে, মানুষের একটি এসেন্স বা সারবস্তু-র সাপেক্ষে, সামুহিক, কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে নির্ধারিত। আত্মা ও শরীরের মধ্যেকার অস্তিত্বের মধ্যে কাজ করে (যা শারীরিক শ্রমের ধারনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় এবং বৌদ্ধিক শ্রমের ধারনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, শ্রমের ওই দুই স্তরের মধ্যে থাকবন্দী

তফাৎ সহ)। সামাজিকবাদের জায়গা থেকে, বিপরীতে, শ্রমকে দেখা হয় সমাজবদ্ধ মানুষের দ্বারা প্রকৃতির শোষণ, এবং তাকে জানা হয় রাজনৈতিক–অর্থনীতির সম্পর্ক বরাবর। শ্রম বিষয়বত্তা পায় বিনিময়মূল্য হিসেবে, একটা সামাজিক ব্যবস্থায়, যেখানে ব্যক্তি অন্তর্হিত হয়। শ্রেণীর ধারনার ভিত্তি হল গোষ্ঠী এবং সবসময় তাকে ধরা হয় বাহ্যিক গোষ্ঠী। যথাযথ শ্রেণীর অভ্যন্তর–টি আর একটি সামাজিক শরীর নয় যা স্বকীয়তা গুলির সীমায় সহবাস করে। কারণ শ্রেণী ব্যক্তির সাপেক্ষে আর উৎকেন্দ্রিক নয়। শুদ্ধ শ্রেণীকে ভাবা হয় শুদ্ধ শ্রেণী যেখানে সে বিদ্বেষী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সেখান থেকে। এখানেই ফিরে এল সচেতনতার ভূমিকা যা দিয়ে শুদ্ধ শ্রেণী শুদ্ধ শ্রেণী হয়। সচেতনতার ভূমিকা এই প্রাথমিক বিরোধিতার পরে আসে। সেখানে আর পর পর বৃত্তের কাঠামো নেই, বরং সংঘর্ষের কাঠামো, একটা যুদ্ধক্ষেত্র।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৮০–৮১

মানুষের সারবস্তু–র ধারনা এবং নৃতত্ত্বর ধারনার অপর্যাপ্ততা

কারণ, আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে এক নৃতত্ত্ব সক্ষম কি না মনুষ্যের ব্যাপারে একত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গী দিতে যা নীতিগতভাবে সামাজিক সম্পর্কের গবেষণাকে পুষ্ট করতে সক্ষম। কিন্তু এক নৃতত্ত্ব বহন করে না এই সম্পর্কগত দ্বৈততা যা সম্পর্কের চরিত্রগত ঐক্যকে ধারন করে। তা সারবস্তুকে ছেড়ে যাওয়া নয় যা আমরা মানুষের বলে দেখাতে পারি। কারণ সমস্ত নৃতত্ত্বকে মানতে হবে ব্যক্তিগত বা সামাজিক যাই হোক তার বিষয়বত্তাকরণ, মানুষের সারবস্তু দেবার জন্য। নৃতত্ত্বের নিজের দ্বারা তো বাহিত হয়ই 'মানুষ'–এর বৈশিষ্ট্যমূলক অন্তর্গত ইতিবাচকতা, জীবন্ত–র চেয়ে আলাদা করে। কারণ, এটা নিশ্চিত, আমরা জীবন্তের মানুষকে ছেড়ে বেরোতে পারি না, যদি তার জন্য জীবন্ত 'মানুষ'কে ছেড়ে দিতে হয়ও। কিন্তু জীবন্ত হল জীবন্ত, মানুষকে নিয়েই, 'মানুষ' বাদ দিয়ে সে জীবন্ত নয়। তা জীবন্ত 'মানুষ'–এর মতোই, 'মানুষ'কে বুঝেই। তা পুরোপুরি জীবন্ত, বোঝা হয় 'মানুষ' বলে। ...

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৮১

মানুষ হল সামাজিক, মনোসামাজিক, মনোজাগতিক, শারীরিক, এবং কোনোটাকেই মৌলিক এবং বাকিগুলি পরিপার্শ্বিক বলে বিবেচনা করা যাবে না। শ্রমকে, বিশেষ করে, সংজ্ঞায়িত করা যায় না কেবল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটি সম্পর্ক রূপে। এক ধরনের কাজ আছে, যা প্রকৃতির

ওপর প্রযোজ্য নয়। যেমন, মানুষের নিজের ওপর নিজের শ্রম, এক শল্যচিকিৎসকের শ্রম। মানুষ কর্তৃক প্রকৃতির শোষণ হল একটা বিশেষ কেস — সম্পর্কীয় কার্যকলাপে, যা শ্রমটা তৈরি করে।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৮২ (১০–২০)

একটা বিশেষ কেসকে ভিত্তি হিসেবে নেওয়া যাবে না, যতই তাকে ঘনঘন দেখা যাক না কেন। শ্রম হল একটা বিশিষ্ট সম্পর্ক — আভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে, যেমন যুদ্ধ, প্রচার, বাণিজ্য। প্রতিটি গোষ্ঠী অন্যদের সাপেক্ষে হয়ত বিবেচিত হয়, একটা নির্দিষ্ট বিচারে, ব্যক্তি হিসেবে। কিন্তু চিরাচরিত মনোসামাজিকের ধারনা ভুল করে গোষ্ঠীকে ধরে নেয় ব্যক্তির পিণ্ডীকরণ হিসেবে, যেভাবে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে ব্যক্তির পিণ্ডীকরণকে ধরা হয়। বাস্তবে আভ্যন্তরীন গোষ্ঠী (এবং সমস্ত গোষ্ঠী তার নিজের সাপেক্ষে এইভাবে থাকে যেন সে আভ্যন্তরীন গোষ্ঠী) হল ব্যক্তিগত স্বকীয়তার উপরিপাত, এবং তার পিণ্ডীকরণ নয়। পিণ্ডীকরণ, তা সে জৈবনিক হোক বা অজৈবনিক, ধরে নেবে শারীরিক বাস্তবতার স্তরের একটি দৃষ্টিভঙ্গী, দেহ–মনো সমাহারের দৃষ্টিভঙ্গী নয়।

একটি আভ্যন্তরীন গোষ্ঠীর কাঠামো একজন ব্যক্তির চেয়ে জটিল হয় না। প্রতিটি ব্যক্তিগত স্বকীয়তা মিলে যায়, যাকে আমরা নাম দিতে পারি গোষ্ঠীগত স্বকীয়তা, তার সাথে, অর্থাৎ গোষ্ঠীটি যে ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি, তাদের ব্যক্তিগত স্বকীয়তার বদলে। কারণ, এইভাবে গোষ্ঠীকে দেখা একটা মনোবিদ্যাবাদ নয়, দুটি কারণে : প্রথমতঃ স্বকীয়তার কথা শুদ্ধ মনোজাগতিক হিসেবে ধরা যায় না, বাস্তবে এবং একইসাথে মনোশারীরিক, যার মধ্যে আছে ঝোঁক, প্রবৃত্তি, বিশ্বাস, শারীরিক মনোভাব, চিহ্নায়ন, প্রকাশ। দ্বিতীয়তঃ খুব জরুরি এটি এবং প্রথমটির ভিত্তি, তা হল — আভ্যন্তরীন গোষ্ঠীতে ব্যক্তিগত স্বকীয়তার পুনরুদ্ধার একটা কাঠামোর ভূমিকা পালন করে এবং তা স্ব–গঠিত। এই পুনরুদ্ধার হল এক ব্যক্তিকরণ, একটি দ্বন্দ্বের নিরসন, দ্বান্দ্বিক টানাপোড়েনের নিরসন, জৈবনিক, কাঠামোগত এবং কার্যগত স্থিতি। আভ্যন্তরীনভাবে সংজ্ঞাত স্বকীয়তাগুলির নিজ নিজ কাঠামো বলে কিছু নেই, সেগুলি তৈরি হয়েছে সেই মুহূর্তে যখন আভ্যন্তরীন গোষ্ঠী নিজেকে গঠন করছে, সেগুলি এসেছে মুখোমুখি হবার ফলে এবং পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে। মনোশারীরিক স্বকীয়তা হল গোষ্ঠীর জননের সমসাময়িক, যে আবার হল একটি ব্যক্তিকরণ।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৮২ (২৪–৪১), পৃ ১৮৩ (১–২৪)

ব্যক্তিকরণ, যা গোষ্ঠীর জন্ম দেয় তা গোষ্ঠীবদ্ধ ব্যক্তিদেরও একটা

ব্যক্তিকরণ; আবেগ ছাড়া, সম্ভবনা ছাড়া, অগ্রিম দুশ্চিন্তা ছাড়া, গোষ্ঠীর ব্যক্তিকরণ হতে পারে না। মোনাদ বা পরমাণু দিয়ে গড়া সমাজের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। চুক্তি একটি গোষ্ঠী তৈরি করতে পারে না, একটি অস্তিত্বশীল গোষ্ঠীর বিধিসম্মত বাস্তবতার চেয়ে বেশি কিছু হয় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পূর্বগঠিত গোষ্ঠীটি একটি নয়া ব্যক্তিকে বরণ করে নেয়। নতুনটিকে বরণ করে নেওয়া পুরনোটির জন্য নয়া জন্ম (ব্যক্তিকরণ), এবং গোষ্ঠীর জন্যও এক নবজাগরণ, যে গোষ্ঠী নতুন নতুন সদস্যদের দ্বারা পুনর্সৃজিত হতে পারে না, সে আভ্যন্তরীন গোষ্ঠী হিসেবে আর থাকতে পারে না।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৮৪ (৮–২১)

শুদ্ধ সমাজগোষ্ঠী কখনোই আভ্যন্তরীন নয় এবং কেবল সামাজিক বিষয়। একটি গোষ্ঠী মনোগোষ্ঠী সেই মুহূর্তে যখন সে তৈরি হল। কিন্তু মনোগোষ্ঠীর এই ঘোষণা কেবল থেকে যায় যদি সে তাদের রেখে দিতে পারে, সমাজগোষ্ঠীসুলভ কাঠামোগুলির জন্ম দিয়ে। কেবল বিমূর্তায়নের মধ্যে দিয়েই আমরা শুদ্ধ মনোগোষ্ঠী এবং শুদ্ধ সমাজগোষ্ঠীর তফাৎ করতে পারি।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৮৪ (২৮–৩৫)

গোষ্ঠীর ব্যক্তির ধারনা

... গোষ্ঠী আন্তঃব্যক্তিগত বাস্তবতা নয়, বহুধা ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিকরণ। একটি ব্যাপক ঐক্যকরণ।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৮৫ (৬–৯)

একটি মধ্যবর্তী মাত্রার নির্বাচন, মাইক্রোসামাজিক বা ম্যাক্রোমনোজাগতিক, তা সমস্যাটিকে সমাধান করতে পারে না। কারণ তা গড়ে উঠছে না একটি বিশেষ ঘটনাতে একটি পর্যাপ্ত মাত্রা নির্বাচনের ওপর, যা সামাজিক এবং মনোজাগতিকের মধ্যবর্তী।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৮৫ (১৯–২১)

গোষ্ঠীতে ব্যক্তির সাপেক্ষ হল সর্বদা তার ভিত্তির মতো। তা দাঁড়িয়ে থাকে একইসাথে দুটি ব্যক্তিকরণের ওপর। ব্যক্তির এবং গোষ্ঠীর। সে হল বর্তমান।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৮৫ (৪০–৪১), পৃ ১৮৬ (১–২)

গোষ্ঠীর ব্যক্তির মধ্যে বিশ্বাসের ভূমিকা

ব্যক্তির মধ্যে, বিশ্বাস হল যেন লীন সমাবেশ যার সাপেক্ষে চিহ্নায়ন আবিষ্কৃত হয়।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৮৬ (৩–৫)

বিশ্বাস ধরে নেয় বিশ্বাসের একটা ভিত্তি, যা ব্যক্তিত্ব ন্যস্ত করে গোষ্ঠীর ব্যক্তিকরণের মধ্যে; বিশ্বাস বিকশিত হয় ব্যক্তির মধ্যে ঠিকঠাক বিশ্বাসের রূপের নিচে, যা ওই গোষ্ঠীর বাহ্যিক রূপ। বিশ্বাস হল সঠিকভাবেই আন্তঃব্যক্তিগত। সে ধরে নেয় একটি ভিত্তি যা কেবল আন্তঃব্যক্তিগত নয়, ঠিকঠাক গোষ্ঠীগত–ও।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৮৬ (২১–২৮)

আমরা হয়ত তফাত করতে পারি মিথ বা অতিকল্পের বোধ, সামুহিক বিশ্বাস, আর মত–কে, যা ব্যক্তিগত বিশ্বাস। কিন্তু অতিকল্প আর মতামত নির্দেশ করে একটি প্রতীকী যুগ্মতাকে। যখন গোষ্ঠী অতিকল্পকে বিস্তারিত করে, গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা প্রকাশ করে মানানসই মতামত। অতিকল্পগুলো হল মতামতগুলির জ্যামিতিক পরিসর।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৮৭ (৭–১৫)

অতিকল্প প্রতিনিধিত্ব করে গোষ্ঠীর এবং ব্যক্তি তার ভেতরের জিনিস। এবং মতামত নানাবিধ যদিও একটি নির্দিষ্ট বিষয়গত, অন্যগুলির থেকে পৃথক পরিস্থিতিতে।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৮৭ (২০–২৯)

মতামত বহন করে ব্যক্তি, এবং তা প্রকাশিত হয় সেই অবস্থায় যখন ব্যক্তি গোষ্ঠীতে নেই আর। বরং নিজেই সে 'গোষ্ঠী' এবং অভিনয় করে যেন বা নিজেই সে 'গোষ্ঠী'। মতামত ব্যক্তিকে দেয় অন্য ব্যক্তিদের মুখোমুখি হবার অনুমতি। যারা নিজেরাও গ্রুপের মতো দেখতে। বাহ্যিক গোষ্ঠীর মতো যারা এখন আভ্যন্তরীন গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক রেখেছে বাহ্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে মুখোমুখি হবার মাধ্যমে। অতিকল্প, বিপরীতে, মতামতের সাধারণ কিছু যা আভ্যন্তরীন গোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনাকে মেনে চলে। তাই জন্যই অতিকল্পের যথাযথ দিশা থাকে না, তার শুদ্ধ রূপের তলায়, যা আভ্যন্তরীন গোষ্ঠীর চেয়ে বেশি। সে ধরে নেয় একটা অংশগ্রহণের যুক্তি। এবং একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রামাণ্য ভিত্তি যা অংশগ্রহণ করায় গ্রুপের ব্যক্তিকরণে।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৮৭ (৩৩–৪১), পৃ ১৮৮ (১–২)

গোষ্ঠীর ব্যক্তিকরণ এবং জীবন্ত ব্যক্তিকরণ

... শেষমেশ, অনেকসময়ই, জীবন হল সর্বদা সামাজিক। কোনো কোনো ক্ষণমুহূর্ত বাদে (যেমন, অনুষ্ঠান, সঙ্গম)।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৮৮ (১১–১৩)

মানুষের কাছে সমস্যাটি খুবই জটিল। ব্যক্তির কার্যগত এবং শারীরিক স্বাধীনতা রয়েছে। যেমন রয়েছে অন্য স্তন্যপায়ীদের। একা এবং গোষ্ঠীতে বাঁচার সম্ভবনাও রয়েছে, ব্যক্তির শারীরিক এবং কার্যগত অর্জনের খাতিরে। এই অবস্থায় সে গোষ্ঠী পেতে পারে, যা পারিপার্শ্বের তুলনায় একটি নালিকার মতো। মার্ক্স শ্রমের চরিত্রগত সমাবেশকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু মনে হয় এখানে বেশিরভাগ দেহমনোগত ব্যক্তিকরণ আনে স্বাধীনতা অথবা একটি নির্দিষ্ট নালিকার স্তরে সমাবেশ। মানুষিক অস্তিত্ব সবসময় থাকে অনর্জিত, অসম্পূর্ণ, বিকাশশীল ব্যক্তি হয়ে ব্যক্তির দ্বারা। একটিও নালিকা–বিশেষ যথেষ্ট নয় এই সজোর হওয়া–র উত্তরের জন্য। সবই এক দেহমনোগত সম্পূর্ণতা পেতে চেয়ে, যা অন্ততঃ পশুদের মতো যথাযথ। মানুষকে মনে হয় খুবই অসম্পূর্ণ এক অস্তিত্ব। সবকিছুই এইভাবে ঘটে, একটি নির্দিষ্ট প্রাথমিক ব্যক্তিকরণের পেছনে, মানুষ খোঁজে এর মধ্যে অন্য আরেকটা, এবং তার প্রয়োজন হয় পরপর দুটি ব্যক্তিকরণের। দুনিয়াতে জীবন্ত হিসেবে গৃহিত হওয়া মানে, সে নিজেকে নিয়োজিত করে দুনিয়া আবাদ করানো–তে। কিন্তু সে তবু অভাববোধ করে কোনোকিছুর। সে থেকে যায় খালি, অনর্জিত। প্রকৃতিকে আবাদ করা তাকে লক্ষ্যপূরণের তুষ্টি দিতে পারে না। আভ্যন্তরীন গোষ্ঠী দুনিয়ার মুখোমুখি পরিসর নয়। থাকতেই হবে আরও অন্য কোনো সম্পর্ক, প্রতিটি মানুষের মধ্যে, যা সামাজিক ব্যক্তিত্বের মতো, এবং সেজন্য থাকতেই হবে দ্বিতীয় এক ধরনের জনন — যা হল গোষ্ঠীর ব্যক্তিকরণ।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৮৯ (৬–৩৪)

... কিছু কিছু জিনিস বেশি বেশি কাজ করে গোষ্ঠীর মধ্যে; এই আভ্যন্তরীনতা তৈরি করে দ্বিতীয়বারের জন্য মানুষিক ব্যক্তি; বায়োলজিক্যাল ব্যক্তিকৃত সে তো বটেই, তার ওপর এই দ্বিতীয় ব্যক্তিকরণ। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিকরণ হল গোষ্ঠীর ব্যক্তিকরণ। কিন্তু তাকে কখনওই নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীতে সংকুচিত করে আনা যায় না, যেমন — প্রকৃতির আবাদ সমাবেশিত মানুষের দ্বারা। এই গোষ্ঠীর আমরা নাম দিতে পারি, কার্যকলাপের গোষ্ঠী, তা আভ্যন্তরীন গোষ্ঠীর থেকে স্বতন্ত্র।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৯০ (৫–১৪)

পরিকাঠামোর ধারনাও একইভাবে সমালোচনা করা যায়। শ্রম হল একটা কাঠামো, আরো ভালো করে বললে একটা রূপ, একটা সম্ভবনা, একটি নির্দিষ্ট কায়দায় তা দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ঠ একটা কার্যকলাপ জুড়ে থাকে বলে সে একটা কাঠামোয়ায়ন, নিজেই একটা কাঠামো হবার বদলে। যেহেতু আমরা স্বীকার করি যে সমাজ–প্রাকৃতিক শর্তাবলীগুলো একটা নির্দিষ্ট স্তরে বহুবিধ, একটাকে বের করে আনা কঠিন এবং তাকে উত্থাপন করা কঠিন, যার কাঠামো হিসেবে মূল্য আছে। মার্ক্স হয়ত একটা ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনাকে সাধারণীকরণ করেছিলেন, ঊনবিংশ শতকে মানুষের সমস্ত সম্পর্কগুলোর মধ্যে শ্রম নামক মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্কটি সবচেয়ে প্রাধান্য পায় তা জেনে। কিন্তু কঠিন হল, সেই মানদণ্ডটা খুঁজে বার করা যা মঞ্জুর করে এই সম্পর্ককে নৃতত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া। মানুষ যে শ্রম করে সে বায়োলজিক্যালি ব্যক্তিকৃত এরই মধ্যে। শ্রম হল বায়োলজিকের স্তরে প্রকৃতির আবাদ। তা হল মানবতায় প্রতিক্রিয়া, প্রজাতিরূপে নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া। তাই জন্য শ্রম হল এমন জিনিস যা আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্কে ঢুকে পড়ে। এর কোনো যথাযথ প্রতিরোধ নেই, এ তৈরি করতে পারে না কোনো যথাযথ মানুষিক দ্বিতীয় ব্যক্তিকরণ; তার আত্মরক্ষা নেই। ব্যক্তি নিজে বায়োলজিক ব্যক্তিই রয়ে যায়, সরল ব্যক্তি, নির্ধারিত ব্যক্তি, এবং প্রদত্ত। কিন্তু সেই বায়োলজিক বা জৈব সম্পর্কের নিচে, জৈবসামাজিক এবং আন্তঃব্যক্তিগত, আরেকটি স্তর থাকে যার আমরা নাম দিতে পারি আড়ব্যক্তিগত স্তর। এই স্তরটিতেই থাকে আভ্যন্তরীন গোষ্ঠীগুলো। এক সত্যিকারের গোষ্ঠীগত ব্যক্তিকরণ।

আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্ক ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে যায়। সে ব্যক্তিকে ভেদ করতে পারে না। আড়ব্যক্তিগত কার্যকলাপ এইভাবে কাজ করে — যেন ব্যক্তিরা থাকে একসাথে, যেমন থাকে একটি ব্যবস্থায় উপাদানগুলো এবং যা বহন করে সম্ভবনা এবং অধিস্থিতি, আশঙ্কা এবং চাপ, তারপর একটি কাঠামো আবিষ্কার করে, এবং একটি কার্যকরী সংগঠন যা সংহত করে এবং সমাধা করে এই দেহে অন্তর্লীন সমস্যায়নের। আড়ব্যক্তিগত ব্যক্তির মধ্যে ঢুকে পড়ে এক ব্যক্তি থেকে আরেকটি ব্যক্তিতে যাবার মতো করে। ব্যক্তিগত স্বকীয়তাগুলো সমাবেশ তৈরি করে সামুহিকতা দিয়ে। সংযোজনের মাধ্যমে নয় বা বিশেষ কোনো সাংগঠনিকতার মাধ্যমে নয়, যেমন বায়োলজিক সংহতি গোষ্ঠী। এবং শ্রমবিভাজন; শ্রমবিভাজন আবদ্ধ করে বায়োলজিক্যাল ঐক্যকে, যেমন ব্যক্তিরা তাদের প্রায়োগিক কার্যকলাপের মধ্যে। আড়ব্যক্তি ব্যক্তিদের স্থানিয়করণ করেনা : সে

তাদের সমাপতন ঘটায়। সে ব্যক্তিদের সাথে চিহ্নায়নগুলির কথোপকথন তৈরি করে : এ হল তথ্যের সম্পর্ক যা আদিম, সংহতির সম্পর্ক নয়। কার্যকলাপের ভেদ নয়।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৯১ (৩–৪১), পৃ ১৯২ (৩–৮)

বায়োলজিক ব্যক্তিকরণ মানুষের কাছে এবং হয়ত পশুদেরও কাছে সমস্ত চাপগুলি সমাধান করতে পারে না : সে সমস্যায়নটিকে রেখে দেয় ফের বাহ্যতাবর্জিত, লীন হিসেবে। অর্থাৎ জীবন যা কিনা আত্মাকে বহন করে। সে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না অধিকার হিসেবে, কারণ 'জীবন' হল এক প্রাথমিক ব্যক্তিকরণ। কিন্তু এই প্রাথমিক ব্যক্তিকরণ ফুরিয়ে ফেলতে পারে না এবং অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারে না সমস্ত বলগুলিকে। সবকিছু সমাধান করে না। আমাদের গতি থাকে বহুদূর যাবার মতো সবসময়। মালেব্রঞ্চ বলেছিলেন বাস্তবতঃ আমাদের টানাটানিগুলি আছে। অন্য কিছু হওয়ার সম্ভবনাগুলি আছে, আর একটা ব্যক্তিকরণ শুরু করার যা প্রথমটিকে ধ্বংস করে না। এই বল জীবন্ত নয়। এ প্রাক–জীবন্ত। জীবন হল একটা নির্দিষ্টতা, একটা প্রাথমিক সমাধান, নিজের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ, কিন্তু অবশেষ রেখে দেয় নিজের ব্যবস্থায়। তা জীবনের মতো নয় যা মানুষ বহন করে নিজের সঙ্গে যা দিয়ে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিকরণ করে, বরং তা এমন যা ধারন করে নিজের মধ্যে প্রাক–ব্যক্তি এবং প্রাক–জীবনকে। এই বাস্তবতাকে হয়ত নাম দেওয়া যায় আড়ব্যক্তিগত। তার জন্ম সামাজিকেও নয়, ব্যক্তিগততেও নয়। সে ব্যক্তিতে ন্যস্ত হয়। তার দ্বারা বাহিত হয়। কিন্তু সে তার মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে না। এবং তাকে তার ব্যক্তি নামক অস্তিত্বের ব্যবস্থাটি দিয়ে বলা যায় না। আমাদের কিছুতেই বলা উচিত না সেগুলিকে ব্যক্তির ঝোঁক যেগুলি সে গোষ্ঠীতে বহন করে। কারণ এই ঝোঁকগুলি ঠিকভাবে বললে ব্যক্তি হিসেবে ব্যক্তির ঝোঁক নয়। সেগুলি হল ব্যক্তির প্রাক–ব্যক্তি অসমাধিতগুলি যেগুলি ব্যক্তি হওয়ার প্রক্রিয়ায় সমাধিত হয়নি।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৯২ (২৫–৪১), পৃ ১৯৩ (১–১০)

মনোসামাজিক হল আড়ব্যক্তি–র। এই হল বাস্তবতা যা ব্যক্তি অস্তিত্ব নিজের সঙ্গে বহন করে, ভবিষ্যৎ ব্যক্তিকরণগুলির জন্য। এটাকে আমরা বলতে পারি না জীবন্ত ব্যক্তিকরণ। এটা ঠিক জীবন্ত ব্যক্তিকরণের ধারাবাহিকতা নয়, যা, জীবন, যা কিনা এক প্রাথমিক ব্যক্তিকরণ, তার সম্প্রসারণ নয়। প্রাক–ব্যক্তি বাস্তবতা বহন করে মানুষ অন্য কোথাও মুখোমুখিও হয় অন্যকিছু দায় এর যা কাঠামো এবং কার্যকলাপ হিসেবে উঠে আসা যা ওই মুহুর্তে সৃষ্টি হয়, যা আন্তঃ–ব্যক্তিগত নয়। কারণ, এটা বহন করে নিয়ে আসে একটি নতুন ব্যক্তিকরণ যা ধরে নেয়

প্রাচীনকে এবং চাপা–পড়াকে, একটি গোষ্ঠীতে বহু ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ঠ করে, যা জন্মগ্রহণ করল। আমরা এইভাবে বলতে পারি আধ্যাত্মিকতা হল পরিধির, ব্যক্তির সাপেক্ষে, যতটা না কেন্দ্রীয়। এবং সে হয়ত একটা সচেতন বাক্যালাপ করতে পারে না। কিন্তু অস্তিত্বের একটা তালমিল এবং সাধারণ কাঠামো তৈরি করে। ব্যক্তি কেবল ব্যক্তি নয়, তা কিন্তু অস্তিত্বের আকর যা এখনও দিশায়িত নয়, প্রতিষ্ঠিত নয়, অপেক্ষারত। আড়ব্যক্তি থাকে ব্যক্তির সঙ্গে, কিন্তু ব্যক্তিকৃত ব্যক্তির সঙ্গে নয়। সে থাকে ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের সূত্র ধরে যা আপাতদৃষ্টিতে সহজাত অথবা বাহ্যিক–এর চেয়েও আদিম। তাই সাম্ভাব্য সংযোগ হয় ব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে যাকে আত্মা বলে তার সাথে। সে আড়ব্যক্তিকে খুবই ব্যক্তিগতকৃত এবং খুবই বিশেষকৃত করে।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৯৩ (১৬–৪১)

আধ্যাত্মিকতা অন্তর্লীনতা এবং তুরীয়তার অপসরণ আড়ব্যক্তির নিজের মধ্যে অপসৃত হয় না। কেবল ব্যক্তিকৃত ব্যক্তির সাপেক্ষে তা প্রযোজ্য।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৯৪ (৪–৭)

আড়ব্যক্তি এবং ব্যক্তিকৃত — অস্তিত্বের একই দশা নয়; অস্তিত্বের দুই দশার সহবাস আছে, যেমন জল কেলাসের মধ্যে থাকে। তাই জন্য গোষ্ঠীকে মনে হতে পারে পরিপার্শ্ব। গোষ্ঠীর ব্যক্তিত্ব তৈরি হয় প্রাক–ব্যক্তিগত বাস্তবতার ভিত্তির ওপর যা বাহিত হয় কাঠামোয়ায়নের পর, একটা দিক ব্যক্তি, আর একটা দিক হলো ওই ব্যক্তিদিকের পরিপূরক। গোষ্ঠী ধারন করে আত্মার এক রূপক এবং শরীরের এক রূপক, ব্যক্তির।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৯৫ (১৩–২২)

সমষ্টি হল একটি ব্যক্তিকরণ যা প্রকৃতিগুলিকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করে যেগুলি বহু ব্যক্তিরা বহন করছে। কিন্তু ব্যক্তিত্বগুলিকে ধারন করে না যেগুলি ব্যক্তিগুলির মধ্যে গঠিত হয়ে গেছে। সেই কারণে সমষ্টির চিহ্নায়ন আভ্যন্তরীন ব্যক্তির জন্য একই সাথে তুরীয় এবং অন্তর্লীন। সে গোষ্ঠীর নয়া ব্যক্তিত্বের সমসাময়িক, সেখানে ব্যক্তি অংশ নেয় তার আবিষ্কৃত চিহ্নায়ন জুড়ে, অর্থাৎ তার প্রকৃতি জুড়ে। কিন্তু এই প্রকৃতি তার ব্যক্তিত্বের ঠিকঠাক প্রকৃতি নয়; এ হল সেই প্রকৃতি যা সংশ্লিষ্ঠ তার ব্যক্তি অস্তিত্বে। এ হল তার আদিম ও মূল দশাটির পুনরাবির্ভাব, দ্বিতীয়বারের জন্য। এবং এই পুনরাবির্ভাব এক তৃতীয় দশার দিকে ঝোঁক–কে বোঝায়, যা হলো সমষ্টি। সমষ্টি হল প্রকৃতিগুলির এক ব্যক্তিকরণ এবং ব্যক্তিকৃত অস্তিত্বগুলির সঙ্গে জুড়ে। এই "Apeiron" *(গ্রীক দার্শনিক অ্যানাক্সিম্যান্দ্র–র অস্তিত্ব যা অসীম, অনির্দিষ্ট, অনির্ধারিত, কিন্তু যা দিয়ে*

সবকিছু অস্তিত্বশীল তৈরি — অনুবাদক) যা তার সঙ্গে আসে, অস্তিত্ব যা নিছক আর ব্যক্তি অস্তিত্ব নয়। সে এখন ব্যক্তি অস্তিত্ব এবং প্রকৃতির সমষ্টি। এই পুনরাবির্ভূত প্রকৃতির দ্বারাই সংলাপ চলে দুনিয়ার সাথে এবং অন্য ব্যক্তি–অস্তিত্বের সাথে, চিহ্নায়নগুলিকে আবিষ্কার করার মধ্যমে, সেগুলি পূর্বের বা পরের তা না জেনেই। এই চিহ্নায়নগুলির আবিষ্কার ঘটনা–পরবর্তী, কারণ, সেখানে থাকতে হবে একটা ব্যক্তিকরণের কার্যক্রম যার জন্য তারা দেখা দেয় এবং ব্যক্তিকৃত অস্তিত্ব একা একা পুরো ব্যক্তিকরণ করতে পারে না।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৯৭ (৭–৪১)

বিষয়ীত্ব এবং চিহ্নায়ন; চিহ্নায়নের আড়ব্যক্তি চরিত্র

বিষয়ী হল একটি সমাবেশ, যা ব্যক্তিকৃত ব্যক্তি এবং “Apeiron” *দিয়ে তৈরি যা সে বহন করে নিজের সাথে। বিষয়ী ব্যক্তির চেয়ে বেশি কিছু। সে ব্যক্তি এবং প্রকৃতি। সে একসাথে অস্তিত্বের দুটি দশা।*

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৯৯ (১৭–১৯)

আড়ব্যক্তি অস্তিত্বের দুই প্রাথমিক দশার সংশ্লেষে নয়। কারণ এই সংশ্লেষ তাকে বিষয়ী হিসেবে থাকতে দেয় না, যেহেতু অস্তিত্ব সেখানে খুবই সংশ্লেষিক।

কিন্তু তা তার চিহ্নায়ন, কারণ অস্তিত্বের দুই দশার মধ্যে যে ফারাক তা বিষয়ীর মধ্যে বয়ে যায় এবং আড়ব্যক্তির গঠনের মধ্যে ঢাকা পড়ে যায়।

এজন্যই একদমই অপর্যাপ্ত এটা বলা যে ভাষার সাহায্যে মানুষ চিহ্নায়নগুলি আওতায় পায়। যদি ভাষার দৌলতে চিহ্নায়ন না হয়, তা তাহলে ভাষা নয়। ভাষা চিহ্নায়ন তৈরি করে না। ভাষা কেবল যা বিষয়ীর মধ্যে বহন করে একটা তথ্য যে, চিহ্নায়িত হতে গেলে, ওই “Apeiron” *এর সাথে মোলাকাতের প্রয়োজন যা কিনা ব্যক্তিত্বের সাথে যুক্ত, যা বিষয়ী–তে সংজ্ঞাত। ভাষা হল প্রকাশের হাতিয়ার, তথ্যের বাহন, কিন্তু চিহ্নায়নের সৃষ্টিকর্তা নয়। চিহ্নায়ন হল অস্তিত্ব সাপেক্ষ, একটা শুদ্ধ প্রকাশ নয়। চিহ্নায়ন হল সাম্পর্কিক, সমষ্টিগত, আড়ব্যক্তিগত, এবং তা প্রকাশ এবং বিষয়ীর মোলাকাতের মাধ্যমে হয়ত আসেনি। আমরা বলতে পারি চিহ্নায়ন থেকে তথ্য, কিন্তু তথ্য থেকে চিহ্নায়ন নয়। মনোশারীরিক কিছু কাঠামো এবং গতিশীলতা আছে, যা*

ব্যক্তিকৃত ও প্রাকৃতিকের মধ্যে মধ্যস্থতা তৈরি করে। প্রাকৃতিক অর্থাৎ প্রাক-ব্যক্তি দশা। যেমন, যৌনতা। আমরা বলতে পারি একভাবে, ব্যক্তির কাছে, যৌন অস্তিত্ব হল, ব্যক্তিকরণ থেকে সরে আসা।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ১৯৯ (৩৭-৪১), পৃ ২০০ (১-২১)

যৌনতাকে হয়ত বিবেচনা করা যায় প্রাকব্যক্তি প্রকৃতির মনোশারীরিক অন্তর্লীনতা হিসেবে, ব্যক্তিকৃত অস্তিত্বের মধ্যে। যৌনতা হল প্রকৃতি এবং ব্যক্তিকরণের মিশ্রন। সে হল এক অনিশ্চিতে ব্যক্তিকরণ, যা থেমে আছে মৌলিক সমষ্টির, দম্পতির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ দ্বৈততার অসামঞ্জস নির্ধারনের মধ্যে। সেই কারণেই, যৌনতা হয়ত সমষ্টির সূচনা, সমষ্টি ছেড়ে যাওয়া থেকে পিছিয়ে আসা, সমষ্টির প্রতি অনুপ্রেরণা ও উসকানি, কিন্তু নিজে সমষ্টি নয়। সে আধ্যাত্মিকতাও নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার উসকানি।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ২০১ (৩১-৪১), পৃ ২০২ (১-২)

কিছু প্রাক-ব্যক্তি বাস্তবতা যা বিষয়ীকে পথ দেখায় ইতিবাচক পছন্দের দিকে : পছন্দ বাস্তবে কিন্তু কেবল তা নয় যা বিষয়ীর মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যক্তিকৃত। পছন্দ ধরে নেয় ব্যক্তিকরণকে অব্যক্তিকৃত প্রকৃতির একটি অংশ বলে, কারণ পছন্দ হল অস্তিত্বের এক সম্পর্কের আবিষ্কার যার দ্বারা বিষয়ী নিজেকে গঠন করে একটা সমষ্টিগত ঐক্য হিসেবে।

পছন্দ এমন কিছু নয় যা কিনা আধিপত্যকারী বিষয়ীর দ্বারা নিরপেক্ষ বিষয়কে হঠানো, বরং ব্যক্তিকরণ, যা হস্তক্ষেপ করে একটা ঝুঁকে থাকা, প্রাক-ব্যক্তি, এবং দুই বা ততোধিক বিষয়ী নিয়ে তৈরি সমাবেশ-এ। পছন্দ হল সমষ্টির আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা। এর আছে স্ব-গঠিত মূল্য। প্রাক-ব্যক্তিগত প্রকৃতির বহু মানুষের জন্য পছন্দ আসে। পছন্দ কেবল বিষয়ীর নয়। পছন্দ হল বিষয়ীর সাথে অন্য বিষয়ীদের কাঠামোয়ায়ন। বিষয়ী হল পছন্দের পরিপার্শ্ব এবং একইসাথে পছন্দের কারক-ও। অস্তিত্ববাদ অনুসারে, সমস্ত সত্যিকারের পছন্দ হল ব্যতিহারী বা পারস্পরিক এবং ধরে নেয় একটা ব্যক্তিকরণের প্রক্রিয়া যা এতটাই ব্যাপক যে তা সচেতনতার একটা আলাপের চেয়ে বা আন্তঃবিষয়ীগত সম্পর্কের চেয়ে বড়। পছন্দ হল সমষ্টিগত প্রক্রিয়া। গোষ্ঠীর ভিত্তি, আড়ব্যক্তিগত সক্রিয়তা।

বিষয়ী, ব্যক্তির চেয়েও বেশি করে, যে এই পছন্দের মধ্যে নিহিত থাকে। পছন্দ কাজ করে বিষয়ীদের স্তরে। এবং সমষ্টি তৈরি হয় যে ব্যক্তিদের নিয়ে, তাদের মধ্যে। পছন্দ হল অস্তিত্বের পরাকাষ্ঠা। সে কেবল সহজ সম্পর্ক নয়। সে খোঁজ ধরে আসে, যদি সে প্রাক-ব্যক্তি অবস্থাগুলিতে না থাকে, যেগুলি নানা ধরনের প্রকৃতি যারা বিষয়ীদের

দ্বারা বাহিত হয়। "Apeiron" বা অস্তিত্ব হয়ত অনির্দিষ্ট কেবল ব্যক্তিকৃত অস্তিত্বের সাপেক্ষে : অনির্দিষ্ট–র বিচিত্র দিক হয়তবা, তা প্রকাশ করবে তাকে যাকে সমষ্টি জন্ম দিতে পারেনি, যে দিকটা আনা হয়নি এবং যে চাপ–টা আনা হয়নি, সমস্ত দিকের মধ্যে স্থিতাবস্থার অন্য সম্ভবনাগুলির সাথে সাথে। আমরা সংজ্ঞাত করতে পারি শ্রেণীগুলিকে আগেভাগেই, সাম্ভাব্য চিহ্নায়নগুলির মধ্যে, সম্ভবনার বর্গগুলির মধ্যে, থিতু প্রাক–সম্পর্কিক ভিত্তিগুলির মধ্যে। একটি গবেষণার জন্য, অভাব ধারনার।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ২০৩ (২৭–৪১), পৃ ২০৪ (১–২৭)

বিষয়ী এবং ব্যক্তি

সেই গবেষণায় ফেরার জন্য, আংশিক বা কল্পিত, এক খুব জটিল বাস্তবতা–কে বিকৃতভাবে ব্যক্তি নাম দিয়ে চালানো হয়, যা পূর্ণাঙ্গ বিষয়ীর বাস্তবতা, যা নিজের সঙ্গে বহন করে, ব্যক্তিকৃত বাস্তবতার চেয়েও বেশি, অব্যক্তিকৃত একটি দিক, যা প্রাক–ব্যক্তি, অথবা যা এখনো প্রাকৃতিক। এই ব্যক্তিকৃত বাস্তবতার দায় ফিরিয়ে আনে ব্যক্তিকরণের ক্ষমতা যা, একা বিষয়ীর মধ্যে, ঢুকে থাকতে পারে না, অস্তিত্বের শুদ্ধতা দ্বারা, একা একা, ব্যবস্থাগত সমাবেশের অভাবের দ্বারা। অন্যের সঙ্গে সমাবেশে, বিষয়ী হয়ত পরোক্ষ সম্পর্কে রঙ্গমঞ্চ এবং নট — দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকরণের, যা জন্ম দেয় আড়ব্যক্তিগত সমষ্টির এবং বিষয়ীকে অন্য বিষয়ীদের সাথে সংশ্লিষ্ঠ করে। সমষ্টি প্রকৃতি নয়। কিন্তু তা ধরে নেয় এক প্রকৃতির অস্তিত্বকে আগে থেকেই, যা বিষয়ীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ, যাদের মধ্যে সামুহিক নিজেকে স্থাপিত করে তাদের পুনরাবিষ্কারের মাধ্যমে। সেগুলো সত্যি সত্যি ব্যক্তি হিসেবে নেই, যে অস্তিত্বগুলো একে অন্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ সামুহিকের মধ্যে। কিন্তু তারা বিষয়ী হিসেবে আছে, অর্থাৎ, অস্তিত্ব হিসেবে যারা ধারন করছে প্রাক–ব্যক্তি।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ২০৪ (২৫–৩৭), পৃ ২০৫ (১–৬)

সামুহিক ব্যক্তির পরিপার্শ্ব নয়, বরং অংশগ্রহণের এক সমাবেশ যার মধ্যে সে ঢোকে তার দ্বিতীয় ব্যক্তিকরণের মাধ্যমে যা হল কি না পছন্দ, এবং যে নিজেকে প্রকাশ করে আড়ব্যক্তিগত বাস্তবতার রূপের নিচ দিয়ে। বিষয়ী অস্তিত্ব নিজেকে ধারনা করে একটি ব্যবস্থা হিসেবে যা কমবেশি ঠিকঠাক সংগতিপূর্ণ, অস্তিত্বের তিনটি পরপর দশার সঙ্গে : প্রাক–ব্যক্তি, ব্যক্তিকৃত, এবং আড়ব্যক্তিগত। যা আংশিকভাবে মেলে, কিন্তু পুরোপুরি না, নিম্নলিখিত ছাঁদাগুলির সঙ্গে — প্রকৃতি, ব্যক্তি,

আধ্যাত্মিকতা। বিষয়ী দশা অস্তিত্বের বিষয় দশার বিপরীত দশা নয়। বরং অস্তিত্বের তিনটি দশার ব্যবস্থায়ীত ও ঘনীভূত ঐক্য।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ২০৫ (২১–৩২)

জাগতিক এবং তুরীয়

... ব্যক্তি পুরো মানুষটা নয়। কারণ ব্যক্তি হল একটি প্রাথমিক ব্যক্তিকরণের ফল; অস্তিত্বের এক প্রাক-ব্যক্তি জ্ঞান প্রয়োজনীয়।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ২০৬ (২–৫)

ব্যক্তির সামুহিক স্বকীয়তা হল যা চিহ্নায়নকে নিতে পারে অন্য সামুহিক স্বকীয়তাগুলির সাপেক্ষে একই মুহূর্তে, পারস্পরিক কার্যকারণের এর খেলার মাধ্যমে। পারস্পরিকতা, আভ্যন্তরীন অনুনাদ হল সমষ্টির আবাহনের শর্ত। সমষ্টি হল যা দ্বিতীয় ব্যক্তিকরণের জন্ম দেয়, জীবন্ত ব্যক্তিকরণের সাপেক্ষে, জীবন্তের মধ্যে প্রাথমিক ব্যক্তিকরণের ছেড়ে যাওয়া আকারহীন প্রকৃতি যা বেকার পড়েছিল, তাকে নিয়ে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিকরণ প্রথমটিকে পুরোটা উদ্ধার করতে পারে না। সমষ্টি থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি মরে ব্যক্তি হিসেবেই। এবং সমষ্টিতে অংশগ্রহণ তাকে সেই মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে না, যা প্রাথমিক ব্যক্তিকরণের ফল। দ্বিতীয় ব্যক্তিকরণ, যা সমষ্টিগত এবং আধ্যাত্মিক, জন্ম দেয় আড়ব্যক্তিগত চিহ্নায়নগুলির, যা ব্যক্তির সাথে মরে না, যা জুড়ে থাকে সেগুলির গঠনে। বিষয়ী অস্তিত্বের প্রকৃতির মধ্যে প্রাক-ব্যক্তিগত টিঁকে যেতে পারে ব্যক্তির চিহ্নায়নের রূপের মধ্যে যা জীবন্ত ছিল। এক ভাবে non omnis moriar *হল সত্য, কিন্তু তাকে প্রভাবিত করতে হবে একটি সূচকের এই বিচার-কে যাকে বানিয়েছে স্বকীয়তা, প্রাথমিক ব্যক্তিত্বে। যেহেতু সে আর ব্যক্তি নয়, সে বিষয়ী যা নিজেই টিঁকে যায়। বিষয়ীর সংশ্লিষ্ঠ প্রকৃতির দায় হল, সমষ্টিতে সংহত চিহ্নায়ন হয়ে উঠে, বিষয়ীর মধ্যে ধারিত ব্যক্তি হিসেবে কোনো না কোনোভাবে টিঁকে যাওয়া। ব্যক্তির একমাত্র সুযোগ, এবং বিষয়ীরও, কোনোভাবে টিঁকে যাওয়ার, তা হল চিহ্নায়ন হয়ে ওঠা, এমন কিছু কিছু ঘটানো যাতে সেগুলোর মাধ্যমে চিহ্নায়ন হয়ে ওঠা যায়।*

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ২০৬ (৩৫–৪১), পৃ ২০৭ (১–২৫)

সামুহিক ব্যক্তিকরণে অংশগ্রহণ করে বিষয়ী নিজের কিছু সেখানে ঢোকায় (যা ব্যক্তিত্ব নয়), যা কিনা নিজের চেয়ে অনেক থিতু বাস্তবতা।

এই সংশ্লিষ্ঠ চরিত্রের জন্য তার সংযোগ থাকে অস্তিত্বের সঙ্গে। এই যোগাযোগই তথ্য।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ২০৭ (৩০–৩৪)

আড়ব্যক্তির কেন্দ্রীয় কার্যকলাপের জায়গা: আবেগের তত্ত্ব

ব্যক্তিকরণের কার্যকলাপ খুবই সাধারণ ঘটনা এবং খুবই বড়ো, রূপের এক সহজ খাঁচার তুলনায়। ... হাইলোমর্ফিক প্রণালী সাথে বাহিত হয় যে আবছা ক্ষেত্রটি তা ছায়া বিস্তার করে ওই প্রণালী জুড়ে থাকা সমগ্র জ্ঞাত বাস্তবতার ওপর। হাইলোমর্ফিক প্রণালী বিকৃতভাবে প্রতিস্থাপিত করে এক বাস্তবের জননের অবগতি। সে অস্তিত্বজননের অবগতিকে আটকে দেয়।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ২০৮ (১৬–২১)

আড়প্রসারী বলতে যে চিন্তাকে আমরা নাম দিই, তার বিবেচনা এমন নয় যে, একটা অস্তিত্বের একত্ব জ্ঞাপিত হয় এমন রূপ দিয়ে যা জ্ঞাপন করে একটি পদার্থ; বরং তা জ্ঞাপিত হয় ব্যক্তিকরণের কার্যকলাপের একটা নির্দিষ্ট প্রণালী দিয়ে যা অস্তিত্বকে স্থাপন করে পরম হিসেবে। অস্তিত্বের এই সংসক্তি যা ঘটায় অস্তিত্বের একত্ব, তা মোটেই একটা রূপ বা একটা পদার্থের সাপেক্ষে নয়।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ২০৯ (৩৪–৪০)

অস্তিত্ব হল সম্পর্ক, কারণ সম্পর্ক হল অস্তিত্বের নিজের সাপেক্ষে আভ্যন্তরীন অনুনাদ, সেই কায়দা যেখানে সে নিজেকে নিজের আভ্যন্তরীন–এ পারস্পরিকভাবে অবস্থান করায়, একের মধ্যে দ্বিগুণায়িতভাবে এবং পাল্টাপাল্টিভাবে। আমরা বুঝতে পারি অস্তিত্বের একত্ব কেবল ব্যক্তিকরণের থেকে, যা পরম অস্তিত্বজনন। অস্তিত্ব হল এক, কারণ সে হল নিজেরই চিহ্ন, নিজেরই মতো, এবং নিজের মধ্যেই প্রতিধ্বনিত হয়। সম্পর্ককে কখনোই ধারনা করা যেতে পারে না আগে থেকেই থাকা কিছু জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক হিসেবে, বরং তাকে ধারনা করা যায় তথ্যের আদানপ্রদানের একটি পারস্পরিক প্রণালী হিসেবে এবং একটি ব্যবস্থার মধ্যের একটি কার্যকারণ হিসেবে যে ব্যবস্থা নিজে ব্যক্তিকরণ করছে। সম্পর্ক থাকে ভৌতভাবে, বায়োলজিকভাবে, মনোজাগতিকভাবে, সামুহিকভাবে — যেন সে ব্যক্তিকৃত অস্তিত্বের আভ্যন্তরীন অনুনাদ। সম্পর্কটি প্রকাশ করে ব্যক্তিকরণ, এবং সে থাকে অস্তিত্বের কেন্দ্রে।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ২১০ (২–১৬)

আবেগ ব্যক্তির কাছে অবোধ্য, কারণ সে খুঁজে পায় না তার শেকড় ব্যক্তির ব্যক্তি হিসেবে কাঠামো এবং কাজের মধ্যে।

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ২১২ (৬–৯)

আবেগ সামাজিকের ব্যক্তির ওপর ক্রিয়া নয়। ... আবেগ হল সম্ভবনা যা নিজেকে আবিষ্কার করে চিহ্নায়ন হিসেবে সামুহিক ব্যক্তিকরণে নিজের কাঠাময়ায়নের মধ্যে। সে অসম্পূর্ণ এবং অনর্জিত যতক্ষন না সে সম্পন্ন হচ্ছে সামুহিকের ব্যক্তিকরণ হিসেবে। ...

আবেগের প্রয়োজনীয় মুহুর্ত হলো সামুহিকের ব্যক্তিকরণ। সেই মুহুর্তের আগে বা পরে সত্যিকারের এবং পূর্ণাঙ্গ আবেগ পাওয়া যাবে না। ...

আবেগ আবার প্রচ্ছন্ন সামাজিকতা অথবা বেসুরো ব্যক্তিতাও নয়। সে হল যাতে ব্যক্তিকৃত অস্তিত্ব লুকিয়ে রাখে তার সাম্ভাব্য অংশগ্রহণ, অন্য সব ব্যক্তিকরণগুলোতে, যা বিষয়ীর মধ্যে থাকে প্রাকব্যক্তিগত বাস্তবতা হিসেবে। ...

এই আড়ব্যক্তিগত বাস্তবতার সাপেক্ষেই শুদ্ধ সামাজিক এবং শুদ্ধ ব্যক্তিগত থাকে, আড়ব্যক্তির দুই চরম দিক হিসেবে। এরা একে অন্যের অপর নয় যেমন ব্যক্তিগত এবং সামাজিক একে অন্যের বিরোধালঙ্কার। ...

সিমন্দঁ (২০০৭), পৃ ২১৩

প্রবন্ধ : ন্যায়বিচারের রাজনীতি

শমীক সরকার, ডিসেম্বর, ২০১৭, গুরুচণ্ডালী ওয়েবসাইটে প্রকাশিত

১) সর্বমঙ্গলের রাজনীতি

একটা সময় ছিল, যখন রাজনীতি ছিল মহান ব্যাপার। রাজনীতি করা মানে যাকে বলে দেশের কাজ করা। বড়োলোক বাড়ির অনেকগুলো ছেলের মধ্যে একজন দেশের কাজে যাবে। দেশের দারিদ্র্য, অসাম্য দূর করার কাজে ব্রতী হবে। রাজনীতি মানে ছিল, যাদের নিজেদের জীবনে কোনো বিগ্রহ নেই, অর্থাৎ ফর্সা, পুরুষ, সম্পত্তিবান, উঁচুজাত, সুশিক্ষিত ইত্যাদিদের দেশের মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, শ্রমিক ভারতবাসী, কৃষক ভারতবাসী, হাভাতে ভারতবাসী, আদিবাসী ভারতবাসী, নারী ভারতবাসী ইত্যাদিদের উদ্ধার করার কাজে ব্রতী হওয়া। সেই কাজের বাম–দক্ষিণ ছিল।

একই পরিবারের এক ভাই কংগ্রেস তো আরেক ভাই সিপিআই। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসও ছিল। দেশোদ্ধারের কাজে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হওয়ার মধ্যে গৌরব ছিল।

সরাসরি রাজনীতিতে না থেকেও এই দেশোদ্ধারের কাজ করা যেত। যেমন করতেন মহাশ্বেতা দেবী। এবং তার মতো আরো অনেকে। মহাশ্বেতা লিটল ম্যাগাজিনে বের করতেন আদিবাসী গ্রামগুলোর কথা, দুর্দশার কথা। গল্প লিখতেন তাদের জীবনের। নিজের বাসনার রঙ দিয়ে রাঙিয়ে নিতেন তাদের চাওয়া পাওয়া। পাঠক ছিল অনাদিবাসীরা। কারা তারা? হ্যাঁ, তারাও দেশোদ্ধারের রাজনীতির লোক, অথবা পৃষ্ঠপোষক, অথবা তেমন কিছু হয়ে উঠতে চাওয়া। তাদের কাছে যাতে আদিবাসীদের সংলাপ পৌঁছনো যায়, তার জন্য সম্পূর্ণ এক ধরনের ভাষা আবিষ্কার করেছিলেন মহাশ্বেতা, তার চরিত্রদের মুখের আদিবাসী ভাষা। যা বোঝার জন্য জন্য আদিবাসী ভাষা জানার দরকার পড়ে না। কুমার রানা বারোমাস পত্রিকার বড়োদিন ২০১৫ সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'তাঁর বিরসা মুন্ডা, কোচি মুন্ডা, দোপদী মেঝেন একই ভাষায় কথা বলে – যে ভাষা তাঁর নিজের আবিষ্কার, যদিও ভূ–ভারতের কোনো লোকগোষ্ঠীতেই সে ভাষার প্রচলন নেই। আর যেহেতু তিনি আদিবাসী বিষয়ে শেষ কথা, অতএব, বঙ্গীয় সাংবাদিকও আদিবাসীদের উদ্ধৃত করেন, সেই ভাষাতেই, সুযোগ পেলেই লাগিয়ে দেন, 'মুরা হাঁড়িয়া খাই বটে ...!' এই আদিবাসী নিরক্ষরতা থেকেই লালগড়ে আন্দোলনের কারণ হিসাবে চালু হয়, 'আদিবাসীরা বড়ো গরিব, বেচারারা পিঁপড়ের ডিম খায়!' যাঁরা একথা বলেন, তাঁরা হয়ত জানেন না যে, পিঁপড়ের ডিম গোপীবল্লভপুর বা ঝাড়গ্রাম বাজারেই চারশো টাকা কিলো দরে বিক্রি হয়, পিঁপড়ের ডিম লোকে পেট ভরানোর জন্য নয়, খায় একটা বিশেষ পদ হিসাবে এবং তার ওষধি গুণের কারণে। অবশ্য দাম বাড়ার একটা কারণ বাব্য মৎস্য শিকারিরা – পিঁপড়ের ডিম ছিপ দিয়ে মাছ ধরার একটা উৎকৃষ্ট 'চার' হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে, শিয়ালদা বাজারেও বিক্রি হয়! আসলে খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে দারিদ্র্যকে গুলিয়ে ফেলাটা অজ্ঞতা নয়, এটাও ক্ষমতা সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। বাঙালি সাংস্কৃতিক আধিপত্যে ভাত–মাছটাই খাদ্য, অথবা প্রভু দেশ বা অন্য দেশ থেকে আসা খাবারগুলো সুখাদ্য, কিন্তু আমাদের গরিবদের খাবারগুলো অখাদ্য। ...'

দেশ সময় এদিক ওদিক করে আরেক খানা আইকনকে ধরা যাক। কমিউনিস্টদের মধ্যে এই সর্বমঙ্গলের রাজনীতিকে ছাপিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা ছিল। মার্ক্স বলে গেছিলেন, শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের মুক্তি নিজেরাই আনবে। বলেছিলেন, সকলের মুক্ত উন্নতির পূর্বশর্ত প্রত্যেকের মুক্ত উন্নতি।

এটা রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ। লেনিনদের ব্যাপারস্যাপারগুলো কি সাধারণভাবে সর্বমঙ্গলের রাজনীতির ফ্রেমওয়র্ক-কে অতিক্রম করতে পেরেছিল? না, চেষ্টা সত্ত্বেও পারেনি। মেয়েদের বিপ্লবী রাজনীতিতে অনীহা, বিপ্লবী রাজনীতির বিষয়ী হয়ে ওঠার ব্যাপারে অনীহা, এসবই লেনিন ধরতে পেরে গেছিলেন। কিন্তু তাদের নানা কসরৎ করে টেনে আনতে চেয়েও পারেননি। ক্লারা জেটকিনের লেখায় রয়েছে, ১৯২০ সালে লেনিন বলছেন, অঙ্গভঙ্গী করে, পার্টির মহিলা কর্মীদের উদ্দেশ্যে 'বাচালদের মতো ক্যাঁচরম্যাচর কোরো না, চিৎকার করে এবং পরিষ্কার করে বলো যেমনভাবে সংগ্রামীদের বলা উচিত'। ওই লেখায় আছে, লেনিন মেয়েদের সম্পর্কে বেশ কিছু খারাপ খারাপ কথা আর বেশ কিছু ভালো ভালো কথা বলেছেন। এবং শেষে মেয়েদের টানতে ব্যর্থ হয়ে কেমন যেন শপথের মতো করে বলেছেন, 'এবং তাই এতদিনকার ঘুমিয়ে থাকা মেয়েদের শেষমেশ গতিতে নিয়ে আসতেই হবে'।

আমরা কী দেখেছি? বাম দক্ষিণ রাজনীতি মিলিয়ে? পার্টি দেখেছি। আর পার্টির মতো গ্রুপ দেখেছি। তারা কী করে? তারা তাদের বারো দফা কর্মসূচীতে ঘোষণা করে দলিত, মহিলা, কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি সব্বার কর্মসূচী। পার্টির উইং থাকে। শ্রমিক উইং, নারী উইং, দলিত উইং, আদিবাসী উইং। ইত্যাদি। যাই হোক। কেউই স্বাধীন নয়। সবাই পার্টির অস্তিত্ব, পার্টির বিকাশ, পার্টির মূল কর্মসূচীর (বিপ্লব, সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি) অধীন। আচ্ছা, তাহলে পার্টি বা গ্রুপ কাদের দিয়ে তৈরি? দেখলে দেখা যাবে, সেখানে যারা সংখ্যাগুরু তারা ওই সমস্ত আইডেনটিটির কেউ নয়, অথবা, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ – তারা ওই আইডেনটিটির হলেও ওই আইডেনটিটির উর্ধে। এরকমভাবেই পার্টি রাজনীতি একটা সাধারণ সার্বজনীন মঙ্গলের কিছু বিষয়ী তৈরি করত। যার মূল কথাটাই হলো, নিপীড়িতদের এমপাওয়ারমেন্ট বা ক্ষমতায়ন, কিন্তু তার বিষয়ী নিপীড়িতরা নয়। অন্য বিষয়ী আছে। যার নাম পার্টি। প্রচ্ছন্ন বিষয়ী রাষ্ট্র। আমার তো 'পার্টি অফ গভর্ননেন্স' কংগ্রেস পার্টিটাকে দেখলে সেরকমই মনে হয়। সিপিএম-এর একটা অংশে ক্লাস লাইন, নকশালদের কিছু কিছু অংশের মধ্যে মাস লাইন, কলকাতায় সুভাষ রায়দের স্বাধীন শ্রমিক ইউনিয়নের লাইন, আম্বেদকরবাদীদের দলিত লাইন, জাতিসত্ত্বার আন্দোলন, ফেমিনিস্ট আন্দোলন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সর্বমঙ্গলের রাজনীতিকে অতিক্রম করার চেষ্টা হয়েছে।

সর্বমঙ্গলের রাজনীতির মূল কথা – গ্রেটার কমন গুড। অর্থাৎ বৃহত্তর সাধারণ মঙ্গল। এই সাধারণ বা সার্বজনীন মঙ্গলের ধারণা বিংশ শতকেই

মুখ থুবড়ে পড়েছিল। বিশ্বায়ন আসার আগেই। রাষ্ট্র মোটামুটি নিজেকে এই সার্বজনীন মঙ্গলের আইডিওলজিক্যাল অ্যাপারেটাস বা রক্ষাকর্তা (এবং স্থিতিশীল) হিসেবে নিজেকে দাঁড় করিয়ে ফেলেছিল। মানবাধিকার ইত্যাদি সংবিধানে ঢুকিয়ে টুকিয়ে রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল সর্বোত্তম আইডিয়া, কিসের? এই গ্রেটার কমন গুডের। পার্টিগুলো রাষ্ট্রের সেই হয়ে ওঠাকে মদত করেছিল। একই সাথে তারা নিজেরাও কীভাবে ওই সার্বজনীন মঙ্গলের আইডিওলজির গতিশীল পার্টনার বা অংশীদার হয়ে উঠতে পারে, সেই ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ন হয়েছিল। এখনও হয়।

২) পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি

সর্বমঙ্গলের রাজনীতির বিষয়ী যারা, তারা ছিল সবরকমের ভালনারেবিলিটি বা বিগ্রহের ঊর্ধ্বে। যার ভালনারেবিলিটি বেশি সে কিছুতেই ওই রাজনীতিতে বেশিদিন টিঁকতে পারত না। উঁচুতে উঠতে পারত না। লজিকটা সেরকমই। যে অন্যদের জন্য করে। নিপীড়িতদের জন্য করে, তাদের কথা বলে।

পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির শুরুর কথা হলো এটার থেকে স্পষ্ট ফারাক টানা। পরিষ্কার করে বলা: অন্যের দাবি তোলা মানে রাজনৈতিক ভন্ডামো, মাতব্বরী। সর্বমঙ্গলের রাজনীতির পতন এবং পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির পরিব্যাপ্তির একটা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির বিষয়ী আর বিষয়ের মধ্যে ভেদ নেই। সেই পরিচয় বেশিরভাগ সময়ই হয়ত তৈরি করতে হচ্ছে। শ্রমিক কৃষক হিন্দু মুসলমান নারী পুরুষ ইত্যাদি, যা কিনা ছিল অন্যের চোখে (সর্বমঙ্গলের রাজনীতির বিষয়ীর চোখে) পরিচয়, তাকে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। করা হচ্ছে বিষয়ী হিসেবে। ফলে শ্রমিক কৃষক হিন্দু ইত্যাদির আগে যা যা করণীয় ছিল, এখন সেগুলোর বদলে নতুন করে করণীয়গুলোর পুনর্নির্মাণ হচ্ছে। কখনও অতীত খুঁড়ে জাগিয়ে তুলতে হচ্ছে। এই তৈরি করার মধ্যেই এই রাজনীতি সমসাময়িক। এই তৈরি করার মধ্যেই নতুন নতুন পরিচয় তৈরি করারও উপাদান আছে। এবং এই পরিচয় নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণের একমাত্র উপায় অন্যের সঙ্গে বিভেদরেখা টানা। আমি যে তুমি না, এইটা তৈরি করা। তবে আমি কে? এইটা একটু ঝাপসা রাখা। ইচ্ছে করেই। কারণ আমি যদি আমি কে তা খুব স্পষ্ট করে দি, তাহলে মুশকিল আছে। কেউ একটা আমাদের মধ্যে থেকেই বলে উঠবে, আমি তো ওরম না! ভাঙন ধরে যাবে! পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি মানেই কিন্তু পরস্পর বিরোধিতা। মানে মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপার আছে। একটা কথা চালু ছিল আগে, অল খাই কংগ্রেস আই। সেটা হবে না। অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে চলার ব্যাপারটা আর থাকছে না।

৩) জাস্টিস বা ন্যায়বিচারের রাজনীতি

জাস্টিস বা ন্যায়বিচারের রাজনীতির বিষয়ী কে? একজন জাজ। জাস্টিস রাজনীতি মানবাধিকার রাজনীতিকে তার নিজের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। মানবাধিকার রাজনীতির ভূমিকা আমরা আগে একটু আলোচনা করেছি। মানবাধিকার রাজনীতি কোনো স্বাধীন রাজনীতি নয়। সর্বমঙ্গলের রাজনীতির যে মাতব্বরী, যে গায়ে পড়া ভাব, তার কমপ্লিমেন্টারিটি বা পরিপূরক। জাস্টিস রাজনীতির একটা অবশ্যম্ভাবী পূর্বশর্ত আক্রমণ। অভিজিত নন্দী ফেসবুকে লিখেছিলেন, 'কখনো একটি মেয়ে, কোন পুরুষ দ্বারা আক্রান্ত হলে, তার পরিচয় হয়ে ওঠে সেটাই। সেই পরিচয়টা তখন তাকে ধারণ করে। মেয়েটি তার সবকিছুকেই সেই ছাঁচে ফেলতে বাধ্য হয় – অনেক সময় বাধ্য হচ্ছে না জেনেই। তার চারিপাশের পৃথিবীটা সম্বন্ধে তার ধারণা গড়ে উঠতে থাকে একটি আক্রান্ত মেয়ের প্রাসঙ্গিকতা থেকেই। যাবতীয় ব্যক্তিক ও সামাজিক প্রতিকূলতা এবং সহানুভূতিও তাকে সেদিকেই ঠেলে দেয়। একই ঘটনা ঘটে যখন একটি দলিত মানুষ বা একজন মুসলমান যদি আক্রান্ত হয় কোন বর্ণহিন্দু দ্বারা। 'আক্রান্তের দর্শন' একটি অবশ্যম্ভাবী এবং বিপজ্জনক সম্ভাবনা আধুনিক পৃথিবীতে।' এইখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ হলো, কোনো একজন ব্যক্তি (বা দশজন ব্যক্তি) র 'আক্রান্ত' নামে একটা পরিচয় গড়ে ওঠা বা গড়ে তোলা এবং তার মধ্যে দিয়েযেন বা পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি হিসেবে জাস্টিস রাজনীতির অনুপ্রবেশ। কিন্তু এইবার আসল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা। আক্রান্ত কি রাজনীতির বিষয়ী? সে নিজেকে বিষয়ী মনে করলেও সে কি আদৌ বিষয়ী? নাকি এখানেও কোনো ছুপা বিষয়ী আছে? না, আক্রান্ত বিষয়ী না। কেন? কারণ সে তো স্বাধীন চরিত্রই না। সে আক্রমণ নামক একটি সম্পর্ক দিয়ে আক্রমণকারী কর্তৃক নির্ধারিত। এখানে ছুপা বিষয়ী একজন অদৃশ্য জাজ। জাস্টিস রাজনীতির সমস্ত কুশীলব যেন সেই মহামহিম সুপ্রিম জাজের ক্লোন। জাস্টিস রাজনীতিতে এই বিষয়ী আক্রান্তের নামে তার এজেন্সির নামে তাকে প্রতিস্থাপন করে। জাস্টিস রাজনীতির এই অদৃশ্য বিষয়ী – সুপ্রিম জাজ – এও তো রাষ্ট্র-ই।

এতক্ষণ তত্ত্ব কথা হলো। কিন্তু বাস্তবে যখন জাস্টিস আন্দোলন হয়, এবং তার মধ্যে যখন জাস্টিস পলিটিক্স একেবারে ভেতর থেকে খেলা করতে শুরু করে তখন কী হবে? যেমন, জি ডি বিড়লা স্কুলের ক্ষেত্রে। যৌনহিংসার শিকার বাচ্চাটির বাবা তার বক্তব্যে একবারের জন্যও অভিযুক্ত দুই জন শিক্ষকের শাস্তি কী হতে পারে তাই নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি। বরং প্রমাণ লোপাটের চেষ্টার দায়ে দোষী করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু আশপাশ থেকে

এবং অনেক অনেক গার্জেনের মধ্যে থেকে আওয়াজ উঠছে ফাঁসির সাজা দেওয়া হোক, পিটিয়ে মেরে ফেলা হোক। একটা পিটিশনও ঘুরছে মার্কেটে। কিন্তু অন্য আওয়াজ কি নেই? আছে। আমার ধারণা বিস্তর আছে। জিডি বিড়লায় সারা রাত বিক্ষোভ করা এক অভিভাবক শিমু ফেসবুকে লিখেছে, I can read the future of this case.. two convicted will have to face the hardest consequences as an individual but the school authority will never be chased...It's Birla after all. The shameless inaction, ultimate lack of responsibility and a mammoth chain of negligence which were promoted by a school will turn to an individual crime.

দশ কথার এক কথা বলে দিয়েছেন শিমু: ব্যক্তিগতভাবে শাস্তি হবে। ব্যক্তিগতভাবে অপরাধী। ব্যক্তিগত অপরাধ। ব্যক্তিগত। জাস্টিস রাজনীতিতে ‘আক্রান্ত’ বা ‘আক্রমণকারী’–র পরিচয়করণ করা হয় বলে আমরা আগের প্যারাগ্রাফে বলেছি। পরিচয়করণ করা হয় কি? না। তার ব্যক্তিগতকরণ করা হয়। ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন করা হয়।

ওই ব্যক্তিগত আক্রমণকারী এবং ব্যক্তিগত আক্রান্তদের আমরা একটাভাবে সামাজিকীকরণ করতে পারি। এই সামাজিকীকরণ মানে নিখিলায়ন নয়। সামাজিকীকরণ মানে পরিচয়করণ বা সনাক্তকরণ অর্থাৎ আইডেনটিফিকেশন করতে পারি। সেটা করার সময় হয়ত এক জন একভাবে করবে। কেউ হয়ত বলবে বিড়লা, কেউ বলবে ইংলিশ মিডিয়াম, কেউ বলবে প্রাইভেট স্কুল, কেউ বলবে পুরুষ টিচার, কেউ এমনকি বলবে টিচার, কেউ এমনকি বলবে পুরুষ – এই আইডেনটিফিকেশন বা পরিচয়করণ নিয়ে তুল্যমূল্য তর্ক হবে। বাক বিতণ্ডা হবে। এমনকি জাত তুলে ধর্ম তুলে গালাগাল হবে। কিন্তু যেভাবেই করা হোক না কেন এই সামাজিকীকরণ, তাতে জাস্টিস পলিটিক্স যে দুর্বল হবেই, সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন ও তার নিক্ষেপ

সমস্যার কথা

আইডিয়ার দরকার পড়ে সমস্যার থেকে। সমস্যার উৎস হতে পারে কোনো ঘটনা, কোনো দুর্ঘটনা, কোনো আবেগ ..., সমস্যা বলতেই মনে হয় — ভৌতিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা, জৈবিক সমস্যা, বা গাণিতিক সমস্যা, মনোজাগতিক সমস্যা — কিন্তু এগুলো সবই সমাধানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। সমস্যা বোধটিই হল দ্বান্দ্বিক। দ্বান্দ্বিক মানে দ্বান্দ্বিক, চলতি কথায় আমরা যেমন বলি — ঝামেলা আছে, গণ্ডগোল আছে, 'সমস্যায়িত' কথাটির মানে হল — সমস্যাগুলি এবং তার পরিস্থিতি।

আইডিয়া স্বয়ম্ভু নয়। বাস্তব সমস্যার আনাচ কানাচ থেকে তার উদ্ভব হয়, বাস্তব সমস্যা থেকে বিযুক্ত করে আইডিয়াকেই সারবস্তু বানিয়ে ফেললে গোলানো শুরু হয়। তখন সমস্যা, — দ্বান্দ্বিক — সবকিছুকেই সারবস্তু হিসেবে প্রশ্ন করা শুরু হয়। দেল্যুজের পর্যবেক্ষণ, যখন সামগ্রিকভাবে দ্বান্দ্বিক-কে গুলিয়ে ফেলে ভাবা হয় যেন তা কী কেন ইত্যাদি পরিচয়পর্বের প্রশ্নগুলির উত্তরেই সীমাবদ্ধ, খুব খারাপ ফল ফলত শুরু করে তখন —

> *যেহেতু দ্বান্দ্বিক আর সমস্যার বিজ্ঞান থাকে না, এবং শেষমেশ গুলিয়ে ফেলা হয় নেতিবাচক-এর সরল গতিধারা দিয়ে, এবং স্ববিরোধ-এর সরল গতিধারা দিয়ে, তখন দার্শনিকেরা চাষের মাঠের কচি ছেলেটার মতো কথা বলতে শুরু করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই, হেগেল হলেন সেই দীর্ঘ ঐতিহ্যের শেষ বিন্দু যারা 'অমুক কী?' এই প্রশ্নকে খুব*

গুরুত্ব দিয়ে নিয়েছিলেন, এবং তাকে ব্যবহার করেছিলেন আইডিয়াকে সারবস্তু হিসেবে নির্ধারণ করার কাজে। কিন্তু তার মাধ্যমেই তারা সমস্যায়িতর চরিত্রকে নেতিবাচক দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে দিয়েছিলেন। এই হল দ্বান্দ্বিকের বিকৃতির ফল।

'অমুক কী?' এই প্রশ্নে আটকে না থেকে 'কতটা', 'কে', 'কোন কোন ক্ষেত্রে' প্রশ্নগুলি, যেগুলি উঠে আসে ঘটনা, দুর্ঘটনা, বহুতা থেকে, ফারাক থেকে — সারবস্তু বা সারবত্তা থেকে নয়, একত্ব থেকে নয়, তার বিপরীত থেকেও নয়।

প্রশ্নের এই ফারাক, সমস্যার এই তফাৎ প্রশ্নকেই প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। দেল্যুজ প্রশ্নের আলোচনা শুরু করেন প্রশ্নের অস্তিত্ববিদ্যাগত প্রশ্ন দিয়েই।

ভুলে গেলে চলবে না, আধুনিক চিন্তা এবং অস্তিত্ববিদ্যার নবজাগরণ কতটা প্রশ্ন-সমস্যা যৌগপ্রণালী-র ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই যৌগপ্রণালীকে জ্ঞানের উপস্থাপনায় একটি কাঁচা এবং বিষয়ীগত অভিব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয় না আর। যাতে অস্তিত্বটি নিজের হয়ে উঠতে পারে। ঠিকভাবে বললে এই কেবল একটি মুহুর্তেই, অস্তিত্ব প্রশ্ন ছাড়া উত্তর দেয়। প্রশ্নের উত্তর হিসেবে অস্তিত্ব মানে হারিয়ে যাওয়া বা হেরে যাওয়া। বিপরীতে, এর নিজেরই একটা আরম্ভ আছে যার সঙ্গেই আছে তার অবশ্যম্ভাবী উত্তর প্রশ্ন-সমস্যা যৌগপ্রণালী এবং সে উত্তর হতে পারে কেবল ওই আরম্ভকে রেখে দিয়ে, তাকে পুনরাবৃত্তি করে, এবং ধারাবাহিকভাবে তাকে নিরীক্ষা করে। প্রশ্নের এই অস্তিত্ববিদ্যাগত আরম্ভ-র যে ধারনা তা ইন্ধন দেয় কলা-কে এবং একইভাবে দার্শনিক চিন্তা-কেও। কলা-কার্য বিকশিত হয় কোনো ফাটলের চারপাশ ধরে বা তাকে ভিত্তি করে, যাকে সে কখনও পুরণ করতে পারেনা।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া এবং ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ১৯৫

অস্তিত্ববিদ্যাগত প্রশ্নগুলি কেন গুরুত্বপূর্ণ? কখনো কি মনে হয় না, এগুলো একঘেয়ে এবং বোকাবোকা ছেলেমানুষী প্রশ্ন? এই একঘেয়ে অস্তিত্ববিদ্যাগত প্রশ্নগুলিই বারবার আইডিয়াকে হাজির করে, যখন চিন্তা, বোধ, স্মৃতির জাগতিক অনুশীলনের বদলে তুরীয় অনুশীলন হয় এই প্রশ্নগুলিতে। যখন অচিন্ত্যনীয় ঠাঁই পায় চিন্তায়। যখন অবোধ্য ঠাঁই পায় বোধ-এ। যখন বিস্মৃত ঠাঁই পায় স্মৃতিতে।

জয়েস–এর সময় থেকেই, উপন্যাস একটি নতুন ভাষা পেয়েছে যার ধরন হল 'জিজ্ঞাসাবাদ' বা 'প্রশ্নাবলী' এবং তাতে থাকে সমস্যায়িত ঘটনাবলী এবং চরিত্রগুলি, তা নিড়য়ই এটা বলতে চায় না যে কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়। এটা অবশ্যই সন্দেহ–র একটা সাধারণীকৃত পদ্ধতি নয়, আধুনিক সন্দেহপরায়ণতার কোনো চিহ্নও নয়, বরং বিপরীতে, প্রশ্ন এবং সমস্যায়নকে একটা তুরীয় দিগন্ত হিসেবে আবিষ্কার, তাদের আবিষ্কার করা তুরীয় উপাদান হিসেবে যা 'আবশ্যিকভাবে' থাকে অস্তিত্বে, জিনিসে এবং ঘটনায়। এটা হল আইডিয়ার উপন্যাসীয়, নাটকীয়, সাঙ্গীতিক, বা দার্শনিক আবিষ্কার এবং একইসাথে বোধের, ছবি–স্মৃতির, এবং ভাষা ও চিন্তার তুরীয় অনুশীলন, যার মাধ্যমে এই প্রতিটি সক্ষমতা একে অন্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য নিয়ে যোগাযোগ করে, এবং (অ)স্তিত্বের ফারাকে উন্মুক্ত হয় নিজের ফারাককে বিষয় হিসেবে নিয়ে, বা নিজের ফারাকের প্রশ্নটাকে করার মাধ্যমে। সেখান থেকেই আসে সেই লেখার রূপ যা কেবল সেই প্রশ্নটা করে, 'লেখা কী?' বা সেই বোধটা, যা কেবল সেই প্রশ্নটা করে, 'বোধ করা মানে কী?' বা সেই চিন্তাটা যা জিজ্ঞাসা করে, 'চিন্তা করা মানে কী?' এগুলো জন্ম দেয় নতুন–পাওয়া সাধারণ বোধের সর্বোচ্চ একঘেয়েমি এবং সর্বোচ্চ দুর্বলতাগুলির, আইডিয়ার জিনিয়াসের অনুপস্থিতিতে। কিন্তু একইসাথে জন্ম দেয় সবচেয়ে ক্ষমতাশালী 'পুনরাবৃত্তি'র, প্যারা–বোধের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কারের যখন আইডিয়া তার সমস্ত হিংসা নিয়ে হাজির হয়।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া এবং ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ১৯৫

এইবার প্রশ্নের অস্তিত্ববিদ্যার সূত্রগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

একটু স্মরণ করি, প্রশ্নের অস্তিত্ববিদ্যার সূত্রগুলিকে। ১) উত্তর দিয়ে দিলে সেই উত্তরের মধ্যেই মিলিয়ে যাবে, জাগতিক জ্ঞানের এই নিয়তি, জ্ঞানের এই জাগতিক দশার মধ্যে না থেকে প্রশ্ন চুপ করিয়ে দেয় সমস্ত জাগতিক উত্তরগুলিকে যেগুলি তাকে চেপে দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে; যাতে সে বাধ্য করতে পারে সেই একটি উত্তরকে আসতে, যা সর্বদা প্রশ্নটিকে বজায় রেখে দিতে পারে : যেমন জব, যার জোরাজুরি একটা প্রাথমিক উত্তরের জন্য যা গুলিয়ে যায় প্রশ্নটার সঙ্গে (অদ্ভুততত্ত্বের প্রথম ক্ষমতা); ২)যখন থেকে প্রশ্নের ক্ষমতা খেলতে শুরু করায়, প্রশ্নকর্তাকে

এবং যা-কে প্রশ্ন করা হচ্ছে তাকেও — ততটাই —, এবং নিজেকেও প্রশ্নের মুখোমুখি করে : ইদিপাস এবং সে যেভাবে স্ফিংসের সাথে কখনোই শেষ হয় না (প্রহেলিকা-র দ্বিতীয় ক্ষমতা); ৩) যখন থেকে প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ (অ)স্তিত্বের উন্মোচন যা সংকোচনযোগ্য নয় প্রশ্নের বিষয় বা প্রশ্নকর্তায়, বরং যা এই দুটিকেই ঐক্যবদ্ধ করে নিজের ফারাকটি প্রকাশের মাধ্যমে : একটি আমি বা আমরা যা অনস্তিত্ব-ও নয়, নেতিবাচকের অস্তিত্বও নয়, বরং রওয়া বা অস্তিত্বকে যে প্রশ্ন করে (non-etant বা হেইডেগারের Dasein) : ইউলিসিস এবং তার উত্তরে 'কেউ নয়' (তৃতীয় ক্ষমতা, যা দার্শনিক দুর্গমাভিযানের)।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া এবং ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ১৯৫-১৯৬

অর্থাৎ প্রশ্নের অস্তিত্ববিদ্যা ত্রিবিধ : অদ্ভুতত্ব, প্রহেলিকা, দার্শনিক দুর্গমাভিযান। যদিও এই অস্তিত্ববিদ্যা সীমিত।

এই আধুনিক অস্তিত্ববিদ্যা যদিও অপর্যাপ্ত। এটা কখনও কখনও অনির্ধারিত-র ওপর কাজ করে প্রশ্নের বিষয়গত ক্ষমতা হিসেবে, কেবল একটা বিষয়ীগত শূণ্যতা বোঝানোর জন্য যা তারপর (অ)স্তিত্ব-র সঙ্গে জুতে যায়, অর্থাৎ পুনরাবৃত্তির শক্তিকে প্রতিস্থাপিত করে যা একবার বলা হয়েছে তার দারিদ্র্য দিয়ে অথবা নয়া সাধারণ বোধের বাঁধাগৎ দিয়ে। ...

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া এবং ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ১৯৬

দর্শনের ইতিহাসে প্রশ্ন এবং তার অন্তর্বস্তু হিসেবে সমস্যা খুবই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। চিন্তার গতিধারা সংক্রান্ত দর্শ্নের পর্যালোচনার মাধ্যমে।

দর্শনের ইতিহাসে চিন্তার গতিধারা : প্রকল্পিত থেকে তর্কাতীত

আমাদের অবশ্যই তদন্ত করে দেখতে হবে কীভাবে প্রশ্ন সমস্যায় বিকশিত হয় আইডিয়ার মধ্যে, কীভাবে চিন্তার মধ্যে সমস্যাগুলি আচ্ছাদিত হয় প্রশ্ন দিয়ে। এখানেও চিরাচরিত চিন্তার প্রতিকৃতি কে অবশ্যই ধাক্কা দিতে হবে আরেকটা প্রতিকৃতি দিয়ে, এই পরামর্শ দিয়েছিল সমসাময়িক অস্তিত্ববিদ্যার নবজাগরণ। প্লেটো থেকে উত্তর-কান্টিয়ান, দর্শন চিন্তার গতিধারাকে দেখিয়েছে একটা নির্দিষ্ট পথ হিসেবে, প্রকল্পিত থেকে তর্কাতীত-এ যাওয়ার। এমনকি কার্টেসিয়ান নড়াচড়ায় — সন্দেহ থেকে নিশ্চিত — তাও এই পথেরই একটি ভিন্নরূপ। আরেকটি পথ হল,

প্রকল্পিত আবশ্যকতা থেকে আধিবিদ্যাগত আবশ্যকতা, যা আছে On the Ultimate Origination of Things *এ। প্লেটোর মাধ্যমে দ্বন্দ্ব এভাবে সংজ্ঞাত হয়েই গেছিল : প্রকল্প থেকে সরে যাও, প্রকল্পকে ব্যবহার করো ঝাঁপ দেওয়ার জায়গা হিসেবে বা 'সমস্যা' হিসেবে একটা অ-প্রকল্পিত নীতিতে পৌঁছনোর জন্য যা নির্ধারণ করে একইসাথে সমস্যার সমাধান এবং প্রকল্পের সত্যতা। পারমেনিদ-এর সম্পূর্ণ কাঠামোটা এই থেকে আসে, শর্ত হল যখন আর সম্ভব নয় একটা পরিচয়পর্ব, একটা ডিগবাজি, একটা খেলা অথবা একটা আনুষ্ঠানিক অনুশীলন, যেগুলো করা হয়েছে সবসময় খুব সূক্ষ্মভাবে। কান্ট নিজে যতটা নিজেকে প্লেটোনিক ভাবেন তার চেয়েও বেশি প্লেটোনিক যখন তিনি 'শুদ্ধ যুক্তির সমালোচনা', যেখানে তিনি পুরোপুরি মেনে নিচ্ছে সাম্ভাব্য অভিজ্ঞতাগুলির প্রকল্পিত রূপ, সেখানে থেকে চলে যায় 'বাস্তব যুক্তির সমালোচনা'তে, যেখানে সমস্যার সাহায্যে তিনি আবিষ্কার করেন একটি বিভাগীয় নীতির শুদ্ধ প্রয়োজনীয়তা। উত্তর-কান্টিয়ান-রা আরো এককদম এগিয়ে, যখন তারা চায় প্রকল্পিত বিচারধারাকে সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত করতে মতবাদের বিচারধারায় 'সমালোচনা'কে বদল না করেই। তাই অন্যায্য হবে না যদি এইভাবে দর্শনের গতিপথকে সংক্ষেপে বলা যায়, প্লেটো থেকে ফিশটে বা হেগেল, দেকার্তে হয়ে — তা সে প্রারম্ভিক প্রকল্পগুলি বা শেষের তর্কাতীতগুলি যত বিচিত্রই হোক না কেন। এগুলির মধ্যে সাধারণ কিছু না কিছু আছেই : যেমন, একটি 'প্রকল্প'কে ছেড়ে যাওয়ার বিন্দুটি, বা সচেতনতার প্রস্তাবনা যা অনিড়য়তার গুণাঙ্ক দিয়ে প্রভাবিত (যেমন কার্টেসীয় সন্দেহ) এবং একটি নৈতিক তর্কাতীত-এ বা অনুজ্ঞায় বা বাধ্যতায় পৌঁছনোর বিন্দু (প্লেটোর এক-ঈশ্বর, কার্টেসিয় কগিটো-র ছলনাহীন ঈশ্বর, লেইবনিজ-এর সাম্ভাব্য সমস্ত দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ভালোর নীতি, কান্টের ক্যাটেগরিকাল অনুজ্ঞা, ফিশটের আত্ম হেগেলের 'বিজ্ঞান')। যদিও এই পদ্ধতি সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছয় চিন্তার বাস্তব গতিপথের, তা কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রতারণাও করে এবং বিকৃতও করে এই গতিপথকে : এই যৌথ প্রকল্পবাদ এবং নীতিবাদ, এই বিজ্ঞানবাদী প্রকল্পবাদ এবং এই যুক্তিবাদী নীতিবাদ, তৈরি করে এক অপরিচিত কিছুকে যা তাদের অনুমান।*

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া এবং ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ১৯৬–১৯৭

কিন্তু সমস্যা থেকে প্রশ্ন — চিন্তার এই গতিধারার মধ্যেই কি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো নেই, যা থেকে বলা যায় সিদ্ধান্ত কিন্তু ছায়া বিস্তার করেছে প্রশ্নতে?

চিন্তার গতিধারা : সমস্যায়িত থেকে প্রশ্ন

ধরা যাক আমরা বলছি, চিন্তার এই গতিধারা, তা প্রকল্প থেকে তর্কাতীত–এ নয়, বরং সমস্যায়িত থেকে প্রশ্ন–তে : প্রথমে ফারাকটিকে মনে হয় খুব অল্প। এতটাই অল্প যে তর্কাতীত যেন অবিচ্ছেদ্য একটা নৈতিক অনুজ্ঞা বা বাধ্যতা থেকে, প্রশ্নও অবিচ্ছেদ্য অনুজ্ঞা বা বাধ্যতা থেকে, যদিও অন্যভাবে। একটি ফাটল যদিও ফারাক গড়ে দেয় এই দুই সূত্রের। সমস্যার আত্তিকরণ এবং প্রকল্প হল আইডিয়া বা সমস্যার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, পরেরটির অন্যায় সংকোচন, সচেতনতার প্রকল্পে এবং জ্ঞানের উপস্থাপনায় : সমস্যায়িত হল প্রকল্পায়িত–র চেয়ে আলাদা ধরনের জিনিস। বিষয়ানুগ আর মতানুগ এক নয়। এই ফারাক–এ যেগুলো ব্যাপার সেগুলো হল — সম্পূর্ণ বিতরণ, সম্পূর্ণ নির্ধারণ, গন্তব্য এবং সক্ষমতার অনুশীলন, একটি সাধারণ মতবাদের মধ্যে। তার ওপর, তর্কাতীত মুহূর্ত এবং প্রশ্ন–মুহূর্ত সম্পর্কে বলতে গেলে খুব আলাদা কিছু নিয়ে বলতে হয়, যেহেতু এগুলোর মধ্যে আছে দুই ধরনের বাধ্যতা, যারা কোনোভাবেই পরস্পরের সঙ্গে তুলনীয় নয়। প্রশ্ন হল বাধ্যতা, অথবা বরং, প্রশ্নগুলো প্রকাশ করে সমস্যা এবং বাধ্যতার মধ্যে সম্পর্ককে, যা থেকে সে এগোতে থাকে। ... সমস্যা বা আইডিয়াগুলি আসে রহস্যময়তার বাধ্যতাগুলি থেকে, অথবা প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে যে ঘটনাবলী তৈরি হয় সেগুলি থেকে। সেজন্যই সমস্যাকে আলাদা করা যায় না সিদ্ধান্তের ক্ষমতা থেকে, যা আমাদের মধ্যে ঢুকলে আমরা আধা–ঈশ্বর অস্তিত্বে পরিণত হই। অঙ্কবিদরা কি নিজেদের ঈশ্বরের সন্তান বলে ঘোষণা করে না?

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া এবং ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ১৯৭

বাধ্যতামূলক প্রশ্ন

বরং এটাকে বলা যায় পাশাদুটির একটি নিক্ষেপ। গোটা আকাশটা একটা খোলা পরিসর এবং ছোঁড়াটাই কেবল নিয়ম। পাশাতে অনন্য বিন্দুগুলো আছে। পাশাগুলি হল নিজেরাই প্রশ্ন। অনুজ্ঞা বা বাধ্যতা হল ছোঁড়াটা। আইডিয়া হল ছোঁড়া থেকে প্রাপ্ত সমস্যাজনক জোড়। পাশার নিক্ষেপকে কোনোভাবেই বলা হচ্ছে না যে সুযোগের ধ্বংস (আকাশ–সুযোগ)। সুযোগ ধ্বংস করা মানে হল তাকে টুকরো টুকরো করা সাম্ভাব্যতার নিয়ম

মেনে, একাধিক নিক্ষেপে। এমনভাবেই এটা করা যাতে সমস্যাটি হার–জিত যোগ্য প্রকল্পগুলিতে পরিণত হয়ে যায়। এবং বাধ্যতাটি নৈতিকতায় পর্যবসিত হয় সবচেয়ে ভালো প্রকল্পটি পছন্দ করার নীতির মাধ্যমে যা বিজয় নির্ধারণ করে। বিপরীতে, পাশাদুটির নিক্ষেপ সুযোগকে তুলে ধরে প্রতিবার। প্রতিবার ছোঁড়া প্রতিবার সম্পূর্ণ সুযোগকে তুলে ধরে। নিক্ষেপের পুনরাবৃত্তি মানে একই প্রকল্পে পড়ে থাকা নয়, একটি ধ্রুব নিয়মের সাথে একত্বও নয়। সবচেয়ে কঠিন হল সুযোগকে তুলে ধরার একটি বিষয় বানানো। কিন্তু অনুজ্ঞা বা বাধ্যতার বোধ হল এটা এবং সেই প্রশ্নগুলি যা এ নিক্ষেপ করে। আইডিয়াগুলি উঠে আসে এটা থেকে ঠিক যেমন অনন্যকগুলি উঠে আসে ওই আকস্মিক বিন্দু থেকে যা প্রতিবার সুযোগের পুরোটাকে এক জায়গায় জড়ো করে এক বার নিক্ষেপের জন্য।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া এবং ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ১৯৮

আচ্ছা এভাবে কি খামখেয়ালিপনাকেই আস্কারা দেওয়া হচ্ছে না? যে যা খুশি প্রশ্ন করতে পারে, তাই না? নিক্ষেপবিন্দুটিই যদি বাধ্যতা হয়, তাহলে এই প্রশ্নটা ওঠা স্বাভাবিক।

বলা হবে যে আইডিয়ার বাধ্যতামূলক সূচনা হিসেবে এই বিন্দুটিকে সূচিত করে আমরা কেবল খামখেয়ালিপনাকে আহ্বান করছি, বাচ্চাদের খেলার মতো সরল খামখেয়ালিপনা, শিশু–ঈশ্বর। এটা যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে ‘তুলে ধরা’ কাকে বলে তা বুঝতে ভুল হচ্ছে। সুযোগ হল খামখেয়ালি, ততক্ষণই, যতক্ষণ তাকে তুলে ধরা না হচ্ছে বা যথেষ্ট পরিমাণে তুলে ধরা না হচ্ছে, যতক্ষণ তা একটি পরিসরে ছড়ানো, একটি সংখ্যা এবং কিছু নিয়মের মধ্যে যেগুলো বানানোই হয়েছে তুলে ধরাকে এড়ানোর জন্য। যখন সুযোগকে যথেষ্ট পরিমাণে তুলে ধরা হয়, তখন খেলোয়ার হারতে পারে না আর, কারণ প্রতিটি জোড় এবং প্রতিটি নিক্ষেপ যা তৈরি করে সুযোগটিকে সেগুলি স্বভাবগতভাবেই জায়গাটির এবং আকস্মিক বিন্দুটির চলমান নির্দেশে পর্যাপ্ত। এর অর্থ কী, এই গোটা সুযোগকে তুলে ধরা, প্রতিবার, একবার–এ? এই তুলে ধরা অনুষ্ঠিত হয় এমন এক মাত্রায় যাতে নিক্ষেপ থেকে উঠে আসা অসদৃশগুলি শুরু করে অনুরনিত হতে, অর্থাৎ এভাবে একটা সমস্যা তৈরি করতে। তখন গোটা সুযোগটাই প্রতিটি নিক্ষেপে থাকে, যদিও তা আংশিক, এবং একবার–এই তা থাকে, যদিও যে জোড়টা তৈরি হয় তা ক্রমে ক্রমে নির্ধারিত হওয়ার বিষয়। পাশার নিক্ষেপ নির্বাহ করে সমস্যার গণনা, ফারাকিকৃত

উপাদানগুলির নির্ধারণ বা অন্যান্য বিন্দুগুলির বিতরণ যারা মিলে তৈরি করে একটি কাঠামো। বাধ্যতাগুলি এবং সমস্যাগুলির মধ্যের চক্রাকার সম্পর্ক যা তাদের থেকে আসে, তা তৈরি হয় এইভাবে। প্রতিধ্বনি তৈরি করে এমন সমস্যার সত্যটা, যার মধ্যে বাধ্যতাকে পরীক্ষা করা হয়, যদিও সমস্যা নিজেই বাধ্যতা থেকে জন্ম নিয়েছে। একবার সুযোগ তুলে ধরলে, সমস্ত খামখেয়ালিপনা ধ্বংস হয়ে যায় প্রতিবার। একবার সুযোগ তুলে ধরলে, অপসরণ নিজেই তখন সমস্যার মধ্যেকার তুলে ধরার একটা বিষয়। ...

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া এবং ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ১৯৮

তুরীয় অনুশীলন

সমস্যার মধ্যে সমাধান কি সমস্যাকে ঈশ্বর বানাচ্ছে না?

সমস্যার অন্তরের মধ্যে এই সিদ্ধান্তের ক্ষমতা, এই সৃজন বা নিক্ষেপ যা আমাদের বানায় ঈশ্বরের সন্তান, তা কিন্তু কখনোই আমাদের নিজেদের নয়। ঈশ্বরেরা নিজেরা ওই আকাশ–সুযোগের বিষয়। যেসমস্ত বাধ্যতা এবং প্রশ্নগুলি দিয়ে আমরা জারিত, সেগুলো আমি থেকে আসে না : আমি এমনকি সেখানে নেইও শোনার জন্য। বাধ্যতাগুলি অস্তিত্বের, যখন প্রতিটি প্রশ্ন হল অস্তিত্ববিদ্যাগত এবং সে প্রশ্ন সমস্যাগুলির মধ্যে 'যা হল' টা বিতরণ করে। অস্তিত্ববিদ্যা হল পাশা ছোঁড়া, সেই ক্যাওসমস যা থেকে ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব। যদি অস্তিত্বের বাধ্যতাগুলির আমি–র সঙ্গে একটা সম্পর্ক থাকে, তা এই ভাঙা আমি–র সাথে যাকে, প্রতিবার, তারা ভাঙে এবং গড়ে সময়ের মাত্রার সঙ্গে। বাধ্যতাগুলি সত্যিই তৈরি করে শুদ্ধ চিন্তার কগিতান্দা, চিন্তার ফারাকিকারগুলি, একইসাথে যা চিন্তা করা যায় না, আবার যা চিন্তা করতেই হবে এবং কেবল চিন্তাতেই আসে শুধু তুরীয় অনুশীলনের দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রশ্নগুলি হল কগিতান্দার এই শুদ্ধ চিন্তা। প্রশ্নের রূপে বাধ্যতাগুলি তাই সূচিত করে আমাদের বৃহত্তম ক্ষমতাহীনতা, কিন্তু সেই দৃষ্টিকোণটাও যা মরিস ব্লাঁসো বলে যান, বলেই যান : ওই অন্ধ, মস্তকহীন, বাকশক্তিরহিত এবং আকস্মিক মূল বিন্দুটি যা বানায় 'চিন্তা করার অসম্ভবতা যা–ই হল চিন্তা', ঠিক এই বিন্দুতেই 'ক্ষমতাহীনতা' রূপান্তরিত হয় ক্ষমতায়, এই বিন্দুটি যা বিকশিত হয় কাজ–এ, সমস্যা রূপে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া এবং ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ১৯৯

তাহলে কোথায় এসে দাঁড়ানো গেল? সচেতনার বদলে অচেতনার ভিত্তিতে

ভাবে চিন্তা। ভাঙা আমি বিষয়ী। প্রসঙ্গতঃ কগিতো শব্দটার ব্যবহারের সাথে একটু পরিচিত হওয়া যাক। আমরা বাংলায় এই ল্যাটিন শব্দটাই রেখেছি। রেনে দেকার্তে–র বিখ্যাত শব্দবন্ধ হল 'দুবিতো, এরগো কগিতো, এরগো সাম' — যার মানে হল, 'আমি সন্দিগ্ধ হই, তখন আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি'। এই শব্দবন্ধ–কে এককথায় কগিতো বলে প্রকাশ করার রেওয়াজ আছে পাশ্চাত্য দর্শনে। অনেকসময় মূলতঃ 'আমি ভাবি' বা 'আমি চিন্তা করি' বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয় এই শব্দটি। কগিতান্দাম বা কগিতান্দা হল 'যা ভাবতে হবে' বা 'যা চিন্তা করতে হবে'।

> *কগিতো কে একটা সচেতনতার প্রস্তাবনা হিসেবে না ভেবে, বাধ্যতাগুলিকে ভাঙা আমির কাছে পাঠানো হয় চিন্তার অচেতনার কাছে পাঠানো হচ্ছে। কারণ আমি–র আছে এক অচেতনার অধিকারগুলি যা বাদ দিলে তা চিন্তা করে না, এবং বিশেষ করে শুদ্ধ কগিতান্দাকে চিন্তা করত না। সাদামাটা সচেতনতার প্রস্তাবনা দিয়ে যা বলা হয়, তার বিপরীতে, চিন্তা চিন্তা করে কেবল এক অচেতনার ভিত্তিতে, এবং সেই অচেতনাকে চিন্তা করে তুরীয় অনুশীলনে। ফলতঃ, আইডিয়াগুলি যেগুলি বাধ্যতা থেকে তৈরি হয় সেগুলি আমি–র ভাঙা অংশগুলি দিয়ে ঢোকে এবং বেরোয়, যার মানে দাঁড়ায় যে অন্য কেউ একটা আমার মধ্যে চিন্তা করে, অন্য কেউ যাকেও চিন্তা করতে হবেই। চিন্তায় চুরি হল প্রাথমিক। অবশ্যই ক্ষমতাহীনতা থেকে যেতে পারে ক্ষমতাহীনতায়, কিন্তু তাকে একাই তুলে নেওয়া যেতে পারে সর্বোচ্চ ক্ষমতায়। ঠিক এই কথাটাই নিৎশে বলেছিল ক্ষমতার সংকল্প–তে : বাধ্যতামূলক রূপান্তর যা খোদ ক্ষমতাহীনতাকে গ্রহণ করে বিষয় হিসেবে (বোকা, অলস, বা বাধ্য যদি তুমি হতে চাও, হও! কিন্তু এই শর্তে যে ...) — ওই পাশা নিক্ষেপ কিন্তু সক্ষম পূর্ণ সুযোগকে তুলে ধরতে, ওই প্রশ্নগুলি দিয়ে কিন্তু আমরা জারিত উষ্ণ বা হিম সময়গুলিতে, ওই বাধ্যতাগুলি আমাদের উৎসর্গ করে তাদের শুরু করা সমস্যাগুলিতে।*
>
> *দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া এবং ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ১৯৯–২০০*

প্রশ্নের সূচনা আছে কী? বা সূচনার প্রশ্ন ?

> *... কী হতাশাজনক মনে হয় এই উত্তর! আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আইডিয়ার উৎস কী এবং সমস্যা কোথা থেকে আসে : উত্তরে আমরা ডেকে আনলাম পাশার নিক্ষেপ, বাধ্যতার কথা এবং সুযোগের প্রশ্নগুলি,*

কোনো তর্কাতীত নীতির বদলে। একটা আকস্মিক বিন্দু যেখানে প্রতিটি জিনিস ভূমিচ্যুত হয়, জবরদস্ত এক ভূমি পাবার বদলে। আমরা এই সুযোগকে খামখেয়ালীপনার বিপরীতে কতটা তুলে ধরা হল তার ওপরে দাঁড় করাই, বাধ্যতামূলকভাবে তুলে ধরা, তুলে ধরা একটা নির্দিষ্ট কায়দার প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু আমরা পরিমাপ করি এই তুলে ধরাকেই সেই অনুরণন দিয়ে যা সমস্যায়িত উপাদানগুলির মধ্যে স্থাপিত হয়েছে, যেগুলি ওই পাশার নিক্ষেপের ফলাফল। কোন চক্রাবর্তে আমরা ঘুরে চলি যে আমরা কোনোভাবেই সূচনার কথা বলতে পারি না? আমরা পৃথক করি চারটি ব্যাপারকে : বাধ্যতামূলক বা অস্তিত্ববিদ্যাগত প্রশ্ন; দ্বন্দ্বমূলক সমস্যাগুলি বা বিষয়বস্তুগুলি যা উৎসারিত হয় সেগুলি থেকে; সমাধানযোগ্যতার চিহ্নায়িত ক্ষেত্র যেখানে এই সমস্যাগুলি 'বিজ্ঞানসম্মত ভাবে' প্রকাশিত হয় তাদের শর্তাবলীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে; যেসব সমাধান এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে দেওয়া হয় যখন সমস্যাগুলি যখন মূর্ত হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রের বাস্তবায়নে। কিন্তু কোন সেই ভয়ানক বাধ্যতাগুলি, কোন সেই প্রশ্নগুলি যেগুলি থাকে পৃথিবীর সূচনায়? ঘটনা হল, প্রতিটি জিনিসের শুরু একটি প্রশ্নে, কিন্তু বলতে পারা যায় না যে প্রশ্ন নিজেই শুরু করল। হতে পারে এই প্রশ্ন এবং যে বাধ্যতাকে তা প্রকাশ করে, তাদের অন্য কোনো সূচনা নেই পুনরাবৃত্তি ছাড়া। আমাদের সময়কার মহান লেখকরা (হাইডেগার, ব্লাসোঁ) এই প্রশ্ন এবং পুনরাবৃত্তির গভীরতম সম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। যদিও এটা পর্যাপ্ত নয়, তবু একটাই প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত থেকে যায় যা ছিল, যদিবা সেই প্রশ্নটি হয়, 'অস্তিত্ব কী?' পাশার খারাপ নিক্ষেপ যা খচিত থাকে প্রকল্পে (উপস্থাপিত করে সচেতনতার প্রস্তাবনা বা সাধারণ বোধ-এর মতগুলি) এবং একই অভিমুখে যা কমবেশি একইরকম তর্কাতীত নীতি (উপস্থাপিত করে জয়যুক্ত হবার মতো নিক্ষেপের প্রস্তাবনা)। খারাপ খেলোয়াড় তারা যারা পুনরাবৃত্তি করে কেবল সুযোগগুলিকে ভেঙে ভেঙে এবং তাকে অনেকগুলি নিক্ষেপের মধ্যে ভাগ করে। বিপরীতে, পাশার ভালো নিক্ষেপ তুলে ধরে একটি নিক্ষেপেই সমস্ত সুযোগকে, এবং এইখানেই আমরা খুঁজে পাই সেই সারবস্তু, যে, প্রশ্ন কাকে বলে। যদিও পাশার অনেকগুলি নিক্ষেপ আছে : পাশার নিক্ষেপ পুনরাবৃত্ত হয়। প্রতিটি নিক্ষেপই অবশ্য সমস্ত সুযোগকেই একবারে নেয়, এবং আলাদা বা আলাদা জোড় পাবার বদলে, একই থেকে বেরোলে ফলাফল একই হয় অথবা পুনরাবৃত্ত হয় আলাদা থেকে বেরোলে। ...

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া এবং ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ২০০

প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি

হাইডেগার দেখাচ্ছেন স্পষ্ট করে কেমন ভাবে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি নিজেই বিকাশ ঘটায় সমস্যা এবং পুনরাবৃত্তির মধ্যে সম্পর্কের : ***একটি মৌলিক সমস্যার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি আদিম সম্ভবনাগুলি যা লুকিয়ে ছিল এর মধ্যে তার উন্মোচন। এই সম্ভবনাগুলির বিকাশের ফলে সমস্যাটি রূপান্তরিত হয় এবং এইভাবে তাকে সংরক্ষিত করা হয় একটি সমস্যা হিসেবে। সমস্যাকে সংরক্ষণ করা মানে তার নিজস্ব ক্ষমতাকে মুক্ত করা ও বাঁচিয়ে রাখা, যা এর সারবস্তুর উৎস এবং যা একে সম্ভব করে সমস্যা হিসেবে থাকতে। সমস্যার সম্ভবনার পুনরাবৃত্তি তাই সমস্যা সম্পর্কিত যা 'চালু' তাকে সরলভাবে নেওয়া নয়। ... সম্ভাব্যকে এইভাবে বুঝলে বাস্তবে সমস্ত সত্যিকারের পুনরাবৃত্তিকে বাধা দেওয়া হয় এবং তার ফলে ইতিহাসের সাথে তার যাবতীয় সম্পর্ককে। ... (বিপরীতে, একটা ভালো ব্যাখ্যা অবশ্যই ঠিক করে দেয় যে) সম্ভাব্য-র বোঝাপড়া যা পরিচালনা করে সমস্ত পুনরাবৃত্তিকে তা কতদূর বিস্তারিত হতে পারে এবং তা কি সমান তার সাথে যা পুনরাবৃত্তির যোগ্য?***

একটি সমস্যার অন্তরের এই সম্ভবনাটি কী যা সচেতনতার সাম্ভাব্যতাগুলি বা প্রস্তাবনাগুলির বিপরীতে দাঁড়ায়, বর্তমানে গ্রাহ্য মতামতগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় যেগুলি প্রকল্পগুলিকে তৈরি করে? কিছুই না, আইডিয়ার বৈভব, তার নির্ধারণযোগ্য অলীকত্ব। এই বিন্দুতে হাইডেগার হল নিৎশেবাদী। পুনরাবৃত্তি কী তাহলে চিরন্তন ফেরায়, যদি না তা ক্ষমতার সংকল্প হয়, ক্ষমতার সংকল্পের দুনিয়া তার বাধ্যতাগুলিকে নিয়ে, তার পাশা নিক্ষেপ এবং এই নিক্ষেপগুলি থেকে যে সমস্যাগুলি জন্ম নেয়? চিরন্তন ফেরা-তে পুনরাবৃত্তি কখনোই ধারাবাহিকতা নয়, চলতেই থাকা বা টেনে লম্বা করা নয়, এমনকি কোনোকিছুর অধারাবাহিক ফেরাও নয় যা অন্ততঃ সক্ষম হবে লম্বিত হতে একটি আংশিক চক্রে (একটি সত্ত্বা, একটি আমি, একটি আত্ম), বরং বিপরীতে, প্রাক-ব্যক্তি অনন্যতাগুলি ফিরে পাওয়া, যাতে তাকে পুনরাবৃত্তির মধ্যে এনে দেলা যায়, তার জন্য ধরে নিতে হয় সমস্ত পুরনো সত্ত্বাগুলির দ্রবীভবন। প্রতিটি মূলবিন্দু হল একটি অনন্যতা এবং প্রতিটি অনন্যতা একটি আনুভূমিক রেখার যাত্রা শুরু, সেই রেখা আটপৌরে বিন্দুগুলি দিয়ে তৈরি যাদের ওপর তা প্রলম্বিত হয় অনেক পুনরুৎপাদন বা প্রতিরূপ দিয়ে যেগুলি তৈরি করে খোলা পুনরাবৃত্তির মুহুর্তগুলি। এটা আবার যদিও একটা উল্লম্ব রেখার ওপর-

ও পুনঃশুরুয়াৎ যা ঘনীভূত করে অনন্যতাগুলি এবং তার ওপর বোনা অন্য পুনরাবৃত্তি, সুযোগের তুলে ধরার রেখা। যদি 'হয়' হয় সর্বোপরি ফারাক এবং শুরুয়াৎ, তাহলে '(অ)স্তিত্ব' হল নিজেই পুনরাবৃত্তি, হয় – এর পুনঃশুরুয়াৎ। পুনরাবৃত্তি হল অবস্থার 'প্রদত্ত' যা অস্তিত্বের বাধ্যতার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে। এই হল মূলবিন্দুর ধারনার এই ধ্রুব দ্ব্যর্থতা এবং আমাদের আগের দৃষ্টিভ্রম কারণ : মূলবিন্দুগুলি সূচিত করা হয় কেবল এমন একটি দুনিয়ায় যা চ্যালেঞ্জ করে মূল–কে যতটা, ততটাই প্রতিরূপ–কে। এবং একটি মূলবিন্দু সূচিত করে একটি ভূমিকে কেবল এমন একটি দুনিয়ায় যা এরইমধ্যে থিতিয়ে পড়েছে সার্বজনীন ভূমিচ্যুতি–তে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া এবং ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ২০১–২০২

টিপ্পনি : উচ্চতর গণিত — সমস্যার নির্মাণ

শস, কোচবিহার থেকে প্রকাশিত একটি ম্যাগাজিনে প্রদত্ত, ২১ জুলাই ২০১৯

ধরা যাক, তুমি সান্দ্রতা বা ভিসকোসিটি মাপছ, ভিসকোমিটার যন্ত্র দিয়ে। সরষের তেল নিয়েছ। তার মধ্যে চিনি মেশাচ্ছ। মেশানোর আগে সান্দ্রতা মাপলে। তারপর ধরা যাক, সরষের তেলের ওজনের দশ শতাংশ চিনি সরষের তেলের মধ্যে দিয়ে মাপলে। তারপর বিশ শতাংশ দিয়ে মাপলে। মানে তুমি মিশ্রণগুলোর সান্দ্রতা মাপছ। তারপর তুমি ত্রিশ শতাংশ দিয়ে মাপলে। এইভাবে একশ' শতাংশ পর্যন্ত দিয়ে মাপলে। তোমার হাতে রইল এগারোটি পরিমাপ — ওই মিশ্রনের সান্দ্রতার।

এইবার তুমি চাইছ, এর থেকেও বেশি চিনি দিলে মিশ্রণটির সান্দ্রতা কত হবে, তা বের করতে। কিন্তু তোমার ভিসকোমিটার বা সান্দ্রতামাপক যন্ত্র এর চেয়ে বেশি আর দিতে পারছে না। ওই সান্দ্রতামাপক যন্ত্র যে পরিমাপের মধ্যে সান্দ্রতা মাপতে পারে — তার চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে সান্দ্রতা, যদি আরো বেশি চিনি দেওয়া হয়। জানোই তো, যেকোনো যন্ত্র যা পরিমাপ করে, তা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে করে, তার চেয়ে বেশি করতে পারে না। যেমন, ধরা যাক, তুমি মুদির দোকানের তুলাযন্ত্র বা দাঁড়িপাল্লা দিয়ে কয়েক কেজি চাল, আলু ইত্যাদি মাপতে পারো, কিন্তু এক বস্তা ধান মাপতে পারো কি? সেইরকম, সরষের তেলের মধ্যে একশ' শতাংশ ওজনের চেয়ে বেশি চিনি দিলে ওই সান্দ্রতামাপক যন্ত্রটি আর কোনো পরিমাপ দিতে পারছে না।

এবার কী করবে তুমি? ওই মাপগুলি তুমি একটা গ্রাফের মধ্যে নিলে।

গ্রাফের ভুজ বা অ্যাবসাইসা, অর্থাৎ এক্স অক্ষ বরাবর চিনির ওজন শতাংশ। আর কোটি বা অরডিনেট, অর্থাৎ ওয়াই অক্ষ বরাবর মিশ্রনের সান্দ্রতা ও শুধু সরষের তেলের সান্দ্রতার অনুপাত, মিশ্রণের আপেক্ষিক সান্দ্রতা। এবার ওই গ্রাফে তুমি ওই পরিমাপ বিন্দুগুলি বসালে। তারপর সেই পরিমাপ বিন্দুগুলিকে যোগ করার চেষ্টা করলে পেনসিল দিয়ে একটা রেখা টেনে। তোমার ভাবনা হল, ওই রেখাটাকে আরেকটু বাড়িয়ে নিলেই আরো বেশি চিনি দিলে, ধরা যাক একশ–ত্রিশ শতাংশ ওজনে কত হবে সান্দ্রতা, তা তুমি পেয়ে যাবে। কিন্তু তা করতে গিয়ে পড়লে সমস্যায়। দেখলে রেখাটি এত আকাবাঁকা হয়েছে এর আগেই, যে কীভাবে এগোবে তা ভাবতে ভরসা পাচ্ছ না (নিচের ছবি দেখো)। তখন কী উপায়?

এইখানে তোমাকে যার শরণাপন্ন হতে হবে, সেটা হল উচ্চতর গণিত। আরো ভালো করে বললে, কলনবিদ্যার। খুব চেনা জায়গা থেকে শুরু করা যাক। ধরে নেওয়া যাক, ওজন শতাংশের তিলমাত্র ফারাকে মিশ্রণের আপেক্ষিক সান্দ্রতার যে ফারাক হয়, তা হল ধ্রুবক এবং তার মান আমরা জানি না, ধরে নিচ্ছি 'ক'। এবার আমরা এটাকে অন্তর্কলনের পরিভাষায় লিখব। তোমরা যারা অন্তর্কলন শিখেছ, তারা সহজেই লিখতে পারবে। ডি ওয়াই বাই ডি এক্স = ক। ডি এক্স হল ওজন শতাংশের তিলমাত্র ফারাক। ডি ওয়াই হল মিশ্রণের আপেক্ষিক সান্দ্রতার ফারাক। ধরো, এটাকে আমরা বললাম, এক নম্বর ফারাকিকার বা ডিফারেনশিয়াল। এবার এটাকে আমরা যদি সমাকলন করি, তাহলে যারা শিখেছ তারাই বলতে পারবে, আমরা একটা ফাংশান বা ক্রিয়া পাব — তা হল, একটি সরল রেখা (নিচের ছবি দেখো)। এর নতি, অর্থাৎ, ধরে নেওয়া ধ্রুবক 'ক' এর মান আমরা জানতে পারব, এবং একইসাথে আরেকটি ধ্রুবক–এর, যাকে তোমরা সমাকলন ধ্রুবক বলে শিখেছো। কীভাবে? যদি আমরা চিনির ওজন শতাংশ শূণ্য অর্থাৎ চিনি ছাড়া শুধু সরষের তেল–এর সান্দ্রতা এবং চিনির ওজন শতাংশ দশ–এ সান্দ্রতার পরিমাপ–দুটির সাহায্য নিই। তারপর ওই ক্রিয়াতে ভুজের একটি মানের জন্য কোটির কত মান হবে তা খুব সহজে বের করে ফেলা যায় এবং তা করে করে আমরা ওপরে বর্ণিত সরলরেখাটি পেলাম।

কিন্তু, উঁহু, এই সরলরেখা ওই পরিমাপবিন্দুগুলির খুব কাছাকাছি দিয়ে যাচ্ছে না গ্রাফে। ফলতঃ আমাদের আরেকটি ফারাকিকার দরকার। ধরে নেওয়া যাক, ওজনের শতাংশের তিলমাত্র ফারাকে মিশ্রণের আপেক্ষিক সান্দ্রতার যে ফারাক হয়, তা হল ওজনের শতাংশ–এর একটি গুণিতক। সেই গুণিতকটি অজানা একটি ধ্রুবক, ধরা যাক 'ক'। এটাও আমরা অন্তর্কলনের পরিভাষায় সহজেই লিখে ফেলতে পারি। ডি ওয়াই বাই ডি এক্স = এক্স ইনটু ক। ধরো, এটাকে আমরা বললাম, দুই নম্বর

ফারাকিকার বা ডিফারেনশিয়াল। এটা সমাকলন করলে আমরা পাবো একটা প্যারাবোলা বা অধিবৃত্ত। তা হল ফাংশান বা ক্রিয়া। অনেকে বলে, সম্পর্ক বা রিলেশন। অনেকে বলে লোকাস বা গতিবিধি। সেই অধিবৃত্তের ধ্রুবকগুলিকেও আমরা পরিমাপবিন্দুগুলির সাহায্যে বের করলাম। কিন্তু এতেও, মানে এই অধিবৃত্তেও মন সন্তুষ্ট হলো না, গ্রাফে পরিমাপবিন্দুগুলির বেশ দূর দূর দিয়েই যাচ্ছে দেখছি। অতএব? আরেকটি ফারাকিকার, তিন নম্বর এটা, আবার কী! ধরা যাক, ওজনের তিলমাত্র ফারাকে মিশ্রণের আপেক্ষিক সান্দ্রতার যে ফারাক হয়, তা হল মিশ্রণের আপেক্ষিক সান্দ্রতার ব্যতিহারিক বা রেসিপরোকালের একটি গুণিতক, এবং সেই গুণিতকটি অজানা একটি ধ্রুবক, ধরা যাক, 'ক'। অর্থাৎ, ডি ওয়াই বাই ডি এক্স = ক বাই ওয়াই। দেখা গেল, এটাও একটা অধিবৃত্ত, কিন্তু এর ভুজাক্ষ আলাদা হবার কারণে উত্তল, আগেরটার মতো অবতল নয় (সঙ্গের ছবি দেখো)। যদি এটাতেও মন না ভরে, তাহলে আরেকটি ফারাকিকার নেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, সেটা হল — ওজনের শতাংশের তিলমাত্র ফারাকে মিশ্রণের আপেক্ষিক সান্দ্রতার যে ফারাক হয়, তা হল ওজনের শতাংশের ব্যতিহারিক–এর একটি গুণিতক। অথবা, আরো একটা ফারাকিকার নেওয়া যেতে পারে — ওজনের শতাংশের তিলমাত্র ফারাকে মিশ্রণের আপেক্ষিক সান্দ্রতার যে ফারাক হয়, তা হল ওজনের শতাংশের ব্যতিহারিকের একটি ধ্রুব মাত্রার একটি গুণিতক। এই ফারাকিকারগুলিকে আর অন্তর্কলনের পরিভাষায় লিখলাম না বা সমাকলন করলাম না, গ্রাফেও দিলাম না। অহেতুক জটিলতা বাড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

প্রসঙ্গতঃ প্রথম যে ফারাকিকরণ–টির কথা বলা হল — সেটির উদ্গাতা স্বয়ং অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। মিশ্রণের সান্দ্রতা নিয়ে তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম ব্যক্তি যিনি একটি ক্রিয়া বা ফাংশান উপস্থিত করেছিলেন, সম্ভবতঃ ১৯০৬ সালে। যে ছবিটা আমি দিয়েছি, তাতে সরষের তেল ও চিনির যে মিশ্রণের কথা বলা আছে এবং যে পরিমাপবিন্দুগুলি দেখানো আছে, তা সম্পূর্ণতঃ আমার মস্তিষ্কপ্রসূত, বাস্তবের সাথে তার সম্পর্ক আছে কি না আমার জানা নেই। কোনোদিন মাপিনি বা মাপ দেখিনি। যাক গে, যা বলছিলাম। মিশ্রণের সান্দ্রতাকে প্রথম সমস্যায়িত করেছিলেন আইনস্টাইন। তরলের সঙ্গে কঠিনের মিশ্রণ যে তরলের চরিত্র বদল করে তা জানাই ছিল। ধারনা ছিল, সেই চরিত্র বদল ম্যাজিকাল কিছু তরল তৈরি করে। আজব কিছু। আইনস্টাইন তরল–কঠিন মিশ্রণের সান্দ্রতাকে সমস্যায়িত করে তরল–কঠিন মিশ্রণের আজবত্ব ঘুঁচিয়ে দিয়েছিলেন। তার প্রহেলিকার পর্দা খুলে দিয়েছিলেন। পরে দেখা যায়, ভিন্ন ফারাকিকরণ দরকার। কারণ সব ধরনের

তরল–কঠিন মিশ্রণকে এই ক্রিয়া বা সমাধান–সূত্র ঠিকমতো বর্ণনা করতে পারছে না। ফলতঃ ওপরে বর্ণিত প্রায় সবকটি ফারাকিকিরণকে ব্যবহার করা হয়েছে তরল–কঠিন মিশ্রণকে সমস্যায়িত করতে। এবং করা হয়ে চলেছে।

******

ওপরের অনুচ্ছেদে একদম শেষের দিকে আমরা দুটি শব্দ এনে ফেললাম। সমস্যায়ন। সমাধান–সূত্র। হ্যাঁ, কোনো একটি ভৌতিক প্রপঞ্চ বা ফিজিক্যাল ফেনোমেনোন–কে সমস্যায়িত করতে হয়। না হলে তা আজব, প্রহেলিকা, ম্যাজিক্যাল বা ধোঁয়াটে থাকে। ভূতুড়ে বলে মনে হয়। তা দেখে মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। দৈব কিছু বলে মনে হওয়াও আশ্চর্যের কিছু নয়।

সব ধর্ম দৈবে বিশ্বাস করে না। যেমন বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্মের যিনি প্রচারক, নেপালের সেই ব্যক্তি দেড় হাজার বছর আগে বলেছিলেন, জগতে সমস্যা আছে। সমস্যার সমাধান আছে। ঠিক এরকম বলেছিলেন কি না বলতে পারব না। তবে আমি এরকমই বুঝেছি। তা সমস্যা কী? সমস্যা কি খারাপ? না। সমস্যা ভালো জিনিস। সমস্যা তৈরি করতে পারা যাচ্ছে মানে প্রপঞ্চের ধোঁয়াটে ভাবটা কাটানো যাচ্ছে। সমস্যা দেখে ভড়কে যাবার কিছু নেই।

গণিতের ভূমিকা হল এই সমস্যায়নে। পাটিগণিতের সাহায্যেও সমস্যায়ন করা যায়। যেমন, কেশবচন্দ্র নাগের বইতে আমরা বহু বহু সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি। চৌবাচ্চায় ফুটো আছে। জল বেরিয়ে যাচ্ছে। জল ঢাললেও জল বেরিয়ে যাচ্ছে। ফুটো বন্ধ করা যাচ্ছে না। এবার মাথা খারাপ না করে ঠিক কত বালতি এক্সট্রা জল ঢাললে চৌবাচ্চা ভর্তি হবে, তা খোঁজা যাক। সরল ঐকিক নিয়মই বোধ হয় পাটিগণিত তথা গণিতের সবচেয়ে সহজ সমস্যায়ন। একটা টিয়া তিনটি লঙ্কা খায়। পনেরোটি লঙ্কা শেষ করতে ক'টা টিয়া লাগে? এখন ভাবতে অস্বস্তি হয় না, কিন্তু যদি ভাবো, তোমরা যখন পাটিগণিত শেখোনি, তখন যদি তোমাদের এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা যেত? ধরা যাক, প্রপঞ্চটি হল, উঠোনে লঙ্কা মেলা আছে। টিয়ার ঝাঁক আছে কাছের বাগানে। সেখান থেকে টিয়াগুলো আসছে। এসে লঙ্কা খেয়ে যাচ্ছে। একে সমস্যায়িত করা হল। সমস্যায়িত না করলে কী দাঁড়াত? বা, কী থাকত? এক ঝাঁক টিয়া এসে উঠোনে মেলা লঙ্কা খেয়ে চলে গেল। এই তো হল প্রপঞ্চ। এবার ধরা যাক, তুমি টিয়া তাড়াতে চাও না। তোমার নীতিকর্তব্যে বাধে। তাহলে কি তুমি উঠোনে লঙ্কা মেলবে না? শুকোতে

দেবে না? না। দেবে। লঙ্কা কিছু কমবে। টিয়া খেয়ে যাবে। কত কমবে লঙ্কা? তোমার যদি হিসেব থাকে, তাহলে তুমি লঙ্কা শুকোতে দিলে কী পরিমাণ ড্যামেজ হবে তোমার, তা হিসেব করতে পারবে। সেটা তুমি আগেই ধরে নেবে, যে ওইটুকু যাবে। তোমার নীতিকর্তব্যও থাকল। বিষয়চিন্তাও থাকল।

পাটিগণিতের মতো জ্যামিতিও সমস্যায়ন করে। কিন্তু পাটিগণিত বা জ্যামিতির তুলনায় অনেক ভালো সমস্যায়ন করে বীজগণিত। এবং তার থেকেও ভালো করতে পারে কলনবিদ্যা। কলনবিদ্যায় সমস্যায়ন নিয়েই আমরা আগে আলোচনা করলাম। কলনবিদ্যায় সমস্যায়নের মৌলিক উপাদান হল ফারাকিকরণ। একটি জিনিসের সামান্য, তিলমাত্র ফারাকে অন্য একটি জিনিসের কতটা ফারাক হয়? অনেক সময়, অন্য একটি জিনিসের কতটা ফারাক হয় — এই প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ থাকে না। কোনো জিনিসের সামান্য, তিলমাত্র ফারাক মানে কী, সেটাই অন্তর্কলনের ভাষায় লিখে ফেললেই হয়। যেমন ধরা যাক, একটি জলের পাইপ একটা জায়গায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেই দেওয়ালকে বোঝাতে আমি লিখলাম, ওখানে জলের গতিবেগের তিলমাত্র ফারাক হল শূণ্য। এইরকম। কলনবিদ্যাকে সমস্যায়নের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার ভাবলে বলতে হয়, ফারাক হল সমস্যায়নের মৌলিক উপাদান। সমস্যার গভীরে আছে ফারাক। গণিতের মানুষদের ফারাক বলতেই ডিফারেনশিয়ালের কথা মনে পড়বে। আচ্ছা এই গণিতের ফারাক কি ফারাক কথাটা স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে যে দ্যোতনা বহন করে, তার থেকে আলাদা কিছু? একেবারেই না। তোমার আর আমার ফারাক আছে। তুমি আর আমি আলাদা। আমরা নিজের নিজের মতো, স্বতন্ত্র। এই দ্যোতনাগুলির সঙ্গে গণিতের ফারাকের কোনো অমিল নেই, পৃথকত্ব নেই। প্রপঞ্চ ভৌতিক হোক বা সামাজিক, এই কথাটা তাই সেক্ষেত্রেও খাটবে — সমস্যার গভীরে আছে ফারাক। আর কে না জানে, এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আলাদা, সমস্ত কিছু আলাদা আলাদা, নিজের মতো। তাই সামাজিক সমস্যারও গভীরে আছে এই সামাজিক ফারাক। অতএব গণিতের শিক্ষা থেকে আমাদের আরেকটি জিনিস বোঝা হয়ে গেল — সামাজিক সমস্যা খারাপ কিছু নয়। সামাজিক সমস্যা বরং ভালো। সমাজে প্রতিটি মানুষ আলাদা আলাদা ধরনের, এটা তো একটা বাস্তব ব্যাপার। গভীরের সেই সামাজিক ফারাক-কে উপরিস্তরে আনলে, ফারাকগুলিকে সম্পর্কিত বা সমীকৃত করলে, মোট কথা হল সামাজিক প্রপঞ্চকে অন্তর্কলন বা ফারাকিকরণ করলে আমরা যেটা পাই — সেটাই সামাজিক সমস্যার রূপ।

উপরের অনুচ্ছেদে আরেকটি শব্দও আমরা পেলাম। সমাধান-সূত্র। এই

সমাধান–সূত্রকে আমরা আগে ক্রিয়া বা ফাংশান বলেও উল্লেখ করেছি। ফারাকিকারের সমীকরণের সমাকলনে পাওয়া যায় এই সমাধান–সূত্র। আর স্থানীয় সমাকলনে পাওয়া যায় সমাধান। স্থানীয় মানে কী? স্থানীয় মানে হল, তাকে স্থান এবং কাল সাপেক্ষে সমাকলন করা। সমাকলনকে আবছাভাবে ধরা যেতে পারে, বাস্তবায়ন। এবার বাস্তবায়নের পরে তো তো মাটি লাগে। ভূমি লাগে। আসল জিনিস লাগে। হিসেব করা যয়, কতটা মাটি লাগবে। ইত্যাদি। কতটা জায়গা লাগবে। কী কী করতে হবে। বাস্তবায়নের পরের ধাপ বলা যেতে পারে স্থাপনায়ন। স্থাপন। তাই সমাকলন, সেটা সমাধান নয়, সমাধান–সূত্র। স্থানীয় সমাকলনকে বলা যেতে পারে সমাধান। আসলায়ন। স্থাপন। এই বাস্তবায়ন বা পরে আসলায়ন বা স্থাপন — এরা স্বাধীন নয়, বোঝাই যাচ্ছে। এরা প্রায় পুরোটাই ফারাকীকরণের ওপর নির্ভরশীল। ওপরের অনুচ্ছেদে আমরা যে ফারাকিকারগুলি একে একে দেখলাম, একেকটার জন্য ক্রিয়া বা সমাধান–সূত্র আলাদা আলাদা। কোনোটা সরলরেখা। কোনোটা উত্তল অধিবৃত্ত। কোনোটা অবতল অধিবৃত্ত। ইত্যাদি ইত্যাদি। হতেই পারে, কিছু কিছু বিন্দুতে সমাধানবিন্দু একই। কোনো স্থান–কালে সমাধান একই। কিন্তু সমাধান–সূত্রগুলি আলাদা আলাদা।

স্থানীয় সমাকলন বা আসলায়নও কিন্তু যাকে বলে একটা কঠিন কাজ। অনেক সময়ই বেশ কিছু ফারাকিকারের সমীকরণের পূর্ণ সমাকলন করাই যায় না। তখন আংশিক সমাকলনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। বাস্তবায়ন খুব সহজ কাজ নয়। সমস্যাটা তৈরি করলেও সমাধান সহজ নয়। এ থেকেই বোঝা যায়, সমাধান যেমন সমস্যা নির্ভর — তেমনি সমস্যা কিন্তু সমাধান নির্ভর নয়। সবল বা পূর্ণাঙ্গ সমাধান হতে পারে। আবার দুর্বল বা আংশিক সমাধানও হতে পারে। অনেক সময় সমস্যাটির সবল বা পূর্ণাঙ্গ সমাধান করা যায় না। তখন দুর্বল বা আংশিক সমাধান করে কাজ চালাতে হয়। অথবা নতুন করে ফের সমস্যায়ন করতে হয়। সমাধান বা আসলকরণ — তা বোধ করি সমস্যায়নের চেয়েও কঠিন কাজ। সমস্যায়ন বা ফারাকিকরণ — সেখানে কল্পনার ভূমিকা বা সৃজনশীলতার ভূমিকা নির্ধারক। আসলকরণ বা স্থানীয়করণ বা সমাধানে পরনির্ভরতা বড্ড বেশি। তাই বেশিরভাগ সময়ই সমাধান থাকে না। অথবা দুর্বল সমাধান দিয়ে বা ঠেকনো দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে হয়। তা কি খারাপ? উঁহু। সমাধান হল সমস্যার অন্ত। সমস্যার শেষ। সমাধান না থাকা বা দুর্বল সমাধান মানে হল — সমস্যাটা অস্তিত্বশীল হয়ে যাওয়া। সমস্যাটা রয়ে যাওয়া।

সমস্যা রয়ে যাওয়া, সমাধিত না হওয়া। এই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ

বোঝার ক্ষেত্রে। সমস্যা কখনোই সমস্যা হিসেবে থেকে যাওয়ার জন্য নয়। সমস্যা মানেই সমাধিত হবার জন্য। প্রপঞ্চের ধোঁয়াশা কাটানোর জন্য। প্রপঞ্চের ধোঁয়াশা কাটে যখন উপরিতলে এবরোখেবরো কিছু থাকে না, সমতলীয়তা আসে। উপরিতলকে তল হিসেবে লাগে, উপরিতল হিসেবে লাগে না। উপরিতল মানে হল, যার নিচের তল আছে। যার গভীরে কিছু আছে। উপরিতলকে তল হিসেবে লাগা মানে সেই গভীরতা অনুভূতি আর না থাকা। সমস্যা হল উপরিতলের এবরোখেবরো। সমাধান হল তার সমাধান, সমতলীয় হওয়া। সমস্যা তৈরিই করা হয় সমাধিত হবার জন্য। তাই, সেই সমস্যার থেকে যাওয়া, বা রয়ে যাওয়া, বা দুর্বল ও আংশিক সমাধানের ঠেকনো — এগুলো হল অনস্তিত্ব। অর্থাৎ, থাকার কথা নয় তবুও আছে — এরকম ব্যাপার।

তুমি যদি শুধু সমাধানের দিকে তাকাও, বা সমাধানের দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকাও, সমাধানের কথা ভাবো — তাহলে নিশ্চিত জানবে, তুমি কোনো না কোনো সমস্যার অধীনে আছো। কোনো না কোনো সমস্যার আসলকরণ করতে চাইছ। সমস্যায়ন করেছে অন্য কেউ। আমাদের সমাধানপন্থী মন অনেক সময় জানতেই পারে না যে সে অন্য কারোর সমস্যায়নের আসলকরণের কাজটুকুই করছে শুধু। বিবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্যে সে উত্তর দিচ্ছে মাত্র। প্রশ্নটা করে চলে গেছে অন্য কেউ। সমাধানে আচ্ছন্ন মন সমস্যার গুরুত্ব বোঝে না। উত্তর প্রত্যাশী মন প্রশ্নের গুরুত্ব বোঝে না। সে গভীরের ফারাককে দেখতে পায় না। ফারাককে অবজ্ঞা করে।

কিন্তু দেড় হাজার বছর আগে যেমন একজন বলেছিলেন, জগতে সমস্যা আছে, সমস্যার সমাধান আছে; তেমনি দেড় শ' বছর আগেও একজন বলেছিলেন, মানুষ কেবলমাত্র সেই সমস্যাগুলিকেই সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে, যেগুলির সমাধান সে করতে পারে। এই হল যাকে বলে কূটাভাষ। প্যারাডক্স। সমস্যার চরিত্রই হল সমাধানযোগ্যতা। সমস্যা মানেই তা সমাধানযোগ্য, নাহলে তা সমস্যাই নয়। কিন্তু সমাধানযোগ্য মানেই যে সমাধান করা যাবে এই স্থান কাল পাত্রে — তা তো না-ও হতে পারে! হয়ত করা যেত, কিন্তু তার আগেই সমস্যাটা মিলিয়ে গেছে, রূপ বদল করে ফেলেছে। কূটাভাষ তো এমন-ই হয়। তাই কোনো সন্দেহ নেই, সমাধান করতে চেয়েই আমরা সমস্যাকে বিবেচনা করব। সমাধান করতে চেয়েই আমরা সমস্যাকে তৈরি করি। সমাধান চেয়েই আমরা প্রপঞ্চকে সমস্যায়ন করি। আমরা কোনো ধাঁধা তৈরি করতে চাইছি না। এমন কোনো সমস্যা তৈরি করতে চাইছি না, যা সমাধানযোগ্য নয়। যেমন, উদাহরণস্বরূপ – – বুদ্ধদেবকে একজন বলেছিল, আমার ছেলে মরে গেছে, তাকে বাঁচিয়ে দিতে হবে। বুদ্ধদেব তাকে বলেছিল, যাও দেখি এমন বাড়ি থেকে একটা

লোক ধরে নিয়ে এস, যাদের পরিবারে কেউ মরেনি কোনোদিন। সে খুঁজতে গিয়ে বুঝতে পারল — মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ মৃত্যু কোনো সমস্যা নয়। তার কোনো সমাধান নেই। মৃত্যু সমস্যা নয়, কারণ তার সমাধানযোগ্যতা নেই। সমাধানও মানুষ করতে পারবে, তবেই তা হবে সমস্যা। মার্ক্সের বক্তব্য ছিল এমনই। তবুও, সমাধান মানেই সমস্যার অন্ত। তাই বলা যেতে পারে — সমস্যায়ন — এটা মানুষিক ব্যাপার। যা আমরা প্রথম অনুচ্ছেদে দেখলাম। গণিত ধরে। কারণ তা প্রপঞ্চের প্রহেলিকা বা আজবত্বর অবসান ঘটায়। প্রপঞ্চ-র ঐশ্বরিকত্বের অবসান ঘটায়। এবং একইসাথে — সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা — সেটাও মানুষিক ব্যাপার। অর্থাৎ বাস্তবায়ন, আসলায়ন, স্থানীয়করণ ইত্যাদি। মানুষিক মানে হল — মানুষ যা করে, সচেতনে নয়, অচেতনে।

এইখানেই দুটি কথা বলা হল — সমস্যা এবং সমাধান — এই দুই বিশেষ্য পদ — এই দুই অস্তিত্ব — কিন্তু মানুষিক ব্যাপার নয়। সমস্যায়ন এবং বাস্তবায়ন — এই দুই অনস্তিত্ব — এই দুই সক্রিয়তা — এই দুই অধি-অস্তিত্ব — এইগুলো মানুষিক ব্যাপার। আমাদের হাত পা মাথা মুণ্ডু গা কোষ কলা ইত্যাদি চলে এই সমস্যায়ন এবং বাস্তবায়নে বা সমাধায়নে। অন্তর্কলন এবং সমাকলন তাই গাণিতিক ব্যাপার যতটা — বিমূর্তভাবে দেখলে — তা অত্যন্ত সামাজিক ব্যাপার — যেখানে মানুষ সক্রিয়। আমরা সারাক্ষণই সমস্যায়ন করে চলি এবং সমাধায়ন করে চলি।

****

বলা হল — সমস্যায়ন বা ফারাককিকরণ — সেখানে কল্পনার ভূমিকা বা সৃজনশীলতার ভূমিকা নির্ধারক। আবার বলা হল, সমস্যায়ন হল মানুষিক — অর্থাৎ মানুষ যা করে অচেতনে, সচেতনে নয়। তাহলে কি দুই ধরনের কথা বলা হচ্ছে না? এটা কি স্ববিরোধ নয়? দুই ধরনের কথা তখনই হয়, যখন ধরে নেওয়া হয় — কল্পনা বা সৃজনশীলতা সচেতনের ব্যাপার, অচেতনের নয়। যদি কল্পনা এবং সৃজনশীলতা অচেতনের হয় — তাহলে দুটি একই কথা হয়, স্ববিরোধ থাকে না।

উদাহরণে ফেরা যাক। বছর কুড়ি আগে কলকাতা শহরে বড় রাস্তায় সাইকেল চালানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি শুরু হয়, কারণ ধীরগতির যান সাইকেল (এবং রিক্সা ও ভ্যান) কলকাতার রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যাম তৈরি করে। কিন্তু আগে যারা কলকাতা শহরে সাইকেল চালাত, তারা বড় রাস্তায়

সাইকেল চালানো বন্ধ করল না। অনেকেই চালিয়ে যেতে লাগল, বাধা বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও। এই যে বাধা বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও সাইকেল চালিয়ে যেতে লাগল — সেটা কিন্তু কোনো জেদ থেকে নয়। কোনো 'অমান্য করব' এমন ভাবভঙ্গী থেকে নয়। বরং, তার কাছে সাইকেল-ই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক যান, তাই জন্য। হতে পারে, তার কাজের ধরন এরকম। হতে পারে, সে মিতব্যয়ী, তাই জন্য। হতে পারে আরো নানা কারণ। প্রতিটি মানুষই আলাদা। তাই কারণের পেছনে ছুটতে গেলে বহু বহু কারণ আসতে পারে। কিন্তু ব্যাপার যেটা দাঁড়াল, বহু মানুষ সাইকেল চালিয়ে যেতে থাকল শহর কলকাতার বড় রাস্তায়। তারা তৈরি করল একটা যাপন। বেআইনি যাপন। বছর দশেক আগে সেই বেআইনি যাপন তৈরি করল একটি প্রশ্ন — কেন কলকাতায় বড় রাস্তায় সাইকেল চালাতে দেওয়া হবে না? তারাই তৈরি করল প্রশ্নটা। এই যে কলকাতা শহরে বড় রাস্তায় যারা বেআইনিভাবে সাইকেল চালিয়ে গেল, তাদের ছুঁড়ে দেওয়া ওপরের প্রশ্নটা — সেটাই তৈরি করল একটা সমস্যা। সমস্যাটা কী? 'কলকাতার বড় রাস্তায় সাইকেলকে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে?' সে সমস্যার আজও সমাধান হয়নি। কলকাতাবাসী তার সমাধান করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে — কিন্তু সমাধান হয়নি। কখনও প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে — চওড়া রাস্তায় সাইকেল লেন করে দাও। কিন্তু করবে কোথা দিয়ে জায়গা কোথায়? ইত্যাদি ইত্যাদি। এই হল সমস্যায়ন ও সমাধায়নের একটা দৃষ্টান্ত। দুটিতেই মানুষ আছে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, যে কলকাতাবাসী শহরের বড় রাস্তায় সাইকেল চালু রাখল নিজেরা চালিয়ে — তারা কিন্তু কোনো সচেতনতা থেকে করেছে ব্যাপারটা এমন নয়। বরং সে করছে অচেতনা থেকে। তারপর সে যখন প্রশ্নটা তুলল — কেন কলকাতায় সাইকেল চালাতে দেওয়া হবে না, তখন এল কল্পনা বা সৃজনশীলতার প্রশ্ন। যা কিন্তু তাদের যাপন নির্ভর। এই প্রশ্নটা মাথা থেকে বেরিয়েছে, এমন নয় — বরং বেরিয়েছে তাদের জীবনযাপন থেকে। এখানে আসা যাক, মাথা থেকে কী কী প্রশ্ন বেরোতে পারে — কেন কলকাতায় রাস্তায় রণ-পা পড়ে চলতে দেওয়া যাবে না? কেন কলকাতার রাস্তায় হাতির পিঠে চলতে দেওয়া যাবে না? কেন সাইকেলকে কলকাতার রাস্তায় আড়াআড়ি চলতে দেওয়া হবে না? ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো মাথার প্রশ্ন। যাপনের থেকে আসা প্রশ্ন নয়। তাই কল্পনা বা সৃজনশীলতা বলতেই আমরা যেমন মনে করি, তা মাথা থেকে বেরোবে — তা কিন্তু নয়। কল্পনা বা সৃজনশীলতা যাপন থেকে আসে, মাটি থেকে আসে। কলকাতায় যারা সাইকেল চালাত না — তারা সাইকেলের প্রশ্নটা শুনে বলল — কী চমৎকার একটা প্রশ্ন মাথা থেকে বেরিয়েছে! কী কল্পনা! কী সৃষ্টিশীলতা! হ্যাঁ, তাদের কাছে এটা মাথা থেকে। কিন্তু যারা সাইকেল চালায়, তাদের কাছে এটা মাথা থেকে

নয়। কল্পনা বা সৃজনশীলতা–কে যাপনের বাইরে থেকে দেখলে সচেতনার ফসল বলে মনে হয়। মাথাপ্রসূত বলে মনে হয়। কলকাতার বড় রাস্তায় সাইকেল প্রসঙ্গে আরো একটু বলা যাক। ধরা যাক, প্রশাসন বলল — ঠিক আছে। চওড়া রাস্তায় সাইকেল লেন বা সার্ভিস লেন মতো করে দিচ্ছি। সেখান দিয়ে সাইকেল চালাও। দেখা গেল, কিছু লোক চালাচ্ছে, কিন্তু কিছু লোকে সেখান দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছে না। নানা কারণে। সেই গাড়ির রাস্তা দিয়েই চালাচ্ছে। কিছুতেই শুনছে না। তখন আবার তা নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে। একটু খেয়াল করে দেখো তো, প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত মিশ্রণের সান্দ্রতার একের পর এক সমস্যায়নের চেষ্টার সঙ্গে কিছু মিল খুঁজে পাচ্ছ কি না।

উদাহরণটা ভালোর দিকে দিলাম, মানে সাইকেল চালানো ভালো, সেটা ধরে নিয়ে বলছি। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে ফারাকিকার বা সমস্যায়ন যে সবসময় ভালোর দিকে টেনে হবে তা নয়। বেশিরভাগ সময়েই না হবারই সম্ভবনা। যেমন ধরা যাক, সিকিম জৈব বা অর্গানিক চাষের রাজ্য বলে ঘোষিত হয়েছে। ওখানে সব চাষ জৈবসার দিয়ে হয়। এবার তার মানে তো এই নয়, যে ওখানে সব লোক জৈবভাবেই চাষ করবে। ধরা যাক, কিছু লোক ইউরিয়া সার কিনে জমিতে দিয়ে চাষ করা বন্ধ করে দেয়নি। বা সিন্থেটিক কীটনাশক বন্ধ করেনি। কারণ নানাকিছু আছে। হয়ত গোবরের অভাব, হয়ত ফলন ভালো হয়, হয়ত খরচ কম হয় — ইত্যাদি ইত্যাদি। আপাতত তারা লুকিয়ে চুরিয়ে করছে, বা ফসল সেভাবে বড় বাজারে আনছে না। বা ধরা পড়ছে না। এবার কিছুদিন পর থেকে লোক জানাজানি হল। প্রশাসন বন্ধ করতে পারবে না, কারণ মানুষের প্রতিদিনের যাপনে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ অসম্ভব। প্রশাসন যেটা করতে পারে, সেই ফসলের বিক্রিবাটা বন্ধ করার চেষ্টা করতে পারে। এইবার সিকিমের সেই রাসায়নিক চাষিরা প্রশ্নটা করল — কেন একটা সীমার মধ্যে রাসায়নিকনির্ভর চাষ বা মিশ্র চাষ করতে দেওয়া হবে না? ব্যস। সমস্যা তৈরি হয়ে গেল — 'কীভাবে জৈবকৃষির রাজ্য সিকিমে সীমার মধ্যে রাসায়নিক বা মিশ্র চাষ হতে পারে'। মোটামুটি জনগ্রাহ্য ধারনা এখন এরকম — রাসায়নিক চাষ খারাপ, জৈব চাষ ভালো — এই ভালো–খারাপের ওপর দাঁড়িয়ে এই সমস্যায়ন কিন্তু খারাপের দিকে টেনে। খারাপের দিকে টেনে সমস্যায়নই বেশি। যেমন, চুরি করা খারাপ, কিন্তু লোকে চুরি করে। পরীক্ষার হলে নিজের খাতার উত্তর সম্পূর্ণভাবে নিজে লেখা ভালো, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের কেউ কেউ পাশের জনের কাছে জিজ্ঞেস করে অন্ততঃ, যদি টুকলি না–ও করে। এসবের সমাধায়নের চেষ্টাও করা হয়। খুব কড়া গার্ড, ধরা পড়লেই

শাস্তি — ইত্যাদি সমাধান অনেকটা আংশিক বা দুর্বল সমাধায়ন। রাসায়নিক চাষের খোঁজখবর পেলেই জেল, জরিমানাও আংশিক বা দুর্বল সমাধায়ন। কলকাতার কিছু বড়ো রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে ধরা পড়লেই জরিমানাও আংশিক বা দুর্বল সমাধায়ন।

*****

স্বাধীন চলকের তিলমাত্র ফারাকের সঙ্গে অন্য যা কিছুর সামান্য ফারাকের সম্পর্ক — এই ফারাকিকারের মাধ্যমে সমস্যায়ন কিন্তু কোনো খেয়ালখুশির বা আনতাবড়ি ব্যাপার নয়। মিশ্রণের সান্দ্রতার উদাহরণে গ্রাফে পরিমাপবিন্দু গুলির অবস্থানই কিন্তু একটি সম্পর্ককে বা একটি ফারাকিকারকে তুলে ধরায় বা অ্যাফার্ম করায়। সমস্যায়ন কখনোই খেয়ালখুশির বা আনতাবড়ি নয়।

উচ্চতর গণিতের অন্তর্কলন এবং সমাকলন — ফারাকিকরণ এবং বাস্তবায়ন — সমস্যায়ন এবং সমাধায়ন — আমাদের শেখায় সমস্যায়ন এবং সমাধায়নের প্রয়োজনীয়তা, বলা ভালো, বাধ্যবাধকতা। ভৌতিক বা ফিজিক্যাল প্রপঞ্চ–র ধোঁয়াশা বা দৈবত্ব–র কুজ্ঝটিকা সরিয়ে তাকে মানুষের আওতাধীনে আনে সমস্যায়ন। একইভাবে সামাজিক প্রপঞ্চের স্বর্গত্ব (বা নরকত্ব) সরিয়ে তাকে যা তা–ই, অর্থাৎ, মানুষিক ব্যাপার হিসেবে দাঁড় করায় সমস্যায়ন। মনুষ্য সমাজ স্বর্গ (বা নরক) নয়। মানুষ দেবতা নয়। দেবতা হবেও না। খারাপ–ভালো সীমাবদ্ধতা নিয়েই মানুষ। সমস্যায়ন এবং সমাধায়নের অন্তহীন চক্র মানুষের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকৃতি দেয়। সমস্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের ভালো/খারাপ এই বিচারধারা থেকে বার করে আনে। ভালো অথবা খারাপ এই নৈতিক বিচারের মাধ্যমে গ্রহণ বর্জনের পন্থায় বাতিল করার বা এক্সক্লুসনের ঝোঁক চলে আসে, এর বিপরীতে সমস্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গী ঠাঁই করে দিতে শেখায়। যা আমার মতো নয়, আমার পছন্দ মতো নয়, সেরকম সমস্ত কিছুও থাকবে — এটাকে স্বীকৃতি দেয় সমস্যায়ন। মনুষ্য সমাজকে স্বর্গরাজ্য (বা নরক) হওয়া থেকে আটকায় সমস্যায়ন। জীবনে রুচি আনে।

সমস্যা ও স্ববিরোধ

নেতির কথা

নেতি কী? নেতিবাচকতা কেমন? সমস্যায় নেতির ভূমিকা কী? নেতি-কে অক্ষ ধরে এগোনো প্রকল্প বনাম সমস্যা — এইভাবে দেল্যুজ তার আলোচনা শুরু করেন।

> *একটা শেষ ফল রয়ে যায়, নেতি-র অবস্থা বিষয়ে। অন-অস্তিত্ব আছে সেখানে, কিন্তু তবু সেখানে কোনো নেতিবাচক নেই, নেতি-ও নেই। অন-অস্তিত্বটি কোনোভাবেই নেতিবাচকের অস্তিত্ব নয়, বরং তা হলো সমস্যাজনক অস্তিত্ব। এই (অন)-অস্তিত্বটির বা ?-অস্তিত্বটির চিহ্ন হলো* 0/0 *। এই শূণ্য এখানে কেবল ফারাক এবং তার পুনরাবৃত্তিকে সূচিত করে। অতিরিক্ত* ne *টির মধ্যে, যা কিনা ব্যকরণবিদদের ব্যাখ্যা করতে ঘাম ছুটে যায় (এটি ফরাসি তে আছে, এবং আরো কিছু ভাষায়। উদা : আমরা খাব না –* on ne mange pas *। এখানে* pas *মানে না, আবার* ne *কেন? এটা অতিরিক্ত* ne *। আরেকটি বাক্য — আমরা শুধু আম খাই –* on ne mange que mangue *। এখানে* ne *এর ব্যবহারটি লক্ষ্যণীয় — অনুবাদক), তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় এই (অন)-অস্তিত্ব যা এক সমস্যাজনক ক্ষেত্রের রূপের সঙ্গে মানানসই, যদিও এই প্রস্তাবনার গড়ে ওঠার মধ্যেই প্রবণতা আছে একটি নেতিবাচক অন-অস্তিত্বে অঙ্গীভূত হয়ে যাবার : সবসময়ই সমস্যাগুলির মধ্যে থেকে তৈরি হওয়া প্রশ্নগুলির*

সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে প্রস্তাবনার মধ্যে আসে ওই অতিরিক্ত ne *টি, যেন এক প্রত্যক্ষদর্শী, ব্যকরণগত অতিরিক্ত–প্রস্তাবনার এক মুহুর্তের। নেতিবাচকতা হলো একটা বিভ্রম : সে কেবল সমস্যাগুলির ছায়া মাত্র। আমরা দেখেছি কেমন করে সমস্যা আবশ্যিকভাবে লুকিয়ে থাকে সাম্ভাব্য প্রস্তাবনাগুলির মধ্যে যেগুলি সমাধানের কেসগুলির সঙ্গে মানানসই; তারপর, সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হবার বদলে তা কেবল প্রকল্প হিসেবে, প্রকল্পের সারি হিসেবে দেখা দেয়। প্রতিটি প্রকল্প সচেতনতার প্রস্তাবনা হিসেবে, পাশাপাশি দ্বৈত নেতিবাচকতার : নয় এই এক, নয়তো এই এক নয় ... নয় তা ঠিকঠাক চলছে, নয়তো তা ঠিকঠাক চলছে না ...। নেতিবাচকতা হলো একটা বিভ্রম, কারণ নেতির রূপটি উঠে আসে প্রস্তাবনাগুলির সঙ্গে যেগুলি সমস্যাটিকে প্রকাশ করে, যে সমস্যাটির ওপর প্রস্তাবনাগুলো নির্ভর করে কিন্তু কেবল তাকে বিকৃত করার এবং তার সত্যিকারের কাঠামোটিকে আচ্ছাদিত করার মধ্যে দিয়ে।*

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া ও ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ২০২

সমস্যা প্রকল্পে পরিণত হয়ে গেলে কী হয়?

যেই সমস্যাটি প্রকল্পে অনূদিত হয়ে গেল, প্রতিটি প্রকল্পিত ইতি হয়ে উঠল এক নেতির দুই গুণ, যে এখন উপস্থাপিত করছে সমস্যাটির অবস্থাকে যেটিকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার ছায়া। নেতিবাচকতায় কোনো আইডিয়া নেই, শুধু এইটুকুই আছে যে, প্রকৃতিতে প্রকল্প রয়েছে, যদিও প্রকৃতি চলে সমস্যা দিয়ে। তাই নেতিবাচকতাকে যুক্তির সীমা বা বাস্তব বিরোধ সে যেভাবেই গ্রহণ করা হোক তা খুব কম গুরুত্ব বহন করে। নেতিবাচকতার মহতী ধারনাগুলি বিবেচনা করো, যেমন, একের সাপেক্ষে অনেক, শৃঙ্খলা–র সাপেক্ষে বিশৃঙ্খলা, অস্তিত্বের সাপেক্ষে অনস্তিত্ব : এক ক্ষয়প্রক্রিয়ার সীমা বা নিবন্ধের প্রতিনিবন্ধ, যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন তাতে কিছু ফারাক হয় না। খুব বেশি হলে, এই প্রক্রিয়া ভিত্তি খুঁজে পাবে, কখনো কখনও ভগবানের বৈশ্লেষিক বিষয়ের মধ্যে, কখনো কখনো আত্ম–র সংশ্লেষী রূপের মধ্যে। কিন্তু দেবতা হোক বা আত্ম, একই ব্যাপার। দুটি ক্ষেত্রেই আমরা নির্ভর করি সরল ধারনার প্রকল্পিত উপাদানের ওপর, যেটা অন্তর্ভুক্ত হয় কখনো সদৃশ উপস্থাপনের সমস্ত অসীম মাত্রায়, কখনো দুটি বিপরীত উপস্থাপনের অসীম বিরোধে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া ও ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ২০২–২০৩

নেতিবাচকের সমালোচনা করব কীভাবে? নেতিবাচক কি তার সমালোচনাকেও নিজের কাঠামোর মধ্যে ধারন করে নিচ্ছে না? ফলতঃ তার সমালোচনা আসলে তাকে সাহায্য করা বা স্বীকার করারই কি নামান্তর হয়ে যাচ্ছে না? উপায় কী?

নেতিবাচক-এর সমালোচনাগুলো কখনোই নিদানমূলক নয়, যতক্ষণ না তারা প্রাথমিক ধারনাটির অধিকার নিয়ে টানাটানি করছে (এক, নিয়ম, অস্তিত্ব); যতক্ষণ তারা বিরোধিতাকে সীমাবদ্ধতা হিসেবে বুঝে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকছে। নেতিবাচকের সমালোচনা কেবল তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন তা বিরোধিতা এবং সীমাবদ্ধতার মধ্যের অভিন্নতা-কে সমালোচনা করে, তার মাধ্যমে একই প্রকল্পীয় ধারনাকে সমালোচনা করে, মাধ্যমে যা আবশ্যিকভাবে এটা বা ওটাকে রক্ষা করে, বা এমনকি একটাকে অন্যটা দিয়ে। সংক্ষেপে, আইডিয়ার ভিত্তিতে, আইডিয়াল, ফারাকীকার এবং সমস্যায়িত উপাদানের ভিত্তিতে হতে হবে নেতিবাচকের সমালোচনা। বহুতার ধারনাটি একসাথে এক এবং অনেক-র ধারনাকে নস্যাত করে, অনেক-এর দ্বারা একের সীমাবদ্ধতা এবং অনেক-এর বিরোধিতায় এক-কে। বৈচিত্র্য-ই একসাথে নস্যাত করে শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলাকে। (অন)-অস্তিত্ব, (?)-অস্তিত্ব যেগুলো নস্যাত করে একসাথে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বকে। নেতিবাচকের স্যাঙাৎপনা এবং কল্পনা প্রতিটি জায়গায় মিলিয়ে যেতে বাধ্য ফারাক ও সমস্যায়নের একটি গভীর সংযোগে। আইডিয়া, বাস্তবতঃ, তৈরি হয় ফারাকীকারের উপাদানগুলোর মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক দিয়ে, যা ওই সম্পর্কগুলোর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণযোগ্য, যে সম্পর্কগুলোর মধ্যে কখনো নেতিবাচক বা নেতিবাচকতার সম্পর্ক ঠাঁই পায় না। ধারনার বিরোধিতা, সংঘাত, এবং স্ববিরোধগুলি এতটাই স্থূল ও গড়পরতা বলে মনে হয়, যার তুলনায় সূক্ষ্ম এবং ফারাকীকার উপায়গুলি যা আইডিয়ার চরিত্রবৈশিষ্ট্য, সেগুলি হালকা। আমাদের 'ইতিবাচকতা' নামটা সংরক্ষণ করতেই হবে এই বহু আইডিয়া এবং সমস্যায়নের ধারাবাহিকতার জন্য। এর সাথেই আমাদের রক্ষা করতেই হবে এই যথাযথ ইতিবাচক (অন)-অস্তিত্ব -কে নেতিবাচক অনস্তিত্বের দিকে ঝুঁকে পড়া থেকে, এবং তার নিজের ছায়ার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা থেকে, যেখানে সে খুঁজে পায় তার গভীরতম বিপ্রকৃতকরণ, সচেতনতার বিভ্রমের পাল্লা ভারী করে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া ও ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ২০৩

ভাষাতত্ত্বের একটি একটি তুলনায় নতুন ধারনা হল ফোনেমের ধারনা। ফোনেম হল ধ্বনির একক, যা একটি ভাষার দুটি শব্দকে পৃথক করতে সক্ষম। যেমন, টিপ আর ডিপ — শব্দদুটির একমাত্র ফারাক প্রথম ফোনেমটির ভেদ–এ। ফোনেমের ধারনার ওপর দাঁড়িয়ে ভাষাতত্ত্বকে নতুন করে সাজানোর অগ্রণীদের মধ্যে আছেন নিকোলাই ত্রুবেজকয় এবং ফার্দিনান্দ স্যসুর — গত শতাব্দীর প্রথম অর্ধে। এই দুজনকেই আলোচনায় টেনেছেন দেল্যুজ। দেখিয়েছেন, কীভাবে ধ্বনিগত ফারাককে নেতিবাচকতার ওপর দাঁড় করিয়ে ছিলেন তারা।

উদাহরণ হিসেবে নাও — আজকাল যা প্রায়ই টেনে আনা হয় — ভাষাতাত্ত্বিক আইডিয়া। ধ্বনিবিজ্ঞান অনুযায়ী, একটি কাঠামোর যা যা চরিত্র থাকা দরকার সবই আছে ভাষাতাত্ত্বিক আইডিয়ার : ফারাকীকৃত উপাদানগুলি, যাদের বলে ফোনেম, যেগুলি ধারাবাহিক আওয়াজের প্রবাহ থেকে নিষ্কাশিত; ফারাকীকৃত সম্পর্কগুলির অস্তিত্ব (স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্য) যা নির্ধারণ করে উপাদানগুলিকে, পারস্পরিকভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে; অনন্য বিন্দু যেন এই নির্ধারণের মধ্যে ফোনেমগুলি (প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলি); ভাষার ব্যবস্থার বহুত্বর চরিত্রটি এইভাবে তৈরি হয়, যার সমস্যায়িত চরিত্র বস্তুগতভাবে উপস্থাপিত করে সমস্যাগুলিকে যেগুলি ভাষাটি সাজিয়েছে নিজের জন্যই, — এবং যা সে সমাধান করে চিহ্নের গঠনের মধ্যে; অজ্ঞাত উপাদানগুলি, অ–প্রকৃত, অলীক, উপাদানগুলো এবং সম্পর্কগুলোর, এবং বাস্তবত উচ্চারিত শব্দগুলির মধ্যে তাদের উত্তরণ ও অন্তর্লীন এই দ্বৈত অবস্থা; ফারাকীকার উপাদান গুলোর দ্বিত আসলকরণ, ফারাকীকারের সম্পর্কগুলির দ্বৈত আবির্ভাব একইসাথে বিচিত্র ভাষার মধ্যে এবং একই ভাষার বিভিন্ন বিশিষ্ট অংশের মধ্যে সংহতকরণ প্রতিটি ভাষা মূর্ত করে সম্পর্কের কিছু বৈচিত্র্য এবং অনন্যতার কিছু বিন্দু; বোধ এর সাথে কাঠামোর পরিপূরকতা, জনন–এর সঙ্গে কাঠামোর পরিপূরকতা, যেন নিষ্ক্রিয় জনন যা পরিস্ফূট হয় তার এই আসলকরনে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া ও ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ২০৩–৪

নেতি তৈরি হতে পারে সমস্যার থেকেও। তবে এই আলোচনায় ঢোকার আগে ভষাতত্ত্বে ত্রুবেজকয় এবং স্যসুরের ছোট্ট ভূমিকা করে নেওয়া যাক। স্যসুরের বিভাজনটি ছিল — কথা বলা হল parole বা প্যারোল এবং ভাষার ব্যবস্থা হল langue বা ল্যং। আর ত্রুবেজকয় ছিলেন ভাষাতত্ত্বের প্রাগ স্কুলের

জনক। তিনিই প্রথম খুব বিস্তারিতভাবে ফোনেটিক্স এবং ফোনোলজির মধ্যে তফাৎ করেন এবং ফোনোলজি কী তা বিন্যস্ত করেন। ফোনেটিক্স এবং ফোনোলজি — দুটোই অর্থের (signified) সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, শব্দের বিধ্যা signifier এর সাথে সম্পর্কিত। স্যসুরের শিষ্য এই ব্যক্তিবলেন, ফোনেটিক্স নিঃসন্দেহে ধনিবিদ্যার এই অংশটি কথা বলার সঙ্গে সম্পর্কিত যেখানে ধনিবিদ্যা বিজ্ঞান–এর সাথে জড়িত, ভৌতিক প্রপঞ্চ, যার মধ্যে অ্যানাটমি ইত্যাদি সব আছে; ফোনোলজি সেখানে মূলতঃ সামাজিক বা ভাষাগত। ফোনেম — যা কিনা ধ্বনির সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম ও মৌলিকতম উপাদান — তার ফারাকের উৎস যে সামাজিক — একথা সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম ও মৌলিকতম উপাদান — তার ফারাকের উৎস যে সামাজিক — একথা বলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন, স্থান, শ্রেণী, বয়স, লিঙ্গ ইত্যাদি ভেদ–এ একই শব্দের উচ্চারণভঙ্গী বদলে যায়। ত্রুবেজকয়–এর বই — 'ফোনোলজি–র নীতিসমূহ' বইতে 'স্বাতন্ত্র্যের তত্ত্ব' অধ্যায়তে এই স্বতন্ত্র ফোনেমের কথা বলতে গিয়ে শুরু করেন এইভাবে – 'স্বাতন্ত্র্যর ধারনার পূর্বধারনা হল বৈপরীত্য–র ধারনা। ... একটা ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য (phonic property) তাই কেবল স্বতন্ত্র হতে পারে তখনই, যখন তা আরেকটি ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের বিপরীত ...। শব্দের বৈপরীত্য যা পারে একটি ভাষার দুটি শব্দের অর্থকে আলাদা করতে তাকে বলে ধ্বনিবিদ্যাগতভাবে স্বতন্ত্র। অন্যদিকে যাদের এই বৈশিষ্ট্য নেই, তারা ধ্বনিবিদ্যাগতভাবে অস্বতন্ত্র। যেমন জার্মানে বিপরীত o-i, so/sie (এইরূপ / সে বা তারা), Rose/Riese (গোলাপ / দৈত্য)। এরা ধ্বনিবিদ্যাগতভাবে পৃথক। অপরদিকে alveolar r এবং avular r, এবং অস্বতন্ত্র জার্মানে এই দুই দিয়ে আলাদা করা কোনো দুটি শব্দ জার্মান ভাষায় নেই।'

এবার এই সমস্ত দিক থাকা সত্ত্বেও, যা নির্ধারণ করে সম্পূর্ণভাবে ইতিবাচক বহুত্ব, ভাষাবিদরা নিরন্তর বলেন নেতিবাচক শব্দে এবং ফোনেমগুলির মধ্যেকার ফারাকিকারের সম্পর্কগুলিকে আত্তিকরণ করেন বিরোধিতার সম্পর্কে। হয়ত বলা যেতে পারে যে এটা কেবল চিরাচরিত টার্মিনলজির ব্যাপার, এবং ওই 'বিরোধিতা' এখানে বোঝায় সরল আন্তঃসম্পর্ক। এটা সত্য যে বিরোধিতার ধারনা যা ভাষাবিদরা ব্যবহার করেন তা সম্ভবতঃ বিশেষ করে বহুতায়িত এবং আপেক্ষায়িত, যেহেতু প্রতিটি ফোনেম অন্য ফোনেমদের সঙ্গে নানা স্বতন্ত্র বিরোধিতাতে চলে যায় নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন, ত্রুবেজকয় এর শ্রেণীবিভাজন মোতাবেক, বিরোধিতা এতটাই নড়ে যাওয়া এবং ছড়ানো যে একসাথে থাকা বিচিত্র

সম্পর্কগুলির মধ্যে আর বিরোধিতা হিসেবে থাকে না বরং থাকে একটা জটিল বা বিভ্রান্ত ফারাককিকারের পদ্ধতি হিসেবে। একজন হেগেলিয়ান শান্তি পাবে না, একটি বড় স্ববিরোধের একরূপতা যদি না থাকে। সে যাই হোক, আমরা এখানে দেখলাম একটি জরুরি বিষয় : এখানে বা অন্যকোথাও, ফোনোলজিতে বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে এবং আইডিয়ার ব্যাপারে, এটা একটা জানার ব্যাপার যে বিরোধিতা কি বহুতায়িত করাই যথেষ্ট নাকি স্ববিরোধকে অতিনির্ধারণ করা দরকার এবং তাদের বন্টন করে দেওয়া দরকার নানা ছবির মধ্যে যা, প্রতিটি জিনিস থাকা সত্ত্বেও, এখনও রক্ষণাবেক্ষণ করে নেতিবাচকের রূপ। মনে হয়, বহুত্ববাদ একটি অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং ভয়ঙ্কর চিন্তা : টুকরো টুকরো করা সূচিত করে উল্টে দেওয়া। বহুত্বের যেকোনো পরিসরে সহবাসকারী বিরোধিতার আবিষ্কার আরও একটি গভীরতর আবিষ্কারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, তা হল ফারাক, যা নেতিবাচক-কে খাটো করে এবং বিরোধিতা নিজেই একটি ইতিবাচক বহুত্ব-র সমস্যায়িত ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি দৃশ্যমানতার বেশি কিছু নয়। কেউ বহুতায়িত করতে পারে না বিরোধিতাকে তার পরিসর না ছেড়ে গিয়ে, এবং ফারাক-এর গুহায় প্রবেশ না করে, যা আলোলিত হচ্ছে এক শুদ্ধ ইতিবাচকতা দিয়ে এবং বিরোধিতাকে পরিহার করে যেন বাইরে থেকে দেখা ছায়া সুরঙ্গ-র চেয়ে বেশি কিছু নয় তা।

ভাষাবিদ্যার আইডিয়াতে ফেরত যাওয়া যাক : কেন স্যসুর, যে মুহূর্তে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, 'ভাষায় কেবল ফারাক আছে', তার সঙ্গে যোগ করে দিলেন, এই ফারাকগুলি 'ইতিবাচক শব্দ ব্যতিরেকে' এবং 'অনন্ত নেতিবাচক'? কেন ত্রুবেজকোয় বলেন 'ফারাক-এর আইডিয়া' পবিত্র যা তৈরি করে ভাষাকে, তা 'ধরে নেয় বিরোধিতার আইডিয়া'? প্রতিটি জিনিস নির্দেশ করছে উল্টোটাকেই। এটা কি সচেতনতার দৃষ্টিভঙ্গীকে এবং আসল উপস্থাপনাকে ঢোকানোর একটা পথ নয়, যা হওয়ার কথা ছিল ভাষাগত অচেতনার আইডিয়ার তুরীয় অনুসন্ধান, তার মধ্যে? অন্যভাবে বললে, ভাষার মূল-এর সাপেক্ষে কথার সর্বোচ্চ চর্চা? যখন আমরা ফারাককে ব্যাখ্যা করছি বিরোধিতার খোপের মধ্যে নিয়ে গিয়ে এবং নেতিবাচক হিসেবে, আমরা কি তখন শ্রোতার পক্ষ নিয়ে ফেলছি না, এমনকি তাও সেই বাজে শ্রোতার যে ইতস্ততঃ করে যা বলা হল তার সাম্ভাব্য নানা বয়ানের মধ্যে এবং চেষ্টা করে বিরোধিতা প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে নিজেকে খুঁজে পেতে? অন্যভাবে বললে, আমরা কি ভাষার তুচ্ছতর দিকটি নিচ্ছি না, যে বলছে এবং অর্থ সংযোজন করছে তার দিক নেবার বদলে? আমরা কি

ভাষা যেভাবে খেলে, তার সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করছি না, অন্যভাবে বললে, জোড়ের বোধ, বাধ্যতার বোধ বা পাশার ভাষাগত নিক্ষেপ যা, আর্তুদের কান্নার মতো, বোঝা যাবে কেবল, যে বলছে তার ভাষার তুরীয় অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে, সেটার সাথে? সংক্ষেপে, ফারাককে বিরোধিতা হিসেবে অনুবাদ করা আমাদের মতে কিছু বাগধারা বা বাক–ঐতিহ্যের ব্যাপার নয়, বরং ভাষা এবং ভাষাগত আইডিয়ার সারবত্তার ব্যাপার। যখন ফারাককে পড়া হয় বিরোধিতা হিসেবে, তাকে তার বৈশিষ্ট্যসূচক পুরুত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয় যার মধ্যে তার ইতিবাচকতা তুলে ধরা আছে। আধুনিক ফোনোলজিতে একটি মাত্রার অভাব আছে যা তাকে বাধা দিতে পারত একটিই তলে ছায়া নিয়ে খেলা থেকে। একভাবে, গুস্তাভ গুইলমের সমস্ত কাজে বার্তাটি হল এইটাই, যা আজ বোঝা যেতে শুরু করেছে। যেহেতু, বিরোধিতা আমাদের যা বিরোধিতা করা হচ্ছে বলে ভাবা হচ্ছে তার চরিত্রের ব্যাপারে কিছুই শেখায় না। প্রাসঙ্গিক মূল্য সম্বলিত ফোনেমের নির্বাচনগুলি, এই ভাষা বা ওই ভাষায়, তা অবিচ্ছেদ্দ্য মরফেমগুলি থেকে, ব্যকরণগত গঠনের উপাদান হিসেবে। তার ওপর, মরফেমগুলি, যারা নিজেরাই গোটা ভাষার অলীক সমগ্রকে খেলায় আনে, তারা আস্তে আস্তে নির্ধারিত হবে যে নির্ধারন এগোবে 'ফারাকিকারের দোরগোড়া' ধরে ধরে এবং বোঝাবে একটা শুদ্ধ যৌক্তিক সময়কে যা মাপতে সক্ষম জনন–কে বা আসলিকরণকে। ফোনেমগুলির আনুষ্ঠানিক পারস্পরিক নির্ধারণ ওই ধারাবাহিক নির্ধারণকে নির্দেশ করে, যা প্রকাশ করে ফোনিক ব্যাপারস্যাপারগুলির ওপর অলীক ব্যবস্থার কার্যকলাপ। এবং এটাও তখন–ই যখন ফোনেমগুলিকে বিবেচনা করা হয় বিমূর্তভাবে — অন্যভাবে বললে, যখন অলীককে সংকুচিত করে ফেলা হয় একটা সরল সাম্ভাব্যে, তখন তাদের সম্পর্কগুলি ফাঁকা বিরোধিতার নেতিবাচক রূপ নেয়, একটি দোরগোড়ার চারপাশের ফারাকিকারের অবস্থানগুলি পূরণ করার বদলে। গুইলামের কাজের মৌলিক শিক্ষা হল স্বাতন্ত্র্যমূলক বিরোধিতাকে ফারাকিকারের অবস্থানের নীতি দিয়ে প্রতিস্থাপন। এই প্রতিস্থাপন ততটাই ঘটে যাতে মরফোলজি আর সরলভাবে ফোনোলজির ধারাবাহিকতা থাকে না, বরং উত্থাপন করে যথাযথ সমস্যায়িত মানগুলির যা নির্ধারণ করে ফোনেমের নির্বাচনের অনেকটা। আমাদের কাছে, এই ভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকেই অনস্তিত্ব পায় তার প্রয়োজনীয় বিচ্ছেদের নিশ্চয়তা : একদিকে, একটি ne *র মধ্যে যাকে আমরা বলেছি মানানসই নয়, আলাদা বা ফারাকিকৃত, নেতিবাচকের বদলে, একটি সমস্যায়িত* ne *যাকে লেখা উচিত (অন)–*

অস্তিত্ব অথবা ?–অস্তিত্ব; অন্যদিকে একটি তথাকথিত 'পূর্বনির্ধারিত' pas *যা লেখা উচিত* non-being *হিসেবে, কিন্তু যা দেখায় একটা তৈরি করা প্রস্তাবনায় কেবল আগের প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে। বাস্তবে, অনুপূরক* ne *নয়, যা নেতি–র বিশেষ ব্যাপারটা যা কম বোঝা গেছে, তা সামনে আনে : বরং এই অনুপূরক* ne *হল মূল বোধ যা থেকে বেরোয় নেতি* pas, *শুধু আবশ্যক ধারাবাহিকতা হিসেবে নয়, আবশ্যিক বিভ্রান্তি হিসেবেও।* 'ne ... pas' *বিভাজিত হয় একটি সমস্যায়িত* ne *এবং একটি নেতিবাচক* pas *তে, যেগুলো দুটি মুহূর্ত, ধরন–এ আলাদা, দ্বিতীয়টি আকর্ষণ করে প্রথমটিকে কেবল তাকে প্রতারণা করবে বলে।*

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া ও ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ২০৪–৬

এইবার দেখা যাক নেতিবাচকের জনন কীভাবে হয়।

নেতিবাচকের জনন এইভাবে : রওয়া–র তুলে ধরা হল জননীয় উপাদান বাধ্যতামূলক প্রশ্ন রূপে; এইগুলি বিকশিত হয় সমস্যার ইতিবাচকতায়; সচেতনতার প্রস্তাবনাগুলি হল তৈরি হওয়া উত্থাপন যা নির্দেশ করে সমাধানের কেসগুলি। প্রতিটি প্রস্তাবনার যদিও আছে দ্বৈত নেতিবাচক, যা প্রকাশ করে সমস্যার ছায়া, সমাধানের পরিসরে। অন্যভাবে বললে, তা প্রকাশ করে সেই কায়দা যার মধ্যে সমস্যা থেকে যায় নিজের বিকৃত প্রতিকৃতি হিসেবে যা উপস্থাপনায় আসে। এই সূত্রটা — 'এটা সেই ব্যাপার নয়' মানে হল যে একটি প্রকল্প নেতিবাচকে চলে যায় যতক্ষণ তা একটি সমস্যার বর্তমান শর্তগুলি উপস্থাপিত না করে, যার প্রতি, বিপরীতে, আরেকটি প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ঠ। তাই নেতিবাচক হল সত্যিই সমস্যায়িত–র ছায়াকে একসারি প্রস্তাবনার ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাকে তা ভেতরে ঢুকিয়ে নেয় উদাহরণ হিসেবে। সাধারণ সূত্র হিসেবে, নেতিবাচক–এর সমালোচনা থেকে যায় অফলপ্রসূ হিসেবে যতক্ষণ তা ধরে নেয় প্রদত্ত হিসেবে উত্থাপন–এর রূপটিকে প্রস্তাবনার মধ্যে প্রদত্ত হিসেবে ধরে নেয়। নেতিবাচক–এর সমালোচনা হল মৌলিক এবং বেশ ভালোভাবেই ভূমিষ্ঠ কেবল যখন তা উত্থাপন–এর একটি জনন ঘটায়, এবং, একইসাথে, নেতি–র চেহারার জনন ঘটায়। যেহেতু প্রশ্নটা হল এটা জানা যে কীভাবে উত্থাপন নিজেই বহু হতে পারে, বা কীভাবে ফারাক হতে পারে শুদ্ধ উত্থাপনের বিষয়। এটা সম্ভব কেবল সেই অবদিই যেখানে উত্থাপন একটা প্রস্তাবনার ধরন হিসেবে উৎপাদিত হয় অতিরিক্ত–প্রস্তাবনাসূচক জননীয় উপাদানগুলি থেকে (বাধ্যতামূলক

প্রশ্নগুলি বা মূল অস্তিত্ববাদী উত্থাপনগুলি)। তারপর ‘সম্পাদিত হয়’ বা নির্ধারিত হয় সমস্যার পথ দিয়ে (বহুতাগুলি বা সমস্যায়িত আইডিয়াগুলি, আদর্শ ইতিবাচকতাগুলি)। এই অবস্থায়, বলা যেতে পারে যে প্রস্তাবনায় নেতিবাচকতা উত্থাপনের পাশাপাশি থাকে, কিন্তু কেবল সমস্যার ছায়া হিসেবে, প্রস্তাবনাকে ভাবা হয় উত্তর দেবে বলে — অন্যভাবে বললে, জননীয় মুহুর্তের ছায়া হিসেবে যা উৎপাদন করে উত্থাপনকে।

আইডিয়া ধারন করে ফারাকিকারের সম্পর্কগুলির সমস্ত বৈচিত্রগুলি এবং অনন্য বিন্দুগুলির সমস্ত বন্টনগুলি যেগুলি সহবাস করে বিভিন্ন মাত্রায় একে অন্যের ওপর ‘আপতিত’ (perplicated) *হয়ে।*

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া ও ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ২০৬

দেল্যুজ বিশেষজ্ঞ ডানিয়েল স্মিথের বয়ানে — “‘সমস্যা’ শব্দটির মতো দেল্যুজ এই ‘আপতন’ শব্দটি, যার ফরাসী হল perplexion তা ব্যবহার করেন চিহ্নিতকরণের কাজে, সন্দেহের বা অনিশ্চয়তার বা আশ্চর্য্যের সূচক হিসেবে নয়, আইডিয়াগুলির অলীক অবস্থা এবং বহুতার সূচক হিসেবে। দেল্যুজ নিশ্চয়ই কিছু নব্য প্লেটোনিক ধারনা ব্যবহার করেছিলেন আইডিয়ার কাঠামোকে নির্দেশ করার জন্য। যেগুলির সবক’টিই মূল যে শব্দটি থেকে উদ্ভুত, তা হল ‘প্লি’ বা ভাঁজ : আপতন (perplexion), জটিলকরণ (complication), দ্যোতন (implication), উদ্ভাসন (explication) এবং প্রতিলিপিকরণ (replication)."

যখন একটি আইডিয়ার অলীক অন্তর্বস্তু আসলিকৃত হয়, সম্পর্কের বৈচিত্র্যগুলি মূর্ত হয় পৃথক পৃথক প্রজাতিতে, আর অনন্য বিন্দুগুলি যেগুলি একটি প্রজাতিরই মূল্যগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ সেগুলি মূর্ত সেই (বা ওই) প্রজাতির চরিত্রবৈশিষ্ট্যসূচক স্বতন্ত্র অংশ হিসেবে। উদাহরণস্বরূপ, রঙের আইডিয়া যেমন সাদা আলোর মতো, যা আপতিত করে নিজের মধ্যেই সমস্ত রঙ–এর জননীয় উপাদান এবং সম্পর্কগুলি, কিন্তু আসলীকৃত হয় বিচিত্র রঙ–এ তাদের নিজের নিজের জায়গায়; অথবা শব্দের আইডিয়া, যাও সাদা শব্দের মতো। এমনকি এক সাদা সমাজও রয়েছে এবং এক সাদা ভাষা, পরেরটি হল তা যা ধারন করে তার অলীকত্বে সমস্ত ফোনেমগুলি এবং সম্পর্কগুলি যেগুলি নানা ভাষায় আসলিকৃত হবে এবং একটি প্রদত্ত ভাষার নানা স্বতন্ত্র অংশে। এইভাবে, আসলিকরণের সঙ্গে, একটি নতুন ধরনের বিশেষ এবং আংশিকী স্বাতন্ত্র্য জায়গা নেয় অবাধ আইডিয়াল স্বাতন্ত্র্য–র। আমরা আইডিয়ার অলীক অন্তর্বস্তুর

নির্ধারণকে বলি ফারাকিকরণ আর সেই অলীকতার প্রজাতিতে এবং স্বতন্ত্র অংশে আসলিকরণকে বলি সংহতকরণ। সবসময় একটা ফারাকিকৃত সমস্যা বা একটি সমস্যার ফারাকিকৃত অবস্থার সাপেক্ষে একটি প্রজাতি বা অংশের সংহতকরণ করা হয়, যেন বা তা সমস্যাটির সমাধানের কেসগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ। এটা সর্বদা একটা সমস্যায়িত ক্ষেত্র যা শর্তায়িত করে একটি সংহতকরণকে সেই পরিপার্শ্বের মধ্যে যেখানে সে মূর্ত হয়। ফলতঃ — এবং এইটাই হল সবটা যা আমরা বলতে চাই — নেতিবাচক প্রতিভাত হয় না ফারাকিকরণ-এর প্রক্রিয়ায়, না সংহতকরণ-এর প্রক্রিয়ায়। আইডিয়া কোনো নেতি চেনে না। প্রথম প্রক্রিয়াটি একটি শুদ্ধ ইতিবাচকতার বিবরণের সঙ্গে অভিন্ন, একটি সমস্যা রূপে যার সাথে সূচিত সম্পর্কগুলি এবং বিন্দুগুলি, স্থানগুলি এবং কাজগুলি, অবস্থানগুলি এবং ফারাকিকার চৌকাঠগুলি যা বাদ দেয় সমস্ত নেতিবাচক নির্ধারনগুলিকে এবং তাদের উৎস খুঁজে পায় উত্থাপনের জননীয় বা উৎপাদী উপাদানগুলির মধ্যে। অন্য প্রক্রিয়াটি সীমিত সংখ্যক তৈরি হওয়া উত্থাপনের উৎপাদনের সাথে অভিন্ন, যা বহন করে আসলে তাদের যারা এই স্থানগুলি এবং অবস্থানগুলি দখল করে, এবং বহন করে বাস্তব সম্পর্কগুলিকে যেগুলি এই সম্পর্কগুলির এবং কাজগুলির আবির্ভাব ঘটায়। নেতিবাচকের রূপগুলি নিশ্চয়ই দেখতে পাওয়া যায় আসল অর্থগুলিতে এবং সত্যিকারের সম্পর্কগুলিতে, কিন্তু ততক্ষণই, যতক্ষণ সেগুলি অলীকতা থেকে বিচ্ছিন্ন যা-কে তারা আসলিকরণ করে এবং তাদের সেই আসলিকরণের গতিধারা থেকেও বিচ্ছিন্ন। তখন, এবং কেবল তখন, সীমিত সংখ্যক উত্থাপনকে দেখতে লাগে যে, সত্যিই যেন তারা নিজেরা নিজেদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ, একে অন্যের বিরুদ্ধে, এবং ভুগছে অভাব বা অভিযোগ-এ। সংক্ষেপে, নেতিবাচক সর্বদা উদ্ভুত এবং উপস্থাপিত, কখনোই মৌলিক নয় বা বর্তমান নয় : ফারাক-এর প্রক্রিয়াটি এবং সংহতকরণের প্রক্রিয়াটি হল প্রাথমিক, নেতিবাচক এবং বিরোধিতার সাপেক্ষে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া ও ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ২০৬-৭

হেগেলের নেতি, মার্ক্সের নেতি

মার্ক্সের ওপর বাতচিত করা যেসব লেখকরা মার্ক্স এবং হেগেলের মৌলিক তফাতের ওপর জোর দেয়, তারা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে যে পুঁজি বইটাতে সংহতকরণের বিভাগ (সামাজিক বহুত্বের অন্তস্থলের সংহতকরণ : শ্রমবিভাজন) দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল হেগেলের বিরোধ,

স্ববিরোধ এবং পরকরণ–এর ধারনাগুলিকে। দ্বিতীয়টি তৈরি করে কেবল এক আপাত গতিধারা এবং দাঁড়িয়ে থাকে কেবল বিমূর্ত ফলাফলের জন্য যা নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের উৎপাদনের সত্যিকারের গতিধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। পরিষ্কারভাবে, এই বিন্দুতে ফারাকের দর্শনের আশঙ্কিত হবার কথা, সে একটা সুন্দর আত্মার বাচনে পরিণত হচ্ছে না তো ? : ফারাক, কেবল ফারাকই, সামাজিক স্থানগুলি এবং কাজগুলির আইডিয়াতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে ... কিন্তু মার্ক্সের নামই যথেষ্ট এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার।

একটি সমাজের সমস্যাগুলি, যারা পরিকাঠামোতে নির্ধারিত হয় তথাকথিত 'বিমূর্ত' শ্রম হিসাবে, তারা তাদের সমাধান পায় আসলিকরণ বা সংহতকরণের প্রক্রিয়াটি থেকে (মূর্ত শ্রম বিভাজন)। যদিও, যতক্ষণ সমস্যাটি তার ছায়া নিক্ষেপ করে সংহতকৃত কেসগুলির গুচ্ছ–র ওপর যারা সমাধান তৈরি করল, তারা দেখাবে সমস্যাটিরই একটি মিথ্যে প্রতিকৃতি। এটা বলা যাবে না যে এই মিথ্যাকরণ আসে পরে : তা সঙ্গে করে নিয়ে যায় বা দ্বিগুণায়িত করে আসলকরণকে। একটি সমস্যা সমাধান হবার সময় সর্বদা প্রতিফলিত হয় মিথ্যা সমস্যাগুলিতে, যাতে সমাধানটি সাধারণভাবে বিকৃত হতে পারে একটি অবিচ্ছেদ্য মিথ্যাকার দিয়ে। যেমন, মার্ক্সের মতে, রতি হল সত্যিই এক অসম্ভবতা, সামাজিক সচেতনতার একটি ভ্রম, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বুঝি এর মাধ্যমে যে এটা ব্যক্তিগত সচেতনতার থেকে জন্ম নেওয়া বিষয়ীগত বিভ্রম নয়, বরং এক বিষয়গত বা তুরীয় বিভ্রম, যা সামাজিক সচেতনতার অবস্থা থেকে জন্মায় তার আসলিকরণের সময়। সেখানে আছে তারা যাদের সমগ্র সংহত সামাজিক অস্তিত্ব যুক্ত হয়ে আছে মিথ্যে সমস্যাগুলির সঙ্গে যা তাদের বাঁচতে সাহায্য করে, এবং সেখানে আছে অন্যরা, যাদের কাছে সামাজিক অস্তিত্ব সম্পূর্ণতই ধারিত মিথ্যে সমস্যাগুলিতে যেগুলির মধ্যে তারা প্রতারণাপূর্ণ অবস্থান দখল করে আছে, এবং যেগুলি তাদের ভোগায়। অ–বোধ এর সমস্ত চেহারাগুলো আসে মিথ্যে সমস্যার ক্ষেত্র থেকে : তা হল, উত্থাপনের সমস্ত নকল রূপগুলিতে, উপাদান এবং সম্পর্কগুলির বিকৃতি, এবং সাধারণের সঙ্গে স্বতন্ত্র–র গুলিয়ে যাওয়া। এইজন্য ইতিহাস যতটা অর্থবহ এবং বোধের প্রক্রিয়া, ততটাই অ–বোধ এবং বোকামির পথ। যখন সচেতনতার স্বভাব হল মিথ্যে হওয়া, সমস্যা তার চরিত্র দিয়ে সচেতনতাকে এড়াতে পারে। মূল্যর স্বীকৃতির সাপেক্ষে, সামাজিক সচেতনতার স্বাভাবিক বিষয় বা সাধারণ বোধ হল রতি। সামাজিক সমস্যাগুলি আয়ত্ত্ব হতে পারে কেবল একটি 'শুদ্ধিকরণ'এর

মাধ্যমে, যা ঘটে, যখন সামাজিকতার বিশেষজ্ঞতা উত্থিত হয় তার তুরীয় অনুশীলন–এ এবং ভেঙে ফেলে রতীয় সাধারণ বোধের একত্ব–কে। সামাজিক সক্ষমতার কার্যদক্ষতার তুরীয় বিষয় হল বিপ্লব। এই ভাবে দেখলে, বিপ্লব হল ফারাকের সামাজিক ক্ষমতা, সমাজের কূটাভাস, সামাজিক আইডিয়ার বিশেষ রোষ। বিপ্লব কখনও নেতিবাচকতা দিয়ে এগোয় না। আমরা নেতিবাচকের প্রথম নির্ধারণ করতেই পারতাম না, সমস্যার এক ছায়া হিসেবে, দ্বিতীয় নির্ধারণে পতিত না হয়ে : নেতিবাচক হল মিথ্যে সমস্যার বাস্তব ক্ষেত্র, রতির মূর্ত রূপ। নেতিবাচক হল একইসাথে সমস্যার ছায়া এবং এক চমৎকার মিথ্যে সমস্যার ছায়া। বাস্তব সংগ্রাম কখনও এগোয় না নেতিবাচক পথে বরং সে এগোয় ফারাকের পথে এবং তার উত্থাপনের ক্ষমতায়, এবং সঠিকতার যুদ্ধ সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে জয় করায়, অর্থাৎ সমস্যাগুলিকে তাদের সত্যের কাছে পুনস্থাপিত করে নির্ধারণ করায়, সচেতনতার উপস্থাপনা এবং নেতিবাচকের রূপগুলি ছাপিয়ে গিয়ে সেই সত্যকে মূল্যায়নের মাধ্যমে, এবং সবশেষে, বাধ্যতাগুলির সঙ্গে সংযোজিত হয়ে যাদের ওপর তারা নির্ভর করে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (আইডিয়া ও ফারাকের সংশ্লেষ), ইংপৃ ২০৭–৮

স্ববিরোধ

হেগেলের দর্শন মোতাবেক — স্ববিরোধই হলো আভ্যন্তরীন গতিশীলতা। তাই হেগেলের দর্শন হলো স্ববিরোধের দৃষ্টিকোণ। স্ববিরোধই মৌলিক। এই স্ববিরোধের দর্শনের সমালোচনায় দেল্যুজের ফারাকের দর্শন কি বলছে?

... নীৎশে যেমন বলেছিলেন, ইতিবাচকতা–ই হলো প্রাথমিক। সে ফারাকের প্রত্যয়ী ঘোষণা করে। এবং নেতি হলো একটি ফলাফল মাত্র। একটি প্রতিচ্ছবি যার মধ্যে ইতিবাচকতা তীব্রতর হয়। তাই সত্যিকারের বিপ্লবগুলোতে একটা উৎসবের আবহাওয়াও থাকে। স্ববিরোধ সর্বহারার অস্ত্র নয়। বরং তা বুর্জোয়ার আত্মরক্ষার এবং টিঁকে থাকার কায়দা, তা এক আড়াল যার পেছনে থেকে বুর্জোয়া সমস্যাগুলো নির্ধারণ করার হক–টা বজায় রাখে। স্ববিরোধগুলির 'মীমাংসা' হয় না, সেগুলিকে বিলীন করে দেওয়া হয় সমস্যাগুলিকে কবজা করার মাধ্যমে, যে সমস্যাগুলি কেবল ছায়া ফেলে স্ববিরোধে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (উপসংহার), ইংপৃ ২৬৮

হেগেল মনে করতেন, স্ববিরোধ হলো ফারাক–এর সর্বোচ্চ বিকশিত রূপ।

... আরও নির্দিষ্ট করে বললে, যখন বাস্তবতার ফারাক বিবেচনার মধ্যে আনা হয়, তা ফারাক থেকে বৈপরীত্যে বিকশিত হয়, তা থেকে বিকশিত হয় স্ববিরোধে। এইভাবে শেষ অবধি সমস্ত বাস্তবতার যোগফল হয়ে দাঁড়ায় তার নিজের মধ্যের স্ববিরোধে।

হেগেলের উক্তি, দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (ফারাক নিজের মধ্যেই), ইংপৃ ৪৪

হেগেলের ধারনায়, ফারাক হলো আসলে বিরোধিতা। কিন্তু বিরোধিতা আবছা থাকে যতক্ষণ না এটিকে অসীমে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। আবার সসীম বিরোধিতার বাইরে তাকে স্থাপনা করা হলেই অসীম আবছা হয়ে যায়। অসীম এখানে হাজির হওয়ার ফলস্বরূপ বিপরীতগুলি মিল পায়, অথবা অন্যের বিপরীতকে স্ব-এর বিপরীত বানিয়ে তোলে। অসীমে স্ববিরোধিতা কেবল অন্তর্বতীর চলমানতাকেই বোঝায়। এই চলমানতায় স্ববিরোধিতা অন্য-কে বহিষ্কার করে, এরই মধ্যে দিয়ে সে নিজেকেই বহিষ্কার করে এবং অন্য যাকে বহিষ্কার করা হলো — তা হয়ে ওঠে। দ্বন্দ্বের এই চলমানতার মধ্যে ঢুকে পড়ে অসীমের সত্যিকারের দপদপানি, বাহ্যিকতার চলমানতা। এবার আর বিরোধিতা মানে সরলভাবে হাঁধর্মী আর নাধর্মী বললে চলবে না। এখানে নাধর্মী মানে দাঁড়াচ্ছে দুটোই — হাঁধর্মী যখন বাতিল করা হচ্ছে তখন সে হাঁধর্মী হয়ে উঠছে, এবং হাঁধর্মীর ফিরে আসা যখন সে নিজেই নিজেকে বাতিল করেছে। প্রতিটি বৈপরীত্যকেই যদি হাঁধর্মী এবং নাধর্মী দিয়ে চিহ্নিত করা হয় তাহলে তা তো এরই মধ্যে স্ববিরোধ। 'কিন্তু স্ববিরোধে হাঁধর্মী কেবল অন্তর্নিহিত, যেখানে নাধর্মী হলো স্থাপিত স্ববিরোধ ...।' এই স্ববিরোধের স্থাপনার মধ্যেই ফারাক তার জায়গা খুঁজে পায়। তুমি স্ববিরোধ বজায় রাখতে বা চাগিয়ে তুলতে পারছো কি না তার পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই না বোঝা যাবে তুমি ফারাক 'করছ' কিনা। এভাবেই ফারাক-কে ঠেলে দেওয়া হলো তার মৃত্যুর দিকে।

এই অসীমের মধ্যেই আছে অভেদ। অসীম প্রতিনিধিত্ব তো একটা ভিত্তিভূমি। তা সে অসীম ক্ষুদ্র বা অসীম বৃহৎ যাই হোক না কেন। প্রতিনিধিত্বের সেই ভিত্তিভূমি বা পর্যাপ্ত যুক্তি অসীমকে হাতিয়ার বানিয়ে অভিন্নকে তার ওই অভিন্নতাতেই বিরাজ করার দিকে নিয়ে যায়। নিজ অস্তিত্বের চেয়েও বেশি করে তুমি সামগ্রিকতার সঙ্গে সমবিস্তৃত।

হেগেলিয়ান স্ববিরোধ সত্ত্বা বা অ-স্ববিরোধকে অস্বীকার করে না। বিপরীতে সে অস্তিত্বের মধ্যে অ-স্ববিরোধকে দ্বৈত নাকচের মাধ্যমে ওই পরিস্থিতিতে

অভেদের উপস্থিতিই পর্যাপ্ত ভাবনা রূপে হাজির করে। 'বস্তু যা নয় তাকে অস্বীকার করে' বা 'বস্তু যা নয় তা থেকে নিজেকে পৃথক করে' এই সব কথার সূত্রগুলি যৌক্তিক দৈত্য, যা অভেদের পক্ষে কাজ করে (বস্তু বাদে বাকি সব এক)। বলা হয়, ফারাক হলো নেতি, একে সীমার কাছাকাছি নিয়ে গেলে এটা স্ববিরোধের বিন্দুতে পৌঁছতে বাধ্য। এটা তখনই সত্য যখন অভেদের পেতে রাখা পথে ফারাককে ফেলে দেওয়া হয়। যদি সত্ত্বা তাকে ওই জায়গায় ঠেলে দেয়। ফারাক হল ভূমি, কিন্তু অভিন্নতার প্রদর্শনীর জায়গা হিসেবে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (ফারাক নিজের মধ্যেই), ইংপৃ ৪৯–৫০

কিন্তু বিরোধ হলো ওপরের ব্যাপার।

পরিসর এবং সময় কেবল উপরিতলের বৈপরীত্যকে (এবং সীমাবদ্ধতাকে) দেখায়। কিন্তু তাদের সত্যিকারের গভীরতায় তো রয়েছে অনেক বড়ো, সুদৃঢ় এবং বিস্তৃত ফারাক যাকে নেতি–র ছকে ফেলা যায় না। যেন লুইস ক্যারলের আয়না যাতে সবকিছুই উল্টো এবং উল্টানো লাগে আপাতদৃষ্টিতে, কিন্তু গভীরে গেলে বোঝা যায়, তারা 'পৃথক'।

আমরা দেখবো, এটা সমস্ত পরিসরেই একই রকম : জ্যামিতিক, ভৌতিক, জৈব, সামাজিক, এবং ভাষাতাত্ত্বিক (এই প্রসঙ্গে ক্রবেজকয়–এর ঘোষণাকে কতটা অসত্য বলে মনে হয় : 'ফারাকের আইডিয়ার প্রাকশর্ত হলো বিরোধিতার আইডিয়া')।

সংঘাতকে মনে হয় গভীর, কিন্তু তা মিথ্যে। সংঘাতের গভীরে আছে ফারাকের খেলার আঙিনা। নেতি হলো ফারাকের প্রতিকৃতি, কিন্তু তা চ্যাপটানো এবং উলটানো প্রতিকৃতি। বলদের চোখ যেভাবে মোমবাতি দেখে — এ কি এক নিষ্ফলা লড়াই–এর স্বপ্ন দেখা দ্বন্দ্ববাদীর চোখ?

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (ফারাক নিজের মধ্যেই), ইংপৃ ৫০–৫১

ফারাকের পূর্বশর্ত বিরোধিতা নয়, বিরোধিতার পূর্বশর্ত হলো ফারাক। এবং বিরোধিতা ফারাককে একটি ভিত্তির ওপর টেনে এনে ফেলে দিয়ে তার সাথে বেইমানি করে, তাকে বিকৃত করে। আমাদের দাবি হলো, ফারাক নিজের মধ্যে 'থাকা' স্ববিরোধ তো নয়ই, এমনকি একে কখনোই স্ববিরোধে নিয়ে গিয়ে ফেলা যায় না, কারণ স্ববিরোধ ফারাকের চেয়ে বড়ো নয়, ছোটো। ...

কোন শর্তে ফারাককে চ্যাপ্টা পরিসরে ফেলা যায়? ঠিক যখন তাকে বাধ্য করা হয় পূর্বে স্থাপিত কোনো সত্ত্বার মধ্যে ঢুকতে, যখন তাকে সত্ত্বার নতিতে বসানো হয় যা তার মধ্যে বা বাসনায় সত্ত্বাকে ফুটিয়ে তোলে এবং তাকে সেখানে নিয়ে যেখানে সত্ত্বা তাকে যেতে বলে — অর্থাৎ, নেতিতে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (ফারাক নিজের মধ্যেই), ইংপৃ ৫১

এভাবে হেগেলিয়ান স্ববিরোধ যেন ফারাককে তার সীমায় পৌঁছে দিচ্ছে বলে মনে হয়। কিন্তু এই পথে তো রাস্তা শেষ, আর তাই সেই পথ ফারাককে ফিরিয়ে আনে সত্ত্বায়। সত্ত্বাকে বানিয়ে তোলে ফারাকের থাকার এবং ফারাকের কথা ভাবার পর্যাপ্ত শর্ত। কেবলমাত্র সত্ত্বার সঙ্গে সম্পর্কিত হিসেবে, সত্ত্বার একটি অপেক্ষক হিসেবে দেখলেই স্ববিরোধ হলো সর্বোত্তম ফারাক। নেশা আর বুঁদ হয়ে থাকা তো হলো ভান; অস্পষ্টতাকে বিশদে স্পষ্ট ধরে দেওয়া হয়েছে আগেই। হেগেলিয়ান দ্বান্দ্বিকতা নীরস এককেন্দ্রীক বৃত্তে এটা সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (উপসংহার), ইংপৃ ২৬৩

প্রকাশ্য ও অন্তর্লীন

গভীরের কথা

আমি এবং স্ব ছাড়াও মনোজগতে থাকে 'অন্য', অন্য মানে হল বাইরের দুনিয়া, যা ব্যক্তির ওপর প্রভাব ফেলে। মানুষ কখনও নিজেকে বিসর্জন দিয়ে ওই 'অন্য' দ্বারা চালিত হয়। আবার কখনও ওই 'অন্য' কে একেবারে বস্তু বানিয়ে দেয়, বিষয় বানিয়ে দেয়, নিজেই থাকে যন্ত্রী। তাই কি? তাই কি হয়? দেল্যুজ তার 'ফারাক ও পুনরাবৃত্তি' বইয়ের শেষের দিকে লিখছেন,

মনোজাগতিক ব্যবস্থায় উদ্ভাসিত হবার প্রক্রিয়ায় দ্যোতনার মূল্য থাকবেই। অন্যভাবে বললে আচ্ছাদন–এর কেন্দ্রগুলি থাকবেই যেগুলি সাক্ষ্য দেয় ব্যক্তিকরণের উপাদানগুলির উপস্থিতিতে। এই কেন্দ্রগুলি 'আমি' অথবা 'স্ব' দিয়ে পরিষ্কারভাবে তৈরি নয়। বরং তৈরি আমি–স্ব এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি কাঠামো দিয়ে। এই কাঠামো–কে চিহ্নিত করা উচিত 'অন্য' বলে। এটা নির্দেশ করে কেবল নিজের দিকে, অন্য 'আমি'র জন্য; এবং নির্দেশ করে অন্য 'আমি'–কে, নিজের জন্য। তত্ত্বগুলি দুলতে চায় ভুলভাবে এবং না থেমে, একটি মেরু, যেখানে 'অন্য' সংকুচিত হয়ে বিষয় হয়ে যায়, সেখান থেকে আরেক মেরুতে যেখানে 'অন্য' একেবারে বিষয়ী হয়ে যায়। এমনকি সার্ত্র পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এই দোলা–কে অন্য–র মধ্যে সঞ্চারিত করে, এটা দেখিয়ে যে, অন্য হয়ে যায় বিষয় যখন আমি হয়ে যায় বিষয়ী এবং ততক্ষণ অবদি তা বিষয়ী হতে পারে না যতক্ষণ না আমি বিষয়–এ পরিণত হচ্ছে। ফলতঃ

অন্য–র কাঠামো, এবং একইসাথে মনোজাগতিক ব্যবস্থায় এর ভূমিকা, তার ভুলবোঝাবুঝি থেকে যায়। অন্য, যে কিনা কেউ নয়, কিন্তু যে অন্য–র কাছে স্ব এবং স্ব–এর কাছে অন্য, দুটি ব্যবস্থায়; সেই স্বতলব্ধ 'অন্য' সংজ্ঞায়িত হয় প্রতিটি ব্যবস্থায় তার প্রকাশ্য মূল্য দিয়ে — অন্য ভাবে বললে, তার নিহিত এবং আচ্ছাদনকারী মূল্য দিয়ে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (বোধগম্য–র অপ্রতিসম সংশ্লেষ), ইংপৃ ২৫৯–৬০

দেল্যুজ এখানে উদাহরনের শরণাপন্ন হন,

একটা ভয়ার্ত মুখের কথা ভাবি, শর্ত হল আমি সেই ভয়ের কারণটা দেখিওনি উপলব্ধিও করিনি। এই মুখ প্রকাশ করে একটি সাম্ভাব্য দুনিয়া : ভীতিপ্রদ দুনিয়া। 'প্রকাশ' বলতে আমরা মানে করি, যেমন সর্বদা করা হয়, ওই সম্পর্ক যাতে একটা মোচড় আছে এক প্রকাশক এবং এক প্রকাশিত–র মধ্যে; যেভাবে প্রকাশিত–র প্রকাশকের চেয়ে আলাদা কোনো অস্তিত্বই নেই, যদিও প্রকাশক তার সঙ্গে সম্পর্কিত হয় যেন সে সম্পূর্ণ পৃথক কারোর সঙ্গে হচ্ছে। 'সাম্ভাব্য' বলতে আমরা তাই বোঝাই না কোনো মিল–কে, আমরা বোঝাই অন্তর্নিহিত হয়ে থাকা বা ঢেকে থাকা অবস্থাকে যা তাকে ঢেকে রাখছে তার সাথে অত্যন্ত অমিল সহ : ভয়ার্ত মুখ কিন্তু যা তাকে ভয় দেখাল তার সাথে মেলে না, ভয়ার্ত মুখ মোড়ক দিয়ে রাখে একটা ভীতিপ্রদ দুনিয়ার অবস্থাকে। প্রতিটি মনোজাগতিক ব্যবস্থায় থাকে বাস্তবতাকে ঘিরে এক ঝাঁক সম্ভবনা, কিন্তু আমাদের সাম্ভাব্যগুলি সর্বদা 'অন্য'রা। 'অন্য' আলাদা থাকতে পারে না সেই প্রকাশ্যতা থেকে যা তাকে গঠন করে। এমনকি যখন আমরা বিবেচনা করি অন্য কারো শরীরকে একটি বিষয় হিসেবে, তাদের কানগুলি এবং চোখগুলিকে শরীরবিদ্যার টুকরো হিসেবে, আমরা তাদের সমস্ত প্রকাশ্যতাকে বাদ দিই না, যদিও আমরা চরম সরলীকরণ করি সেই দুনিয়াকে যা তারা প্রকাশ করছে : চোখ হল একটা আলোর দ্যোতক বা সাম্ভাব্য আলোর প্রকাশনা, আর কান হল সাম্ভাব্য শব্দের।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (বোধগম্য–র অপ্রতিসম সংশ্লেষ), ইংপৃ ২৬০

'অন্য' কিন্তু কোনো বাস্তব কিছু নয়। তার কোনো নিজস্ব অস্তিত্ব নেই, আমার মাধ্যমে প্রকাশ ছাড়া। অন্য কেবল একটা প্রকাশ। অপ্রকাশিত কোনো কিছু নয়। যা আমার দ্বারা প্রকাশিত, সেটাই অন্য। অন্য হল আমি যা প্রকাশ করি তাই।

মূর্তভাবে, যদিও, যাদের বলা হয় গৌণ গুণ, সেগুলি হল — যেগুলির অস্তিত্বের রূপ প্রথমে মোড়ক দিয়ে রাখে অন্য। 'আমি' এবং 'স্ব', অন্যদিকে, আশু চরিত্রায়িত হয় বিকাশ বা উদ্ভাসনের কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে : তারা সাধারণভাবে তাদের ব্যবস্থার বহিরঙ্গে বিকশিত হয়ে যাওয়া গুণগুলির অভিজ্ঞতা পায়, তাই শুধু নয়; বরং তারা উদ্ভাসন করতে চায় বা বিকশিত করতে চায় অন্যের দ্বারা প্রকাশিত দুনিয়াকে, হয় তাতে অংশ নেবার জন্য বা তাকে অস্বীকার করার জন্য ('আমি' উন্মোচন করে অন্যের ভয়ার্ত মুখকে, 'আমি' হয় বিকাশ করে তাকে একটি ভীতিপ্রদ দুনিয়ায় যার বাস্তবতা আমাকে করায়ত্ত্ব করে ফেলেছে, বা 'আমি' খারিজ করে এর অবাস্তবতাকে)। যদিও, বিকাশের এই সম্পর্কগুলি, যেগুলি তৈরি করে আমাদের সাধারণত্বগুলিকে, এবং একইসাথে আমাদের অন্য-র সাথে অনৈক্যগুলিকেও, এই সম্পর্কগুলি নিজের কাঠামোকেও দ্রবীভূত করে দেয় এবং তাকে একটা বিষয়ের স্তরে নিয়ে আসে বা বিষয়ীর স্তরে নিয়ে আসে। সে কারণেই, এই অন্যকে করায়ত্ত্ব করার চেষ্টায়, আমরা চেয়েছিলাম ঠিকভাবেই জোর দিতে অভিজ্ঞতার বিশেষ অবস্থাগুলির ওপর, তা যতই নকল হোক, — যেমন, সেই মুহূর্ত, যখন, প্রকাশিত-র কোনো অস্তিত্ব নেই (আমাদের কাছে) যা তাকে প্রকাশ করছে তাকে ছাড়া : 'অন্য' একটা সাম্ভাব্য দুনিয়ার প্রকাশ।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (বোধগম্য-র অপ্রতিসম সংশ্লেষ), ইংপৃ ২৬০-৬১

তাহলে কি আমি বা স্ব-এর নিজস্ব কোনো প্রকাশ নেই। দেল্যুজ বলছেন, না নেই। প্রকাশ মানেই অন্য।

আমি-স্ব এর মনজাগতিক ব্যবস্থায়, 'অন্য' কাজ করে একটা জড়ানোর, মোড়ক দেওয়ার বা দ্যোতনার কেন্দ্র হিসেবে। ব্যক্তিকরণের উপাদানগুলির প্রতিনিধিত্বকারী এগুলো। তার ওপর, যদি একটা জীবকে ধরা যেতে পারে একটা আণুবীক্ষণিক বা মাইক্রোস্কোপিক অস্তিত্ব হিসেবে, তাহলে আরো কতখানি এটা খাটে 'অন্য' সম্পর্কে, মনোজাগতিক ব্যবস্থায়। এটা এনট্রপির স্থানীয় বৃদ্ধিকে সেখানে তুলে ধরে, যেখানে স্ব-এর দ্বারা অন্যের উদ্ভাসন বোঝায় আইনসম্মত একটি অবমাননা। যে নিয়মটি আগে তুলে ধরা হল — বেশি উদ্ভাসিত হওয়া যাবে না — এর মানে হল, সর্বোপরি, নিজেকে বেশি উদ্ভাসন করা যাবে না অন্য-র সঙ্গে; এর মানে এই নয় যে তার মাধ্যমে অন্যকে অনেকটা বেশি উদ্ভাসন করা যাতে যায় সে

জন্য; বরং নিজের নিহিত মূল্যকে সুরক্ষিত রাখা এবং নিজের নিজস্ব বিশ্বকে বহুগুণায়ত করা, তাকে ঐ সমস্ত প্রকাশিত–গুলো দিয়ে ভরিয়ে দিয়ে, যেগুলির প্রকাশগুলি ছাড়া আর কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ, ওই অন্য–টা আরেকজন আমি নয়, বরং আমি–ই হল অন্য, একটি ভাঙা আমি। এমন কোনো ভালোবাসা নেই যা শুরু হয় একটি সাম্ভাব্য দুনিয়ার উন্মোচন ছাড়া, অন্য–তে উন্মুক্ত হয় যা এই ভালোবাসাকে প্রকাশ করে। আলবের্টাইনের মুখ প্রকাশ করেছিল তটভূমি এবং ঢেউ–এর মিশ্রণকে : 'কী সেই অজানা দুনিয়া যেখান থেকে সে আমায় চিনে নিল?' উদাহরণ দেবার মতো ভালোবাসার পুরো ইতিহাসটাই হল আলবার্টাইনের প্রকাশিত সাম্ভাব্য দুনিয়াগুলির লম্বা উদ্ভাসন, যা তাকে বদলে নেয় একটি চমৎকার বিষয়ীতে, একটি প্রতারণাপূর্ণ বিষয়ীতে।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (বোধগম্য–র অপ্রতিসম সংশ্লেষ), ইংপৃ ২৬১

এখানে দেল্যুজ মার্সেল প্রাউস্টের 'হারানো সময়ের খোঁজে' বইয়ের চরিত্র থেকে উদাহরণ টানছেন। অ্যালবের্টাইন একজন এরোটোম্যানিয়াক। অর্থাৎ, যে নানা চিহ্নের মধ্যে তার কামনার ব্যক্তি যে, যাকে সে পাবে না কোনো বাস্তব প্রতিবন্ধকতার কারণে, তার প্রেমের আহ্বানের ইঙ্গিত দেখতে পায় ভুলবশতঃ।

ভাষার কাজ হল অন্য–কে বাস্তবতা প্রদান করা।

এটা সত্যি যে অন্য বাতলে দেয় সাম্ভাব্যগুলিকে ভূষিত করার একটা উপায়, যেগুলো সে প্রকাশ করে বাস্তবে, আমরা তাদের যে বিকাশের মধ্যে ঠেলে দিই, তার থেকে স্বাধীনভাবে। এই উপায় হল ভাষা। অন্য–র বলা শব্দগুলি সাম্ভাব্য–কে যেন বাস্তবতা প্রদান করে; যেখান থেকে বলা যায় যে, ভাষার মধ্যেই খচিত আছে মিথ্যের ভিত্তি। দ্যোতনার মূল্য বা আচ্ছাদনের কেন্দ্রগুলির থাকার ফলাফল হিসেবে ভাষার এই ভূমিকা, তা তাকে সরবরাহ করে নিজেদের ক্ষমতাসমূহ, আভ্যন্তরীন অনুনাদ ব্যবস্থার মধ্যে। অন্য–র কাঠামো এবং সংশ্লিষ্ঠ ভাষার কার্যকলাপ কার্যত বোঝায় নৌমেনন–এর আভাস, অভিব্যক্তিপূর্ণ মূল্যের দৃশ্যমান হওয়া — সংক্ষেপে, ফারাক–এর অন্তর্গতকরণের দিকে ঝোঁক।

দেল্যুজ, ফারাক ও পুনরাবৃত্তি (বোধগম্য–র অপ্রতিসম সংশ্লেষ), ইংপৃ ২৬১

প্রকাশ সবসময়ই মোড়ক। তাই প্রকাশ সবসময়ই মোড়কে ঢাকা। প্রকাশ সবসময়ই অন্য। সে আমি বা স্ব নয়। যা অপ্রকাশিত, তাই ফারাক, তা

সবসময়ই অন্তর্নিহিত, রূপ হীন। নৌমেনন হল ফেনোমেনন এর উল্টো। ফেনোমেনোন মানে হল যা প্রকাশ্য। আর নৌমেনন হল, যা কখনোই প্রকাশিত হয় না (কান্ট)।

টিপ্পনি : সমতার পক্ষে সবাই দাঁড়াবে?

শস, ফেবুপোস্ট, ২৮ নভেম্বর ২০১৯

সবাই সমতার পক্ষে দাঁড়াবে কেন? পরিবেশের পক্ষেই বা দাঁড়াবে কেন? কীভাবে ঠিক হল যে এগুলো ভালো? আমরা নিরপেক্ষভাবে দেখব কী করে? এরকম একটা প্রশ্ন করেছে সৌ আমায় হোয়াটসঅ্যাপে, আমি বললাম, উত্তরটা পাবলিকলি দেব।

সমতা সবার জন্য ভালো নয়। অসমতার পৃথিবীতে যে রসে বসে আছে, বা যার কোনো ভালনারেবিলিটি নেই বা ক্ষমতাহীনতা নেই — সে সমতার বিপক্ষে। তার জন্য সমতা ভালো নয়। বাকিদের জন্য সমতা ভালো, আবার ভালো নয়ও।

প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া যাক। মানুষ কিন্তু ব্যক্তি, আবার ব্যক্তি নয়ও। সমতার ধারনা মানুষকে ব্যক্তি হিসেবে দেখে না। বলা ভালো, ওই অবদি ঢোকে না। ব্যক্তি মানুষ যেহেতু মনুষ্য সমাজের বাসিন্দা, তাই ব্যক্তি মানুষ সমাজের সামনে দাঁড়ায় কিন্তু শুধু মানুষ হিসেবে নয়, তার সঙ্গে অন্যান্য অনুষঙ্গ লেগে থাকে। সেই অনুষঙ্গগুলি হল লিঙ্গ, জাতি, জাত, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকসময় এগুলোকে ছাপিয়ে যায় সেই ব্যক্তির নিজের তৈরি করা পরিচয় — যেমন সাইক্লিস্ট। যেমন অ্যাকটিভিস্ট। যেমন ...। এই অনুষঙ্গগুলি কিন্তু তৈরি হয় মানুষ সামাজিক, সে কারণেই। একটা কথা আছে, পহলে দেখনদারি, তার পর গুণবিচারি। কথাটি যদি ভাঙা যায়, তাহলে যেটা দাঁড়ায় তা হল — ভালো করে আলাপ জমিয়ে একজন ব্যক্তিকে আরেকজন ব্যক্তি মানুষ হিসেবে (বিভিন্ন মানবিক গুণাবলীর বিচার করে) বুঝে ওঠার আগেই দেখা ও শোনার মাধ্যমে একটা ধারনা তৈরি হয়ে যায় এবং সেই দেখা ও শোনার মাধ্যমে যে ধারনাটা তৈরি হয় তা ওই পূর্বে বলা অনুষঙ্গগুলির কোনো না কোনো খোপে পড়ে যায়, অথবা ব্যক্তির নিজের তৈরি করা পরিচয়। ফলতঃ, সামাজিক মানুষ বা জাগতিক মানুষ নানা পরিচয়ে পরিচিত হয়। এবং এই পরিচয়ের ওপর দাঁড়িয়েই তৈরি হয় তার ভালনারেবিলিটি বা ক্ষমতাহীনতা। এবং সে সেটা বুঝেও যায়। এটাই সামাজিকতা। সমতার ইস্তাহারটি এভাবেই বানানো হয়েছে, যাতে তা ব্যক্তি মানুষের এই সামাজিক ক্ষমতাহীনতার জায়গাটিতে আবেদন রাখতে পারে।

আবার এই পরিচয়ের কারণেই কিন্তু সামাজিকভাবে ক্ষমতাহীনতা নেই এরকম মানুষকেও চেনা যায়। ডমিনান্ট বা চালু ক্ষমতার সঙ্গে সবচেয়ে সাযুজ্যপূর্ণ মডেলের মধ্যে যে আছে। যেমন, আমাদের ভারতবর্ষে এখন ধরো — "পুরুষ – উঁচুজাতেরহিন্দু – সম্পদশালী – প্রশাসনিকচাকুরিরত – হিন্দিভাষী – ইংরেজিজানা – হেটেরোসেক্সুয়াল – বিবাহিত – পুরুষসন্তানধারী – মেট্রোশহরবাসী – বাড়িগাড়িধারী – গৌরবর্ণ" — এইরকম একটা মডেল যদি কল্পনা করা যায়, তাতে যে খাপ খাচ্ছে — তার প্রায় কোনো ক্ষমতাহীনতা নেই।

এবার এর মধ্যে যে কিছুটা পরে কিছুটা পরে না তারও কিন্তু ক্ষমতাহীনতার কোনো না কোনো অক্ষ আছে। তাই তার কাছে সমতার ধারনা ভালো, আবার ভালো নয়ও। সমতা একইসাথে তার স্বস্তি ও অস্বস্তি। সমতা একইসাথে তার শক্তি এবং দুর্বলতা। সব মিলিয়ে সমতা তার কাছে ডিসটার্বিং।

একটা এখন কথা খুব উঠেছে। ইন্টারসেকশনালিটি। অর্থাৎ যদি এই সমস্ত ক্ষমতাহীনতার অক্ষের বেশিরভাগে যে ক্ষমতাহীন — তাকে সোসাল সাবজেক্ট বা সামাজিক বিষয়ী হিসেবে কল্পনা করে কোনো ধারনা বানানো যায়। খানিকটা কিছু বছর আগের ওই সাব–অল্টার্নের ধারনার মতো। আমার মতে, ওই 'আইডিয়াল' বিষয়ীর চেয়ে খুঁত থাকা বিষয়ীর স্বস্তি ও অস্বস্তি–র ওপর দাঁড় করানো সমতার ধারনা অনেক বেশি জাগতিক।

আমরা যখন ইস্তাহারে বলছি সমতার লক্ষ্যর কথা, তখন কিন্তু আমরা আমাদের সমাজকে একভাবে সমস্যায়িত–ই করছি মাত্র। অর্থাৎ সমতা হল – সামাজিক পরিচয়গুলির ওপরে দাঁড়িয়ে থেকে, চালু যে মানবোন্নয়নগুলির সূচক — সেখানকার ফারাকের কথা, যে ফারাকটিকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে বা অসমতাকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে আমরা সমতার ধারনাটি দিচ্ছি। সমতা হল বর্তমানের সামাজিক আক্ষেপ। কোনো সর্বরোগহর দাওয়াই নয়, সমাধান নয়, বা পরম কোনো লক্ষ্য নয়। তবে হ্যাঁ, সমতার আদর্শ তৈরির মাধ্যমে আমরা 'সর্বরোগহর দাওয়াই, পরম কোনো লক্ষ্য, সমাধান' ইত্যাদি পরম ধারনাগুলির বদলে এক জাগতিক ও সমসাময়িক সামাজিক আক্ষেপকে আদর্শ হিসেবে নেবার কথা বলছি, কোনো পরম বা আলটিমেট লক্ষ্যকে আদর্শ হিসেবে নেবার বদলে। এবং সেই আদর্শ কোনোভাবেই মানুষের আভ্যন্তরীন মানবিক গুণাবলীর ওপর দাঁড়িয়ে নেই (সততা, নিষ্ঠা, সমবেদনা ইত্যাদি থেকে শুরু করে বাসনা, শ্রম), বরং, সামাজিক পরিচয়ের বহিরঙ্গের ওপর দাঁড়িয়ে এবং বিদ্বেষের কানাগলির বদলে সহিষ্ণুতার আড়প্রসারী চোরাগলি বরাবর। কেন মানুষের আভ্যন্তরীন মানবিক গুণাবলীর ওপর না দাঁড়িয়ে সামাজিক পরিচয়ের বহিরঙ্গের ওপর দাঁড়ানো? মানুষের আভ্যন্তরীন

রক্তক্ষরণ এড়িয়ে পথ চলার জন্য। চলার পথে আমার বহিরঙ্গের পরিচয় ছিন্নভিন্ন হলে হোক, সেগুলো তো আমার সব না, আভ্যন্তরীন মানবিক গুণাবলীগুলি বেঁচে যায় যেন।

পরিবেশের ব্যাপারটা নিয়ে পরে কোনোদিন বলা যাবে।

কিছু শব্দের ইংরেজি*

(অ)স্তিত্ব : Being
অ-প্রকৃত : non-actuel
অ-বোধ : non-sense
অগোচর : imperceptible
অদ্বিতীয় : unique
অন-অস্তিত্ব : non-being
অনন্য : unique
অনন্য : singular
অনন্যকগুলি : singularities
অনন্যতা : singularity
অনস্তিত্ব : fr. Non-etre
অনির্ধারিত : indeterminate
অনুজ্ঞা : imperative
অনুভব : sense
অনুভবযোগ্য : sensible
অনুরূপ : analogue
অনুরূপতা : analogy
অন্তর্নিহিত : implicit
অন্তর্লীন : immanence
অন্তঃসার : essence
অপসরণ : divergence
অবগতি : connaissance
অবিভাজিত : individual
অভিন্নতা : indifference
অভিব্যক্তিপূর্ণ : expressive
আড়প্রসারতা : transductivity
আড়প্রসারী : transductive
অভেদ : identity
অলীক : virtual
অলীক : mythical
অলীকত্ব : virtuality
অলৌকিক : transcendence
অসদৃশ : disparates
অস্তিত্ব : being
অস্তিত্বজনন : ontogenesis
অস্তিত্ববিদ্যা : ontology
আকস্মিকতা : accident
আচ্ছাদন : envelopement
আচ্ছাদিত : enveloping
আটপৌরে : ordinary
আত্ম : self
আত্মবাচক : reflexive
আত্মবাচকতা : reflexivity
আদর্শগুলি : normes
আদর্শমান : normativity
আধিভৌতিক : metaphysical
আধ্যাত্মিক : spiritual
আন্দাজ : intuition
আপেক্ষায়িত : relativised
আবির্ভাব : incarnation
আবেগোদ্রেক : emotivity
আভ্যন্তরীনতা : interiority
আমি বা আমরা : fr. Me / on
আংশিকী : partitive
আড়ব্যক্তিগত : transindividual
আড়ব্যক্তিত্ব : transindividuality
আসলকরণ : actualisation
ইতিবাচকতা : affirmation
উঁচুনিচুভাব : hierarchy
উঠে আসে : emanate
উৎকেন্দ্রিক : excentric
উত্থাপন : affirmation
উদ্দেশ্যমূলক : teleologic
উদ্বেগ : anxiety
উদ্ভাসিত : explicated
উদ্ভুত : derived
উন্মুক্ত : fr. ecarter
উপমা : analogy

উপরিপাত : superpose
উপরিস্থাপিত : superimpose
উপস্থাপনা : representation
এক : unity
একতা : unity
একত্ব : identity
একরূপতা : uniformity
একার্থতা : univocity
কথা বলা : act of speech
কর্মশক্তি : faculty
কার্যদক্ষতা : faculty
কারক : agent
ক্রম : order
ক্রিয়াকলাপ : function
ক্ষমতার সংকল্প : will to power
খামতি : privation
গণ : genus
গণগত ফারাক : generic difference
গতিধারা : movement
গোঁয়াড়ে : dogmatic
গৌণ : tertiary
চলতে শুরু করে : fr. parcourir
চিন্তা করা : thinking
চিরন্তন ফেরা : eternal return
চিহ্নায়ন : signification
চিহ্নায়িত : significating
চেনা যাওয়া : recognition
ছাঁদা : design
জগত : world
জগৎবাদ : empiricism
জনন : genesis
জননীয় : genetic
জাগতিক : empirical
জীববৃত্তীয় : biologic
জীয়ন : vital
তর্কাতীত : apodictic
তীব্রতা : intensity
তুরীয় : transcendental
তুরীয় : transcendental
তুলে ধরা : affirm
তুল্যতা : fr. analogique
থাকা : fr. avoir
দশা : phase
দ্বন্দ্ব : dialectic
দ্ব্যর্থতা : equivocity
দ্ব্যর্থবোধক : ambivalent
দ্যোতনা : implication
ধারন : retention
নাধর্মী : negative
নিজস্ব : personal
নিদানমূলক : decisive
নির্দিষ্ট ফারাক : specific difference
নির্যাস : essence
নিহিত : implicit
নীতিবাদী : moralising
নেতি–ও : negation
নেতিবাচক : negative
পথ : locus
পরকরণ : alienation
পরম বিষয়বস্তুবাদ : substantialism
পরিপার্শ্ব : milieu
পরিসর–সময়ের : spatio-temporal
পিণ্ডীকরণ : agglomeration
পুনঃ–আসলিকরণ : reactualisation
পূর্ব থেকেই : fr. anteriurement
পূর্বনির্ধারিত : foreclusive
প্রকল্প : hypothesis
প্রকল্পিত : hypothetical
প্রকল্পিত বিচারধারা : hypothetical judgement
প্রকল্পীয় ধারনা : conceptuel hypoithetique
প্রকাশ্য : expressive
প্রক্রিয়া : operation
প্রণালী : regime
প্রণালী : scheme
প্রণালীসঙ্গতকরণের : schematization
প্রতিনিবন্ধ : anti-thesis
প্রতিরূপ : representation
প্রতিরূপ : copy
প্রত্যাশা : fr. attente
প্রস্তাবনা : proposition
প্রান্তরেখা : outline
ফারাকীকার : differential
বহুতায়ন : pluralise
বহুত্ব : multiplicity
বহুত্ববাদ : pluralism
বাধ্যতা : imperative
বাস্তব : real
বাস্তববাদিতা : pragmatism
বিদ্যা : science. Arist.
বিপরীত : contraire
বিপ্রকৃতকরণ : denaturation
বিভাগীয় নীতি : categorical principle
বিরুদ্ধতা : opposition
বিশেষকরণ : specialization
বিষম–স্থাপন : hetero-position

বিষয় : substance. Arist.
বিষয় : object
বিষয়বত্তা : substantiallity
বিষয়বস্তু : matter
বিষয়বস্তুবাদ : substantialism
বিষয়ানুগ : thematic
বিষয়ী : subject
বৈপরীত্য : contrariety
বৈভব : potentiality
বৈশ্লেষিক : analytique
বৈসাদৃশ্য : discordance
বোধ : sense
বোধগম্য : sensible
বোধের : perceptive
ব্যক্ত : explicit
ব্যক্তি : fr. individu
ব্যক্তিগত : individual
ব্যক্তিগতকরণ : individualisation
ব্যক্তিত্ব : individuality
ব্যতিহার : reciprocity
ব্যতিহারী : reciprocal
ভাবোদ্রেক : fr. affectivite
ভূমায়িত : grounding
ভূমি : foundation
ভূমিচ্যুতি : ungrounding
ভূমিষ্ঠ : grounded
ভেক : racine
ভৌত : physiqe
মতবাদের বিচারধারা : thetic judgement
মতানুগ : thetic
মনুষ্যতা : humanity
মনো-শারীরবৃত্তীয় : psycho-physiologique
মনোগত : fr. psychique
মনোজাগতিক : psychic
মনোবিক্ষেপ : decentration
মনোবৃত্তীয় : psychologic
মনোবিদ্যা : psychology
মনোরোগবিদ্যা : psychopathology
মাত্রা : dimension
মিল : resemblence
মুখোমুখি হওয়া : encounter
যৌগপ্রণালী : complex

রওয়া : fr. etre
রতি : fetishism
রতি : fetish
রতীয় : fetishistic
শূণ্যতা : emptyness
শৃঙ্খলা : order
শ্রেণিবিভাজন : categorization
সংকেত : signal
সংকেতায়ন : signification
সক্ষমতা : faculty
সক্ষমতা : faculty
সঙ্গতি : compatibility
সঠিকতা : righteous
সদৃশ : identical
সমগ্র : synolon
সময়কাল : duration
সমস্যাজনক : problematic
সমস্যায়নের : problematic
সমাধান/লব্ধি : fr. resoudre
সমাহার : ensemble
সম্মুখীনতা : encounter
সংশ্লেষী : sythetique
সহজাততা : innateness
সংহতকরণ : differenciation
সাদৃশ্য : resemblence
সাধারণ ধারনা : doxa
সাধারণ বোধ : common sense
সাধারণত্বগুলি : commonalities
সামাজিক সক্ষমতা : sociability
সাম্পর্কিক : relationelle
সার : substantial
সারবস্তু : essence
সুযোগ : chance
সূত্রপাতের নিয়ম : law of threshold
স্বকীয় : personal
স্বকীয়তা : personality
স্বতলব্ধ : fr. a priori
স্ববিরোধ : contradiction
স্বয়ং-গঠিত : auto-constitutif
স্বয়ং-স্থাপন : auto-position
স্বয়ম্ভু ব্যক্তি : aseite
হওয়া : becoming
হয় : being
হাঁধর্মী : positive

* fr. লেখা থাকলে ফরাসি বোঝাবে।

দর্শন গ্রন্থমালা # ১

চাপ না নিয়ে

সমাজকর্মীর রাজনৈতিক দর্শনের প্রয়োজনে
দেল্যুজ-ফুকো-সিমন্দঁ ধরে একটি অসমাপ্ত প্রয়াস

শমীক সরকার

"নীতিকর্তব্য (এথিক্স) হল যার দ্বারা বিষয়ী বিষয়ী থাকতে পারে, পরমভাবে ব্যক্তিকৃত হয়ে ওঠাকে প্রত্যাখ্যান করে। তা (পরম ব্যক্তি) হল বাস্তবতার আগল বন্ধ করা উদ্যানবাটি, বিচ্ছিন্ন অদ্বিতীয়তা। নীতিকর্তব্য হল সেইটি, যার দ্বারা বিষয়ী আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্যার মধ্যে থাকে ঋজু, অর্থাৎ এক বাস্তব বর্তমানে; অস্তিত্বের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ওপর থাকে জীবন্ত, রূপ বা অন্তর্বস্তু কোনোটাই না হ'তে চেয়ে। নীতিকর্তব্য প্রকাশ করে অনন্ত ব্যক্তিকরণের অনুভব, হওয়া-র স্থিতিশীলতা যা কিনা প্রাক-ব্যক্তিকৃত এবং নিজেকে ব্যক্তিকরণ করে চলা অস্তিত্ব।"

জিলবের সিমন্দঁ (১৯৫৮)